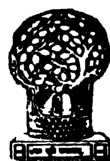
ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ

কৌশল কুমার মাথুর

অনুবাদ

সবিতা সেনগুপ্ত



ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

নিউ দিল্লী

ফেব্রুয়ারী ১৯৬৭ (মাঘ ১৮৯৩)

কৌশল কুমার মাথুর,

NICOBAR ISLANDS
(Bengali)

ডিস্ট্রিবুটার
সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সি
২২, রাজা উডমণ্ট স্ট্রীট
কলিকাতা-১

ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-৫, গ্রীন পার্ক, নিউ দিল্লী-১৬
কর্তৃক প্রকাশিত এবং নব মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭০এ আচার্য্য
প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

মুখবন্ধ

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী গ্রন্থমালার আর একটি সংযোজন এই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

স্বর্গীয় প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে আমার এক আলোচনার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থমালা। মনে আছে প্রথম যখন তাঁর সামনে আমি আমার পরিকল্পনা পেশ করি, তিনি শুধু যে তা আন্তরিকভাবে সমর্থন করেছিলেন তাই নয়, একে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করে তোলার পরামর্শও দিয়েছিলেন। তাঁর অভিমত ছিল যে, ভারতের নানা বিষয়ে এরকম গ্রন্থ লেখা হলে তা হয়ে উঠবে স্থায়ী জ্ঞানভাণ্ডার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতিতে সক্রিয় অবদান জোগাবে।

এই গ্রন্থমালা দেশের সব দিক নিয়ে চর্চা করার আশা রাখে। ভূগোল, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, কৃষি, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচনা এর মধ্যে থাকবে। উদ্দেশ্য, এমন এক গ্রন্থমালা রচনা করা যাতে থাকবে ভারত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সব তথ্য। বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন বিষয়ে যাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই গ্রন্থগুলি লেখেন, আমাদের সেদিকেই প্রয়াস। সাধারণ শিক্ষিত পাঠক যাতে সে সব পড়ে বুঝতে পারেন সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি। বিশেষজ্ঞ নন অথচ ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে উৎসুক, সহজ ভাষায় লেখা এইসব বই পড়ে সেইসব সাধারণ পাঠক তাদের জ্ঞানের পিপাসা মেটাতে পারবেন।

এই পরিকল্পনা রূপায়নে নানা জ্ঞানরাজ্যের প্রমুখ বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশনা লাভের সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। সত্যি বলতে কি, তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই গ্রন্থমালার রূপায়ন সম্ভব হত না। অবৈতনিক সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা নিজের নিজের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয়। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের জন্য

এইসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনায় যেভাবে তাঁরা সাহায্য করছেন—তারজন্য তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব ভারতীয় ভাষায় এই পুস্তকগুলি সুলভ করে তোলাই এই গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থমালার কিছু কিছু বই-এর মূল রচনা বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করাও সম্ভবপর হতে পারে।

ভারত ও রাজ্য সরকার সমূহের শিক্ষা মন্ত্রকের পুরোপুরি সহযোগিতা ও সমর্থন আমরা পাচ্ছি। নানাভাবে তাঁরা সাহায্য করছেন; এমন কি তাঁদের অধীনস্থ বৈজ্ঞানিকদেরও এই গ্রন্থমালার জন্য লেখার অনুমতি দিচ্ছেন। এই সুযোগে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের সাহায্য না পেলে জাতীয় কল্যান সাধনের এই পরিকল্পনায় হাত দেওয়াই সম্ভব হত না।

বি. ভি. কেশকর

ভূমিকা

আমাদের দেশের খুব কম জায়গা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মত চিত্তাকর্ষক। অথচ এই দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে লোকে কত কম জানে। এই দ্বীপপুঞ্জ পার্শ্ববর্তী আন্দামান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আন্দামানের মত কোন কয়েদখানাও এখানে স্থাপিত হয়নি। তবু ভারতের মূল ভূখণ্ডের সাধারণ মানুষ এই উভয় দ্বীপপুঞ্জকেই 'কালাপানি' বলে মনে করে। মনে করে এ অঞ্চল বাইরের লোকদের বসবাসের অযোগ্য, শুধু কয়েদী, গুণ্ডা ও সমাজের বাড়তি-পড়তি লোকদের বাসোপযোগী। এদের ধারণা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপজাতীয় লোকেরা সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিবর্জিত বর্বর মানুষ।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্পর্কে বেশীর ভাগ লোকের এই ধারণা এতটুকুও সত্যি নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই দ্বীপগুলি বসবাসের পক্ষে অত্যন্ত মনোরম, প্রাকৃতির সৌন্দর্যে ভরা। এখানকার শান্ত ও হাস্যোচ্ছল উপজাতীয় লোকদের একটা নিজস্ব বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি আছে।

এই দ্বীপগুলি সম্পর্কে সাধারণ অজ্ঞতার কারণ অবশ্য বোঝা যায়। মূল ভূখণ্ড থেকে এই দ্বীপগুলি বহু দূরে বলেই সক্রিয় যোগাযোগ স্বাভাবিকভাবেই সীমিত। এই দ্বীপগুলি এবং এখানকার লোকদের সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য, বলতে গেলে, বিশেষ কিছু লেখাও হয়নি।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল কোন বিবরণ নেই বলে যারা এই দ্বীপগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে চায়, তারাও কিছু করে উঠতে পারে না। তাই মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা ও হালচাল সম্পর্কে নিজেদের পরিচিত করে তুলতে প্রচুর পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটা আধুনিক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের খুবই

প্রয়োজন। আশা করি আমার এই প্রচেষ্টা সেই প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে।

১৯০৮-র মে থেকে ১৯০৮-র মে মাস পর্যন্ত আমি দ্বীপপুঞ্জে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার হিসেবে কাজ করেছি। ঐ সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এই গ্রন্থের প্রায় সমস্ত উপাদান আমি সংগ্রহ করেছি। অবশ্য আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গেজেটিয়ার (১৯০৮ সালের) এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপর লেখা ই, এম, ম্যান এবং জি, হোয়াইট হেডের অপূর্ব দু'টি বই পড়েও আমিও অনেক উপকৃত হয়েছি।

বৃটিশ শাসনকাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপকরণ আমি গেজেটিয়ার থেকেই পেয়েছি। মিঃ ম্যানের বা মিঃ হোয়াইট হেডের বই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী আগে লেখা। সে সময়ের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের এখন বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এই দু'টি বই পুরনো হয়ে গেছে। এই দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান অবস্থার প্রকৃত পরিচয় এই দু'টি বইয়ে আর পাওয়া যায় না। তাই বইগুলি থেকে আমি বিশেষ কিছুই নিইনি। তবে হতে পারে যে, এই দু'টি গ্রন্থ আমার অজ্ঞাতেই আমাকে কিছুটা প্রভাবিত করেছে। অবশ্য অতীত জীবনযাত্রা ও তার ধারাবাহিক ইতিহাস বুঝবার পক্ষে এই দু'টি বই আমার কাছে অমূল্য সম্পদ, কারণ সেই অতীত ইতিহাস নিকোবরীদের জীবনে এখনো কম মূল্যবান নয়।

আমার এই বইতে যে মতামত প্রকাশিত হয়েছে, তা আমার একান্তই নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত। এই মতামত আন্দামান এবং নিকোবর গভর্ণমেণ্ট বা ভারত সরকারের নয়।

যাঁদের সহায়তা ছাড়া এই বই প্রকাশ সম্ভবপর হতনা তাঁদের কাছে আমার ঋণ শোধ হবার নয়।

এই বই রচনার উপকরণ সংগ্রহ করতে সাহায্য করার জন্য বিশপ জন রিচার্ডসন, কর নিকোবরের উপ-প্রধান মোড়ল মিঃ ওল্যায়ান, কাকানা গ্রামের রেভারেণ্ড রুফাস রাম, কিন্মুকা

স্কুলের শিক্ষক মিঃ আবেদনেগো, কাকানা গাঁয়ের মোড়ল মিঃ কুচট, চুকচুকিয়া গাঁয়ের দ্বিতীয় মোড়ল মিঃ মার্টিনকে ধন্যবাদ জানাই।

এই বইয়ের আলোকচিত্রগুলির জন্য সরকারী ফটোগ্রাফার মিঃ ফিলিপের এবং আন্দামান ও নিকোবর সরকারের উন্নয়ন বিভাগের কাছে, আর হাতে আঁকা চিত্রগুলির জন্য কর নিকোবরের শিল্প শিক্ষক শ্রী নীরেশ পোদ্দারের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রাক্তন ডেপুটি কমিশনার মিঃ এস, কে, শর্মা সর্বপ্রথম আমাকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ওপর কিছু লেখার জন্য উৎসাহিত করেন এবং বইখানা শেষ করার জন্য ক্রমাগত অনুপ্রেরণা দিতে থাকেন। তাঁর কাছে আমি বিশেষভাবে অনুগ্রহিত।

পরিশেষে তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের ভূতপূর্ব কমিশনার শ্রী অনিল চন্দের কাছেও আমি ঋণী। তিনি ১৯৬৬ সালে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শন করতে এসে আমার বই সম্পর্কে জানতে পারেন এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়ার মাধ্যমে বইটি প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন।

যাঁরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে জড়িত বা এদের সম্পর্কে জানতে উৎসুক, তাঁরা যদি এই বই পড়ে কিছুমাত্র উপকৃত হন এবং মূল ভূখণ্ডের নাগরিকদের মধ্যে এই বই যদি নিকোবরীদের জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ও ঔৎসুক্য বাড়াতে কিছুমাত্র সাহায্য করে, তবে আমি মনে করবো এই বই রচনার জন্য আমি যা পরিশ্রম ও সময় দিয়েছি তা সার্থক হয়েছে।

কৌশল কুমার মাথুর

সূচীপত্র

চিত্র সূচী

প্রথম অধ্যায়

ঐতিহাসিক পটভূমিকা

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে একটি উপজাতি সমাজের পরিবর্তনশীল বর্ণাঢ্য চিত্র পাওয়া যায়। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপপুঞ্জ শত শত মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এই বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অবস্থিতির জন্য অতীতে এই দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ এতই সীমাবদ্ধ ছিল যে, এখানকার অধিবাসীদের তার কোন ছোঁওয়াই লাগেনি আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিকোবরের উপজাতি সমাজে পরিবর্ত্তনের কোন জোয়ার আসেনি।

যাই হোক, এই দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশ অধিকারে আসবার পর এই শতাব্দীর গোড়াতে যখন একবার পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হলো তখন ক্রমে তাতে গতিবেগ সঞ্চারিত হল, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে এদের জীবনধারা, সংস্কার রীতি-নীতি খুব দ্রুত বদলাতে সুরু করলো। বর্তমানে পরিবর্ত্তনের সময়ে যখন তাদের সমস্ত বিশ্বাস, জীবনধারা, আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে সেই সময়ে এই দ্বীপপুঞ্জের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা বা তাদের জীবন ও চরিত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া কঠিন। সেইজন্য এই দ্বীপপুঞ্জের একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পটভূমিকার বর্ণনা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে করে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে, কোন্ কোন্ শক্তি ও প্রভাব এখানকার অধিবাসীদের চিরাচরিত জীবনধারার মধ্যে পরিবর্ত্তন এনেছে এবং এখনও কাজ করে যাচ্ছে একটি নতুন নিকোবরী সংস্কৃতি সৃষ্টি করার জন্য।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও এই দ্বীপগুলির সঙ্গে বাইরের কিছুটা সম্পর্ক ছিল। এর একটা কারণ এই যে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ,

ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে পড়তো ; তাছাড়া অন্য অনেক উপজাতির মধ্যে যা নেই নিকোবরের অধিবাসীদের মধ্যে সুপ্রাচীন কালেই সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাত্রার একটা নির্দিষ্ট মান বজায় ছিল এবং তাদের সুপারি ও পানের বিনিময়ে বাইরের কিছু কিছু জিনিষ তারা নিতে পারত। এইভাবে প্রাচীন কাল থেকেই এই দ্বীপগুলি বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পণ্ডিতরা স্বীকার করেছেন যে, জেরিনি ও টলেমির মত হেলেনিক লেখকদের রচনায় নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ আছে। আরব রিলেশনস-এ (৮৫১ খৃষ্টাব্দ) একে লঙ্খাবলুস বলে অভিহিত করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীতে আই জিং (I-sing) নামে যে চীনদেশীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ভারতে এসেছিলেন তাঁর লিখিত বিবরণে লো-জেন কুয়ো বা 'নগ্ন মানুষদের দেশ' বলে এই দ্বীপপুঞ্জকে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে রামায়ণ মহাকাব্যের বীর হনুমানের দেশ ছিল এখানেই আর রাম বনবাসের সময়ে এখানে এসেছিলেন।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রথম সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় ১০৫০ খৃষ্টাব্দে চোল রাজাদের তাঞ্জোর শিলালিপিতে। শক্তিশালী নৌবাহিনীর অধিকারী চোল রাজাদের এই দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। শিলালিপিতে এই দ্বীপগুলিকে 'নাক্কাভরম' বলে। 'নাক্কাভরম' মানে নগ্নদের দেশ। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, সমস্ত প্রাচীন বিবরণীতে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে নগ্নদের দেশ বলে বারবার বলা হয়েছে। সেটা বোধহয় এই কারণে যে, আগে নিকোবরী মানুষেরা খুব ছোট এক টুকরো কাপড়ের লেংটি পরে থাকতো। তার একটি কোণ লেজের মত পিছন দিকে ঝুলতো। যেসব লোক জাহাজে করে এই দ্বীপের পাশ দিয়ে যেত, দূর থেকে দ্বীপের অধিবাসীদের দেখে এদের মনে হত ওরা বুঝি উলঙ্গ ও লেজবিশিষ্ট !

'নাক্কাভরম' নামটা অন্য সব মধ্যযুগীয় লেখকরাও গ্রহণ,

করেছিল। এর বিভিন্ন নাম, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ডেনিশ ও সুইডেনীয় নাবিকদের রচনায় পাওয়া যায়। এই ভাবেই এই দ্বীপপুঞ্জের আধুনিক নাম নিকোবর হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই দ্বীপপুঞ্জ খৃষ্টান মিশনারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম আসেন সুইট মিশনারীরা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকেই এঁদের অনেকেই যদিও এই সব দ্বীপপুঞ্জে দীর্ঘকাল বসবাস করে গেছেন কিন্তু এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রচেষ্টা তাঁদের ব্যর্থই হয়েছে। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ডেনিশরা উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য এই দ্বীপপুঞ্জ অকিকার করে। কামোর টা দ্বীপে তাদের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। ডেনিশ মিশনারীরাও এখানকার অধিবাসীদের খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁরাও সফলকাম হননি। ইটালিয়ান ও ফরাসী জেস্যুইটরাও উনিশ শতকের প্রথম দিকে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করেন, তাঁরাও ব্যর্থ হন। ডেনিশদের স্থাপিত উপনিবেশও তেমন সুবিধের হয় নি। তাঁদের ধর্ম্ম প্রচারের প্রচেষ্টাও বিফল হয়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তারা এই দ্বীপপুঞ্জের উপর প্রভূত্ব ছেড়ে দিলো এবং তাদের অবস্থানের সমস্ত চিহ্ন তারা সরিয়ে নিল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ডেনিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর বৃটিশরা এই দ্বীপপুঞ্জের শাসনভার গ্রহণ করল।

প্রথম দিকে মিশনারীদের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা বিফল হলেও এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের জীবন রূপান্তরে তাদের কিছুটা অবদান ছিল। এই দ্বীপগুলিতে কোন কোন সব্জি ও ফল, আজকাল যা পাওয়া যায় আর গরু ও কোন কোন জাতের শূয়োর—এগুলো সবই এই মিশনারীদের দান। বাগিচা রক্ষা করার জন্য নিকোবরীরা যে কাঠের বেড়া ব্যবহার করে, মনে হয় তা ডেনিশ মোরাভিয়ান মিশনারীদের কাছ থেকেই ওরা শিখেছিল। কোন কোন মিশনারী তখনকার দিনে এই দ্বীপগুলির জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মূল্যবান রচনা রেখে গেছেন।

বৃটিশরা প্রথমে চেয়েছিল ঠিক আন্দামানের মত নিকোবরকেও কয়েদীদের উপনিবেশ করে তুলতে। এই উদ্দেশ্যে কামোরটা দ্বীপে একটা ছোট কয়েদী উপনিবেশও স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু তা সফল হয়নি এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পরিত্যক্ত হয়েছিল। বৃটিশরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে আন্দামান নিকোবর নামক রাজ্যের অংশ করে নিল এবং আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একজন চীফ কমিশনারের দ্বারা এই রাজ্য শাসিত হত। বৃটিশরা এই দ্বীপপুঞ্জে ব্যাপক শাসন নীতিতে উৎসাহী ছিল না। কেবলমাত্র কর নিকোবরে একজন এজেণ্ট নিযুক্ত ছিল। কর নিকোবরে জনসংখ্যা সর্ব্বাধিক থাকায় এবং নিকোবর দ্বীপসমষ্টিতে কর নিকোবর সবচেয়ে উন্নত হওয়ায় সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ শাসনের এটিই সদর কার্যালয় হল। এজেণ্টের কাজ ছিল প্রধানতঃ স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। ভারতের মূল ভূখণ্ডের মত এই দ্বীপগুলি থেকে বৃটিশরা আর্থিক লাভ ওঠানোর কথা অতটা ভাবেনি।

সেইজন্য লোকের উপরে বিশেষ কোন কর ভার চাপান হয়নি এবং সাধারণভাবে তারা শোষণের হাত থেকে বেঁচেছিল। যে ভাবে হোক বৃটিশরা লোকের জীবনযাত্রায় বাধা না দেবার নীতিটা মেনে চলত আর এই নীতি অনুসরণ করে চলার জন্যই দ্বীপগুলির কোনরকম অগ্রগতি এবং লোকের আর্থিক উন্নতির জন্য কোন কিছুই তারা করেনি।

এই দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়তে লাগল। অনেক ভারতীয় বণিক বিশেষ করে লাক্ষাদ্বীপ এবং মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে অনেকে নারকেল ও সুপুরির বাণিজ্যের জন্য এখানে এসে দোকানপাট করেছিল। এই ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ বহু রকমের পণ্যদ্রব্য সঙ্গে আনতো এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডের লোকেদের নিত্যব্যবহার্য্য অনেক বস্তুই এখানকার বিশেষ করে, কর নিকোবরের অধিবাসীরা ব্যবহার করতে সুরু করল।

ব্যবসায়ীরা অবশ্য এখানকার সরল ও বিশ্বাসী বাসিন্দাদের সাধ্যমত শোষণ করতে লাগল। বৃটিশ শাসকরা তো আর লোকের হিতাহিতের ধার ধারত না। তারা তাই ব্যবসায়ীদের বাধা না দিয়ে বরং নিরপেক্ষতার নীতিই অবলম্বন করল। বস্তুতঃ ব্যবসায়ীদের আগমনের সঙ্গে লোকেদের বাহ্যিক সংস্কৃতিতে কতকটা পরিবর্ত্তন এলেও সাধারণভাবে তাদের ভাগ্যের কোন উন্নতি হয়নি এবং ব্যবসায়ীদের কাছে দারুণ ঋণের ভারে পীড়িত হয়ে তারা নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেই নিমজ্জিত রইল। এই দ্বীপপুঞ্জে বৃটিশ আধিপত্যের সবচেয়ে তাৎপর্য্যপূর্ণ দিক হল খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারের সূচনা। কর নিকোবরে চার্চ্চ অফ ইংল্যাণ্ডের একটি মিশন স্থাপিত হল এবং সেটি বৃটিশ সরকারের প্রোৎসাহ পেতে লাগল।

বেদাপ্পন সলোমন নামে একজন অত্যন্ত উৎসাহী ভারতীয় মিশনারী ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কর নিকোবরে এজেণ্ট নিযুক্ত হলেন এবং খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের আন্দোলন জোরদার হল। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কর নিকোবরের মাস গ্রামে তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট টমাস চার্চ্চ নামে প্রথম অ্যাংলিকান চার্চ্চ স্থাপন করেন। কর নিকোবর ওই সময়ে বৃটিশ সরকারের হেড কোয়ার্টার ছিল। তাঁর কূট বুদ্ধিতে তিনি এটা বুঝলেন যে, ওই দ্বীপগুলিতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করতে হলে ভবিষ্যতে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য কয়েকজন বুদ্ধিমান স্থানীয় বালককে তাঁর বেছে নিতে হবে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি ও তাঁর স্ত্রী কর নিকোবরের মাস গ্রামে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং খুব চালাক-চতুর ও ভবিষ্যৎ যাদের উজ্জ্বল এমন সব ছেলেকে ভর্তি করে নিলেন। অধিক প্রভাব বিস্তার করতে পারবে বলে বেশীর ভাগই গ্রাম প্রধানদের ছেলেদের নেওয়া হয়েছিল। এই ছেলেদের অন্যতম হলেন জন রিচার্ডসন। পরবর্ত্তীকালে তিনি নিজের লোকেদের মধ্যে একজন বড় নেতা হয়েছিলেন এবং ঐ দ্বীপপুঞ্জের জীবনে একটা নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। অতি শিশুকাল থেকে জন রিচার্ডসন নেতৃত্ব এবং

মননশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সেইজন্য এজেণ্ট সলোমন মিশনারীদের পরিচালনায় উচ্চ শিক্ষার জন্য তাঁকে বর্মা পাঠিয়েছিলেন। বর্মা থেকে ফিরে এসে জন রিচার্ডসন ধর্ম্মোপদেশক ও মিশনারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে মিশনের কার্য্যভার গ্রহণ করলেন। স্থানীয় অধিবাসী হওয়াতে লোকের উপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তাঁর স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং প্রধানতঃ তাঁরই জন্য ওখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার লাভ করতে লাগল।

কিছুটা শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং কিছু লোকের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করার ফলে ভূত-প্রেত পূজা ইত্যাদিতে লোকের বিশ্বাস কমতে স্থুরু করল। বৃটিশ সরকারও কতকগুলি প্রাচীন কুপ্রথা দমন করেছিল—যেমন শয়তান হত্যা করা। কোন লোককে সমাজের পক্ষে ভীতিপ্রদ মনে হলে শয়তানের কবলে পড়েছে মনে করে তাকে হত্যা করা হতো।

এই সব পরিবর্ত্তন সত্বেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্য্যন্তও জনাকয়েক খৃষ্টান ছাড়া নিকোবরের অধিকাংশ লোকই নিজেদের আদিম সংস্কার ও রীতি অনুযায়ীই প্রায় চলত, ভূত-প্রেত পূজো, ওঝা বা ডাইনি চিকিৎসকদের ভয়, ইত্যাদি গভীর কুসংস্কারের মধ্যে তারা ডুবে ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কর নিকোবর ও অন্যান্য দ্বীপে জাপানী অধিকার এই দ্বীপগুলির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন আনে। এতদিন পর্য্যন্ত এমন কোন বহিঃশক্তি এখানে আসেনি যারা স্থানীয় লোকেদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করেছে বা তাদের প্রতি এতটা নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। জাপানীরা বিনাবাধায় এই দ্বীপগুলি দখল করে এবং বৃটিশ প্রজাদের প্রতি এত বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে ওঠে যে, এখানকার বিশেষ করে কর নিকোবরের লোকেদের প্রতি তারা চরম অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা চালাতে থাকে। তারা প্রচুর নারকেল গাছ

কেটে ফেলে। দ্বীপের বিরাট এলাকা পরিষ্কার করে এবং রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ, দ্বীপের প্রান্তে সৈন্যাবাস তৈরী, দুটি বিমান অবতরণক্ষেত্র এবং জাহাজ নোঙর করার ছোট জেটি তৈরী করার কাজে নিকোবরীদের জোর করে কাজে লাগায়। এই দ্বীপগুলিতে জাপানীদের দখল দৃঢ়ভাবে কায়েম করা এবং বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্যই তারা এইসব নির্মানকার্য হাতে নিয়েছিল। যাই হোক এই ভাবে বছর কয়েকের মধ্যে সমস্ত দ্বীপটির চেহারাই একেবারে বদলে গেল।

১৯৪৫ সালে জাপানী শাসনের অবসান হল। বৃটিশ পুনর্দখলের সংক্ষিপ্তকাল পরে দেশের বাকী অংশের মত এই দ্বীপগুলিও ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করলো।

স্বাধীনতার সময়ে নিকোবরীদের বিশেষ করে কর নিকোবরের অধিবাসীদের মন একেবারে বদলে গিয়েছিল। জাপানী অধিকার সুপ্রাচীন কালের নিষ্ক্রিয়তা থেকে তাদের একটা প্রচণ্ড নাড়া দেয় এবং পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা তারা উপলব্ধি করে। তারা নতুন ভাবধারা এবং জীবন যাত্রার নতুন প্রণালী গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করলো।

তাছাড়া জাপানী শাসনের সময় সংখ্যালঘু খৃষ্টানরাই সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ ভুগেছিল। ইংরেজী জানার জন্য এবং সমাজে অধিকতর অগ্রসর বলে জাপানীরা তাদের ইংরেজদের বিশেষ মিত্র বলে মনে করত। তবু যুদ্ধের সময় জন রিচার্ডসনের পরিচালনায় খৃষ্টানরা সাহস, বীরত্ব এবং নেতৃত্বের অনেক পরিচয় দিয়েছিল এবং লোকের মনোবল দৃঢ় রাখার কাজে সহায়ক হয়েছিল। এই জন্য যুদ্ধের পর খৃষ্টানরা লোকের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠে এবং বিশপ রিচার্ডসন (১৯৫০ সালে জন রিচার্ডসন বিশপের পদে উন্নীত হয়েছিলেন) একজন বড় নেতা বলে গণ্য হন।

বাস্তবিকই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে কয়েক বছরের মধ্যেই কর

নিকোবরের লোকেরা ভূত-প্রেত, ওঝা, ডাকিনী ইত্যাদিতে বিশ্বাস ও কুসংস্কারে ভরা পুরনো ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করল। অন্যান্য দ্বীপগুলিতেও অনেকে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল। তবু সেসব জায়গায় খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার এতটা হয়নি যেমনটি হয়েছিল কর নিকোবরে। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, বলি ইত্যাদি আদিম রীতির অবসান ঘটাল এবং বহুশতাব্দীর প্রাচীন কুসংস্কার একেবারে ভেসে গেল।

জাপানী অধিকারের কালে পুরনো অবিবেচক সদাগর শ্রেণী—যারা নিষ্ঠুরভাবে নিকোবরীদের শোষণ করে চলেছিল—তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক হয় পালিয়ে যায়, না হয় নিহত হয়। এটা ওখানকার অধিবাসীদের পক্ষে খুব সৌভাগ্যজনক হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে সরকার সতর্ক হল যে ব্যবসায়ীরা যেন লোকদের শোষণ করার জন্য আর না আসে। জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ১৯৫৩ সালে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (আদিম উপজাতি সংরক্ষণ) আইন পাশ করা হল।

এই আইন অনুসারে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উপজাতি এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ হল এবং চীফ কমিশনারের অনুমতিপত্র ভিন্ন কোন বহিরাগতের ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো বন্ধ হল। সরকার সমবায় আন্দোলনকেও উৎসাহ দিল এবং কর নিকোবরের গ্রামে গ্রামে ও অন্যান্য দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সমবায় সমিতি স্থাপিত হল। সমবায় সমিতির উন্নতি এবং আর্থিক শোষণের অবসানের ফলে নিকোবরীদের সমৃদ্ধি হল। লাইসেন্সের নিয়ম অনুযায়ী দ্বীপের মধ্যে ব্যবসা করার অনুমতিপ্রাপ্ত দুটি কোম্পানীর দোকান থেকে নতুন জিনিষপত্র ক্রয় করার সঙ্গতি তাদের হল। এর ফলেও লোকের দৈনন্দিন জীবনে নানা পরিবর্ত্তন আসতে লাগল।

সরকার এই দ্বীপগুলির উন্নতি ও জনকল্যাণমূলক অনেক কার্য্যসূচী গ্রহণ করল। বহু শতাব্দী ধরে অবহেলিত এই দ্বীপপুঞ্জে জোরদার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার ফলে বছর কয়েকের মধ্যেই নানা

দিকে উন্নতি হল। রাজ্যের বর্দ্ধিত কাজ-কর্ম্মের সঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বাড়তে লাগল। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত দেশবাসীদের জীবনযাত্রার অনেক কিছুই নিকোবরীরা অনুকরণ করতে লাগল। মূল ভারতভূমির সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান সংযোগ দ্বীপগুলির চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে পরিবর্ত্তন আনতে আরো সহায়ক হল।

বৃটিশ অধিকার কালে যে পরিবর্ত্তন সুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পরে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ, জনহিতকর কার্য্যসূচী গ্রহণ, ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত দেশবাসীদের সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান সংযোগ, সম্পদ এবং ক্ষমতার বৃদ্ধি ইত্যাদি সব কিছু মিলে তাতে একটি নতুন শক্তির সঞ্চার হল।

পরিবর্ত্তনের স্রোত এত বেগে এল যে, নিকোবরা সংস্কৃতির পূর্ব্বেকার বহু শতাব্দীব্যাপী ক্রমবিবর্ত্তনের ফলে অভ্যাস, বিশ্বাস, আচরণ—সব কিছুর যতটা পরিবর্ত্তন হয়েছিল মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই প্রায় ততটাই বদলে গেল। পরিবর্ত্তনের ধারা এখনো অব্যাহত গতিতে চলছে এবং লোকের জীবনযাত্রার প্রায় সমস্ত দিকগুলিই স্পর্শ করছে।

কিন্তু তবু—প্রাচীন নিকোবরী সংস্কৃতির অনেক কিছুই এখনো আছে এবং সম্ভবত তা থাকবেও। লোকের আদি পেশা এবং পল্লী আর্থিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন হয়নি। যৌথ পরিবার পদ্ধতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সামাজিক সংগঠন আগের মতই আছে। কর নিকোবর ছাড়া অন্য দ্বীপগুলিতে পুরাতন অধ্যাত্মবাদী ধর্ম্ম এখনো বিদ্যমান। কর নিকোবরে ও পরিবর্তিত আকারে পুরাতন রীতি এখনো অনুসৃত হচ্ছে এবং চিরাচরিত ভোজ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ধর্ম্মে পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও পুরাতন সংস্কার এখনো বেঁচে আছে এবং তাদের কিছু কিছু এখনো লোকের জীবনকে প্রভাবিত করছে। দ্বীপগুলির শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা পুরাতনকে জীইয়ে রাখার পক্ষে আরো অনুকূল।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিঃসন্দেহে বাইরের সংযোগ খুবই বেড়েছে, তবু ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যাতায়াত ব্যবস্থার স্বল্পতার জন্য এখনো যোগাযোগ সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং নিকোবরীদের জীবনযাত্রাকে স্পর্শ করে এমন অন্য কোন সাংস্কৃতিক প্রভাবের সম্ভাবনাও সীমাবদ্ধ।

আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রেগুলেশনস ও (উপজাতি সংরক্ষণ আইন) নিকোবরী সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ করার কাজে সহায়ক হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ সীমাবদ্ধ। শুধু কর্ম্মে নিযুক্ত সরকারী অফিসার ও তাদের পরিবারবর্গ এবং ব্যবসায়ী কোম্পানীগুলির কিছু সংখ্যক কর্ম্মচারী সাধারণতঃ এই সব এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। আর সরকারী নীতি হল উপজাতীয় লোকদের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত না ঘটানো এবং তাদের রীতি-নীতি ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করে তাদের অগ্রগতি ও আর্থিক উন্নতি করা। এটাও তাদের সংস্কৃতি রক্ষার সহায়ক হয়েছে। নিজেদের গণ্ডির বাইরে বিবাহাদি করার অনিচ্ছার জন্যেও নিকোবরীরা একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পেরেছে। সব কিছুর ওপরে উপজাতীয় মনের গভীর রক্ষণশীল মনোভাব সর্বক্ষেত্রে পরিবর্ত্তনের পথে বাধার সৃষ্টি করে; ফলে পরিবর্ত্তনের গতি ব্যাহত হয় এবং তার প্রভাবও অনেকটা কমিয়ে দেয়।

বাস্তবিক অধুনা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পরিবর্ত্তণ ও রক্ষণশীলতার একটি অদ্ভুত টানা-পড়েন চলছে এবং এই দু'টি কথা নিরন্তর স্মরণ রাখলেই এই দ্বীপপুঞ্জের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এবং অধিবাসীদের জীবন ও চরিত্রের একটি যথার্থ চিত্র উদঘাটিত হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূগোল

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ উনিশটি দ্বীপের সমষ্টি। এই দ্বীপ সমূহ বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে উত্তর অক্ষাংশে ষষ্ঠ ও দশম সমান্তরাল রেখার মধ্যে এবং ৯২°৪০ মিঃ হতে ৯৪° পূর্ব্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এগুলির মধ্যে মোটে বারটি দ্বীপ—কর নিকোবর (জনসংখ্যা ৯,৯১৩)[১], চাওড়া (জনসংখ্যা ১,২২৮), টেরেস্সা (জনসংখ্যা ৫৪৭), বমপুকা (জনসংখ্যা ৪৩), কামোরটা (জনসংখ্যা ৭৯৮), নানকাউরি (জনসংখ্যা ৫৩৮), ত্রিঙ্কেট (জনসংখ্যা ১১৬), কাচাল (জনসংখ্যা ৯০৫), ছোট নিকোবর (জনসংখ্যা ১৮২), পুল্লোমিল্লো (জনসংখ্যা ৪০), কোন্দুল (জনসংখ্যা ৮২) এবং বড় নিকোবর (জনসংখ্যা ২০৩) মনুষ্য অধ্যুষিত। বাকী সাতটি দ্বীপ—বাতি মালব, তিল্লঙচাঙ, মেরো, ট্রাক, ট্রেইস, মাঞ্চাল ও কাবরাতে কোন মানুষের বসতি নেই। সবচেয়ে উত্তরে কর নিকোবর এবং সর্ব্ব দক্ষিণে গ্রেট নিকোবর দ্বীপের দূরত্ব প্রায় ১৬০ মাইল।

সমুদ্রপথে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে ভারতের মূল ভূখণ্ড, উত্তরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব্বে মালয়েশিয়া ও দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া। ভারতের মূল ভূখণ্ডে মাদ্রাজ ও কলকাতার সঙ্গে কর নিকোবরের দূরত্ব যথাক্রমে ৬৫০ ও ৮৫০ সামুদ্রিক মাইল। কর নিকোবরের দূরত্ব আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণতম প্রান্তের দ্বীপ লিটল্ আন্দামান থেকে ষাট মাইল আর দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপে অবস্থিত সংযুক্ত এলাকা আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের হেড কোয়ার্টার পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৫০ মাইল। বড় নিকোবর দ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত পিগমেলিয়ান আর ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত অচিন হেডের দূরত্ব মাত্র ৯১ মাইল।

---

[১] ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুসারে।

আন্দামান ও নিকোবর উভয় দ্বীপপুঞ্জই একদা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমির অংশ ছিল। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র অংশ জুড়ে একটি পর্ব্বত শ্রেণী ছিল ; একদিকে সেটা বর্মার আরকানস-এর (কেপ নেগ্রেইস) সঙ্গে যুক্ত ছিল অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপপুঞ্জের (অচিন হেড) সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। প্রায় পনের কোটি বছর আগে ভূতাত্ত্বিক কারণে এই দ্বীপগুলির সন্নিকটস্থ ভূভাগ জলে ডুবে যায় এবং পর্ব্বত শ্রেণীর সানুদেশ এবং অন্য উচ্চ ভূভাগ সমূহ সমুদ্রের মধ্য থেকে মাথা তুলে বর্ত্তমানের দ্বীপপুঞ্জে পরিণত হয়েছে।

মৃত্তিকার দুর্বলতম স্তরের বলয়গুলির একটিতে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত ; তাই যেকোন সময়ে এখানে প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সম্ভাবনা রয়ে গেছে।

প্রবাল কীটের দ্বারাও কোন কোন দ্বীপ গঠিত হয়েছে, যেমন কর নিকোবর। কর নিকোবরের কাছে মাত্র কয়েক ফুট খুঁড়লেই প্রবাল পাথর পাওয়া যায়।

সবচেয়ে উত্তরের দ্বীপ এবং নিকোবর দ্বীপ সমষ্টির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ হল কর নিকোবর। এই দ্বীপ সবচেয়ে ঘন বসতি পূর্ণ, নিকোবরী জাতির সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশই এখানে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য দ্বীপগুলির ও এখানকার অধিবাসীদের মানসিক বিকাশ ও আচার ব্যবহারে বিস্তর পার্থক্য রয়ে গেছে।

কর নিকোবর ৪৯.৫৯ মাইল জুড়ে একটি সমতল দ্বীপ, অস্ট্রেলিয়ার মতই প্রায় এই দ্বীপটি অনেকটা চৌকোণ আকারের, দ্বীপটি মধ্যভাগে সামান্য উন্নত। পাসসা নামে একটি স্থানের কাছে উত্তর-পশ্চিম দিকে এই উন্নত ভূমিভাগ প্রায় দু'শ ফুট উঁচুতে উঠে গেছে। পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে ক্রমে ঢালু হয়ে এসেছে। যদিও দ্বীপটিতে সত্যিকারের কোন নদী নেই, দ্বীপের ভিতরের দিক থেকে একটি স্রোতস্বিনী বেরিয়ে এসে উত্তর-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে

পাসসার কাছে সাগরে মিলেছে। দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে কাইমুস গ্রামের কাছে খুব বড় একটি খাঁড়ি আছে ; সেটি ভেতর দিকে চার মাইল চলে গেছে এবং মুখের দিকে পরিষ্কার জল।

দ্বীপের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। বাইরের দিকে দু'-তিন মাইল প্রশস্ত নারকেল গাছের ঘন শ্রেণী রয়েছে যার জন্য দ্বীপটিকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতই মনে হয়।

কর নিকোবরে পনেরটা গ্রাম। *মুসা (জনসংখ্যা ৯৮২), কিনমাই (জনসংখ্যা ৪২৪), ছোট লাপাটি (জনসংখ্যা ৬৪১), বড় লাপাটি (জনসংখ্যা ৬৮৯), টাপইমিং (জনসংখ্যা ৪৪৩), কিন্যুকা (জনসংখ্যা ৬৬৩), চুকচুকিয়া (জনসংখ্যা ৬২৩), পারকা (জনসংখ্যা ৯৯৮), মালাক্কা (জনসংখ্যা ৯১৪), তামালু (জনসংখ্যা ৮৯০) কাকানা (জনসংখ্যা ৪৯২), কাইমুস (জনসংখ্যা ৫০৭), আরঙ (জনসংখ্যা ৫৭৬), টিটপ (জনসংখ্যা ২৯১), সাওয়াই (জনসংখ্যা ৭৬৭)। এই গ্রামগুলি সবই উপকূলভাগে অবস্থিত এবং দ্বীপটি ঘিরে ৩২ মাইল দীর্ঘ সড়ক-এর দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

দ্বীপের দক্ষিণভাগে দুটি ছোট কিন্তু সুন্দর ও সমৃদ্ধ গ্রাম, নাম কাকানা ও কাইমাস। দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে আরঙ নামে শুধু একটি গ্রাম। এই গ্রামেই অকচাঙ নামে এক জায়গায় সরকারী নারিকেল উৎপাদনের কেন্দ্র।

দ্বীপের উত্তর উপকূলেও মাত্র দুটি গ্রাম, সাওয়াই ও টিটপ। টিটপ গ্রামটি খুবই ছোট, কিন্তু এটা নয়নাভিরাম বেলাভূমির জন্য বিখ্যাত। স্বচ্ছ, সাদা ও শক্ত বালুকনা থাকায়, সমুদ্র এখানে অনেকটা নিরাপদ। ঢালু অংশটা ধীরে ধীরে নেমে এসেছে। তাই সমুদ্রে স্নান ও বনভোজনের জন্য এই জায়গাটা খুবই প্রশস্থ এবং দ্বীপের দর্শনার্থীদের কাছে স্থানটি বিশেষ প্রিয়।

দর্শকদের সুবিধার জন্য সমুদ্রতটে পি. ডব্লিউ. ডির দ্বারা একটি

---

* ১৯৬১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী।

রেস্ট হাউসও নির্ম্মিত হয়েছে। উপকূল রেখার বক্রগতির জন্য টিটপে সমুদ্র অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত এবং দ্বীপপুঞ্জে এটি হল সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ; ফলে সাগর যখন দ্বীপপুঞ্জের চতুর্দিকেই বিক্ষুব্ধ থাকে, জাহাজগুলি তখন টিটপের উপকূলে নোঙর করে এবং জাহাজের মাল বোঝাই ও মাল্ খালাস করার কাজও এখানে হয়।

দ্বীপপুঞ্জের অন্য গ্রামগুলি মুস, কিনমাই, বড় লাপাটি, ছোট লাপাটি, টাপোইমিঙ, চুকচুকিয়া, কিন্যুকা, তামালু, পরকা, মালাক্কা এইভাবে দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত। বৃটিশ শাসনকালে মাস গ্রাম হেড কোয়ার্টার ছিল এবং প্রথম গীর্জ্জা ও বিদ্যালয় এখানেই স্থাপিত হয়। এইজন্যও এ স্থানের গুরুত্ব অনেক, কারণ গ্রাম প্রধান এবং দ্বীপের সব অধিবাসীদের উপরে যঁার অসীম প্রভাব সেই বিশপ রিচার্ডসনের বাড়ীতো এখানেই।

সুন্দর গীর্জ্জা এবং খেলার মাঠের জন্যও এই গ্রামের নাম আছে। আন্তঃপল্লী ফুটবল প্রতিযোগীতা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। বছরে ছয় মাস—নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই পল্লীর বিপরীত মুখে জাহাজ নোঙর করে এবং একটি পাকা জেটির নির্ম্মান কার্য্য এখানে চলছে।

কর নিকোবরের দ্বীপপুঞ্জের জীবনে বড় লাপাটি গ্রামেরও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে, কারণ এটি নাকি সেই আদি পল্লী, যেখান থেকে নিকোবরীরা দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল। অতীত কালে দ্বীপের প্রধান সর্দ্দার এই গ্রাম থেকেই ঠিক করা হত। কিন্তু এখন এ প্রথা চালু নেই। তবু এখনো দ্বীপের অনেক জরুরী বিষয়ের অনুষ্ঠান যেমন বড় বড় লোক যাঁরা দ্বীপ পরিদর্শন করতে আসেন তাঁদের অভ্যর্থনা এখানেই হয়, অন্যান্য গ্রামও তাতে যোগদান করে। এই গ্রামের গুরুত্ব আরো নানা কারণে, যেমন সমষ্ঠি উন্নয়ন ব্লকের দপ্তর, তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র, ছুতোর, কামার, দর্জ্জি, বেত ও বাঁশের কাজ, শিক্ষা ও উৎপাদনের দপ্তর ছাড়াও এখানে এক মাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

চুকচুকিয়া গ্রামে কর নিকোবর ট্রেডিং কোম্পানীর হেড কোয়া-র্টার। এই কোম্পানী নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্যের এবং শুকনো নারকেল ও সুপারির ব্যবসা করে।

মালাক্কা গ্রাম বিখ্যাত কারণ বছরে ছয় মাস মে থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত জাহাজ এখানকার সমুদ্রতটে নোঙর করা হয় এবং জাহাজে মাল খালাস ও বোঝাই করার কাজ হয়। একটি পাকা জেটি এখানে নির্ম্মিত হয়েছে। সরকারী কর্মচারী যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের জন্য গ্রামের সন্নিকটে সরকারী গেস্ট হাউস আছে, সমুদ্রের দিকে মুখ করা সুন্দর দোতলা বাড়ী।

দ্বীপের ভেতর মালাক্কা এবং পারকা উভয় গ্রামের কিছু কিছু অংশ কেটে নিয়ে প্রায় এক মাইল জুড়ে দ্বীপের হেড কোয়ার্টার করা হয়েছে। প্রায় সব জরুরি সরকারী দপ্তর। সরকারী অফিসার ও কর্ম্মচারীদের এখানেই বাসগৃহ।

কর নিকোবর দ্বীপটিরই শুধু নয়, এটি সমস্ত কর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসনকার্য্যের হেড কোয়ার্টার এবং আমাদের রাজধানীর মত নিকোবরীরা নিজেদের মধ্যে বলে 'ডিল্লী'।

অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের দপ্তর, সরকারী হাসপাতাল, সাবট্রেজারি, সাব পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, থানা, সমষ্টি কল্যাণ কেন্দ্র এবং সমবায় ক্যান্টিন, এইসব এ অঞ্চলের উল্লেখ-যোগ্য সরকারী ভবন।

মালাক্কা এবং কাকানা গ্রামের মধ্যেকার অংশ নিয়ে বিমানক্ষেত্র এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর কেন্দ্র করা হয়েছে।

গ্রামগুলো ছাড়াও দ্বীপের মধ্যে একটি চিত্তাকর্ষক স্থান আছে— একটি ছোট গুহা। কাকানা গ্রাম ও হেড কোয়ার্টার এলাকাকে যুক্ত করেছে যে লুপ রাস্তা তারই উপর গুহাটি রয়েছে, একশ কুড়ি গজ লম্বা। গুহাটি চুনা পাথরের তৈরী এবং ভেতরে পাথর কেটে ঝুরি নেমে এসেছে। গুহাটি সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত আছে যে, সুদূর অতীতে ছোট ছোট বামনাকৃতি লোক এখানে বাস করত।

কালক্রমে মানুষের অত্যাচারে তারা এই গুহার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর জঠরের মধ্যে অদৃশ্য হযে যায়। এই দ্বীপ যখন জাপানীদের দখলে এসেছিল, তখন বিশপ রিচার্ডসন গ্রেপ্তার এড়ানর জন্য এই গুহাতে লুকিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত জাপানীরা অবশ্য তাঁকে বার করে ফেলেছিল। পরে তারা গুহাটি অস্ত্রশস্ত্র রাখার কাজে ব্যবহার করেছিল।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য দ্বীপগুলি কিন্তু কর নিকোবর থেকে কিছুটা আলাদা। চাওড়া ছাড়া অন্যগুলি খুবই জনবিরল। ঘন বসতি নয় বলে এই দ্বীপগুলিতে কয়েকটি কুটির ছাড়া কিছুই নেই এবং কর নিকোবরের মত এ সব জায়গায় সমষ্টিগত ভাবে কোন কাজ সম্ভব হয় না। এখানকার লোকেরাও কর নিকোবরের লোকেদের চেয়ে অনগ্রসর এবং এখানে যানবাহনের অভাব ও জনবসতি ঘন সন্নিবিষ্ট নয়, ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। সেজন্য এ সব অঞ্চলে কোন রকম উন্নতি করা বেশ শক্ত।

চাওড়া ছাড়া এ সব দ্বীপের লোকেদের প্রচুর জমি রয়েছে। তাই তারা কর নিকোবরের লোকেদের চেয়ে ধনী, কিন্তু স্বভাবে এমন অলস যে, চাষের জন্য সামান্যতম পরিশ্রম করতে চায় না বা করে না। চাওড়ার লোকেরা, কোথাও বা কর নিকোবরের লোকেরা এসে এদের চাষ-আবাদের কাজ করে দিয়ে যায়। এই সব দ্বীপের সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তার লাভ করেনি। বহু লোক এখনো পুরাতন ধর্ম্মই আঁকড়ে আছে। তারা সর্ব্বদা ভূত-প্রেতের ভয়ে অস্থির থাকে, ওঝাদের কবলে পড়ে এবং প্রায় যখন তখন ভূত-প্রেত তাড়ানর জন্য নিষ্ঠুর হলেও সাবেক কালের জাঁকজমকপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ চালায়, প্রচুর নাচ গান আর গুচ্ছের মুরগী শূয়োর জবাই করে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য দ্বীপগুলির মধ্যে কর নিকোবরের সবচেয়ে কাছে জনমানব শূন্য দ্বীপ বাত্তি মালব। এই দ্বীপটির আয়তন খুব ছোট বলে নিকোবরীরা একে বলে কুয়োঁনো বা ছোট। কর

নিকোবরের - কাকানা থেকে ১৮ মাইল দূরে। পরিষ্কার দিনে কাকানার সমুদ্র তীর থেকে এই দ্বীপটিকে দেখা যায়। কর নিকোবর থেকে এই দ্বীপটি এত কাছে যে, নিকোবরীদের মধ্যে গল্প আছে যে, আগে এটি কর নিকোবরেরই অংশ ছিল, কিন্তু একটি ছোট পাখী (সক) রাত্রিবেলা ভূমিতল থেকে ঠোঁটে করে তুলে নিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু ছোট্ট পাখীটা খুব বেশী দূরে যেতে পারেনি। ভোর হয়ে গিয়েছিল। চুরি ধরা পড়ার ভয়ে পাখীটা ঠোঁট থেকে মাটির টুকরোটা সমুদ্রের জলে ফেলে দেয় এবং বাত্তি মালব দ্বীপ গড়ে ওঠে। বলা হয়ে থাকে যে, কাকানা গ্রামের লোকেরাই দ্বীপটির মালিক। ওরাই ওখানে কয়েকটি নারকেল গাছ লাগিয়েছে। প্রতি বছর চাওড়া যেতে কর নিকো-বরের লোকেরা সমুদ্র যখন অশান্ত থাকে তখন এই দ্বীপে থামে বা যখন বিশ্রাম নিতে ইচ্ছা হয় তখন ওই দ্বীপটিতে যায়। দ্বীপটিতে প্রচুর পায়রা রয়েছে, জলে প্রচুর মাছ। তাই মধ্যে মধ্যে কর নিকো-বরের লোকেরা পাখী শিকার আর মাছ ধরার জন্য ওখানে যায়।

বাত্তি মালব-এর পর কর নিকোবর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে ছোট কিন্তু খুব মনোরম দ্বীপ চাওড়া। এটা খুব সঙ্কীর্ণ সমতল দ্বীপ, সর্ব্ব দক্ষিণে ছোট একটি পাহাড় সমস্ত দৃশ্যটির মধ্যে যেন প্রধান হয়ে রয়েছে। লোকে বলে শয়তানের বাসস্থান। লোকে-দের ধারণা শয়তান ওই পাহাড়ে বাস করে। এই দ্বীপের আয়তন ২·৮ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১২২৮ ; এখানেই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে ঘন বসতি। এই দ্বীপে পাঁচটি গ্রাম, সবগুলিই পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। গ্রীষ্মের মাসগুলিতে এখানে পানীয় জলের বেশ অভাব। বাস্তবিকই, না আছে প্রচুর নারকেল গাছ, না আছে আর্থিক ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন যথাযোগ্য উপায়। যাই হোক, চাওড়ার লোকেরা খুব পরিশ্রমী ও চালাক। আদিবাসী লোকেদের কুসংস্কারকে মূলধন করে ওরা নিজেদের সুবিধা করে নিয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ওরা নিজেদের উন্নততর যাদু-

বিদ্যার গল্প চালু করে রেখেছে। চাওড়ার লোকেদের ক্রোধের মুখে যারা পড়েছে তাদের কি দুর্গতি হয়েছে তাই নিয়ে অনেক গল্পও প্রচলিত। এমন কি কর নিকোবরের লোকেরা যারা এখন অনেক কুসংস্কারকে পিছনে ফেলে অনেক আগে এগিয়ে গেছে তারাও চাওড়ার লোকেদের ভয় পায়। এখন খৃষ্টধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন এসেছে এবং সম্প্রতি একটি বিদ্যালয় ও ঔষধালয়ও স্থাপিত হয়েছে। তবু এ জায়গা যেন প্রাচীন কুসংস্কারের দুর্গ বিশেষ। লোকেরা বড়ই অনুন্নত ; ওখানে তাই ওঝাদের পরম রাজত্ব।

এই দ্বীপের অধিবাসীরা খুব ভাল নৌকা বা ডোঙা এবং মাটির ঘড়া তৈরী করে। নৌকা তৈরীর জন্য কাঠ, ঘড়ার জন্য মাটি সব কিছুই এখানে দুষ্প্রাপ্য। কাছের দ্বীপ টেরেসসা থেকে আনাতে হয়। নিকোবরীরা বিশ্বাস করে যে, সমস্ত শুদ্ধ কাজ এবং পূজো-আর্চ্চাদির জন্য খাদ্যবস্তু চাওড়ার মৃত্তিকা পাত্রে প্রস্তুত হওয়া চাই। ডোঙাও কিনতে হবে চাওড়া থেকে, নয় তো অন্ততঃ চাওড়ার পুরোহিতের আশীর্ব্বাদপূত হওয়া চাই, না হলে সমুদ্রে এই ডোঙার ডুবে যাবার ভয় থাকবে। এই পরিস্থিতিতে চাওড়ার লোকেরা দালাল হিসাবে সব সময় কিছু কমিশন পায়।

ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সমুদ্র যখন শান্ত, অন্য দ্বীপের বিশেষ করে, কর নিকোবরের লোকেরা ওদের ডোঙায় চড়ে চাওড়াতে আসে। কাপড়, চাল, ছুরি, শূয়োর—এই সবের বদলে মাটির পাত্র ও ডোঙা নিয়ে যায়। এই আগমনটি কেবল যে বাণিজ্যিক দিক দিয়েই জরুরি তা নয়, বরঞ্চ প্রত্যেক কর নিকোবরী পুরুষের অন্ততঃপক্ষে একবার করে এখানে আসতেই হয় তার আধ্যাত্মিক গুরুকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। তরুণ বালকদের চাওড়াতে প্রথম যাত্রা অনেক উৎসব ও সমারোহের সঙ্গে নিষ্পন্ন হয়। পরে তা বর্ণনা করা হবে। চাওড়ার লোকেরাও অন্য দ্বীপে যায় জিনিষ-পত্রের লেন-দেনের জন্য।

ডোঙা ও মাটির পাত্র বিক্রী করা ছাড়াও চাওড়ার লোকেরা জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাদের ছোট্ট জমিতে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আলু ও অন্যান্য তরকারী এবং ফলের চাষ করে। অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসীরা (কর নিকোবর ছাড়া) খুব অলস বলে চাওড়ার লোকেরা সেই সব দ্বীপে চাষের কাজও করে। ওরা কর্ম্মনিপুণ, পরিশ্রমী এবং মজুরের কাজও খুব ভাল করে। তবে শুধু পুরুষেরাই কাজের জন্য অন্য দ্বীপে যায় এবং যায় মাত্র দু'মাসের জন্য। বাড়ী ছেড়ে কদিন বাইরে রইল তার হিসাব ওরা রাখে লাঠির ওপর দাগ কেটে। যদি লাঠিতে ষাটটি দাগ পড়ে (দু'মাস তাহলে হয়ে গেল) তাহলে কিছুতেই আর তাদের দিয়ে কাজ করান যায়না এবং তখন তারা নিজেদের দ্বীপে ফিরে যাবেই।

যদি কোন জাহাজ না পাওয়া যায় তাহলে ওরা প্রায় সময়ই সুদূর দ্বীপ থেকে একখানি নৌকা নিয়ে—চুরি করে হলেও নিয়ে ফিরে যাবে চাওড়াতে। উন্মুক্ত অশান্ত সমুদ্রে লম্বা পাড়ি দেবার সম্ভাব্য বিপদের কথা মনেই আনবে না। চাওড়াবাসীদের ঘরে ফেরার এত ব্যাকুলতার কারণ হল নিজেদের দ্বীপের প্রতি তাদের অত্যধিক মমতা আর কতকটা এই ভয়েও যে, যদি দীর্ঘকাল পরবাসে থাকে তাহলে দ্বীপে যে সব মরদ রয়ে গেল তারা তাদের স্ত্রীদের নষ্ট করবে বা তাদের ছিনিয়ে নেবে।

চাওড়ার পরেই হল টেরাসসা বা বমপুকা দ্বীপ। বমপুকা তো খুবই ছোট এবং সমুদ্র থেকে একটি ছোট পাহাড় মাথা তুলে আছে কতকটা তেমনি দেখায়। দ্বীপে যে সামান্য সংখ্যক লোক থাকে তাদের কিছু নারকেল গাছ আছে। প্রায়ই তারা ডোঙায় করে পাশের দ্বীপ টেরাসসাতে যায়, ট্রেডিং কোম্পানীর যেসব শাখা দোকান আছে তাদের নারকেলের শুকনো শাঁস বিক্রী করতে এবং বিনিময়ে কিছু নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্যদ্রব্য আনতে।

টেরাসসা দ্বীপ বেশ বড়সড়। দেখতে মাংসের কাবাবের মত।

প্রায় ৩৫ বর্গ মাইল জুড়ে এর এলাকা। মধ্য দেশে পার্ব্বত্য ভূমি, উত্তরের দিকে ভূমিভাগ বেশ একটি কুঁজের মত উঁচু হয়ে আছে। মাটি সাধারণতঃ অনুর্ব্বর, কিন্তু উপকূলের দিকে বেশ কিছু নারকেল গাছ আছে। কমলা ইত্যাদি ফল প্রচুর। হাঁস মুরগীর চাষও খুব হয়, কারণ জনসংখ্যা কম বলে জায়গার তো অভাব নেই। অধিবাসীরা অত্যন্ত অলস ও অনুন্নত। টেরাসসার লোকেরা পাক্কা মধুসেবী। প্রাণ ভরে তাড়ি গেলা এবং ভূত-প্রেত পূজো করা ছাড়া আর কোন কিছুতেই এদের উৎসাহ নেই। একটা মজার ব্যাপার এদের চুলের বাহার। বেশির ভাগ পুরুষের মাথায় বেণী, তামিলনাদের গোঁড়া লোকেদের মত তালুর উপর উঁচু করে বেঁধে রাখে। মনে হয় এই কেশ পারিপাট্যের রীতি ওরা নিয়েছে তামিলনাদের সেই সব লোকের থেকে যাদের সঙ্গে চোল রাজত্ব কালে ওদের সংযোগ ঘটেছিল।

আরো দক্ষিণে কামোরটা, নানকাউরি, ট্রিঙ্কেট এবং কাচাল দ্বীপ ; এই দ্বীপগুলি পরস্পর সংলগ্ন। কামোরটা আর নানকাউরি পাহাড়ী জায়গা, শুধু উপকূল ভাগে কিছু সমতল ভূমি। পাহাড়ের সানুদেশ তরঙ্গায়িত ও অবারিত প্রান্তরময় বলে ইংলণ্ডের পল্লী অঞ্চলের মত মনে হয়। কর নিকোবর থেকে প্রায় ৯০ মাইল দূরে দ্বীপগুলির মধ্যে বিশেষ সুন্দর ও অত্যন্ত মনোরম একটি পোতাশ্রয় আছে। পোতাশ্রয়টির বিশেষ সুবিধা এই যে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে দুই দিকেই প্রবেশ পথ আছে। নানকাউরি দ্বীপ সমষ্টির (কর নিকোবর ও বাত্তি মালব ছাড়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য সব দ্বীপ সমূহ) শাসন বিভাগীয় প্রধান কার্য্যালয় হল কামোরটা দ্বীপের মধ্যে পোতাশ্রয়টির এক পাশে। এই একই জায়গায় ডেনিশ মিশনারীরা একটি বসতি স্থাপন করতে চেয়েছিল কিন্তু জায়গাটি অস্বাস্থ্যকর বলে, বিশেষ করে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপের জন্য তাদের চেষ্টা বিফল হয়। এখনো কিছু সুন্দর বড় বড় ঝাউ গাছ ও বুনো গাই ডেনিস বসতির চিহ্নরূপে বর্ত্তমান।

সম্প্রতি ম্যালেরিয়া নিরোধক নানা ব্যবস্থার ফলে জায়গাটা আগের চেয়ে স্বাস্থ্যকর হয়েছে এবং অনেক সরকারী দপ্তর ও কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ, হাসপাতাল, সাবট্রেজারি এবং পুলিশ স্টেশন ইত্যাদি হয়েছে।

পোতাশ্রয়টির অন্যদিকে নানকাউরি দ্বীপে নানকাউরি ট্রেডিং কোম্পানীর হেড কোয়াটার রয়েছে। এই কোম্পানী নানকাউরি দ্বীপ সমূহের একমাত্র বাণিজ্য সংস্থা। রানী লক্ষ্মী, নানকাউরি কামোরটার উপজাতিদের রানী এখানে বাস করেন। টেরাসা ও বমপোকা অধিবাসীদের ওপরও রানী লক্ষ্মীর প্রচুর প্রভাব রয়েছে।

নানকাউরিতে আর কোন উল্লেখযোগ্য দ্বীপ নেই যার আয়তন ১৯ বর্গ মাইলের বেশী। কামোরটার আয়তন অবশ্য ৫৮ বর্গ মাইল এবং আরো তিনটি প্রধান গ্রাম—পিলপিলো, কাকানা এবং দারিঙ। এগুলিতে কিছুটা জনবসতি আছে। এখানে বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও ট্রেডিং কোম্পানির শাখা দোকান স্থাপিত হয়েছে।

নানকাউরির পোতাশ্রয়ের পূর্ব্ব দ্বারের উল্টো দিকে ট্রিঙ্কেট একটি ছোট সমতল দ্বীপ। এই দ্বীপটিতে যাতায়াতের ব্যবস্থা হিসেবে শুধু ডোঙা চলে কারণ এর চারদিকে ঘিরে শুধু প্রবাল প্রাচীর। যে সামান্য সংখ্যক লোক দ্বীপে থাকে তারা ব্যবসায়িক লেনদেন এবং অন্যান্য ব্যাপারে নানকাউরি এবং কামোরটার উপর নির্ভর করে।

কামোরটা এবং নানকাউরির পশ্চিমে কাচাল দ্বীপ। এটা বেশ বড় দ্বীপ এবং ৬১ বর্গ মাইল এর আয়তন। মধ্যদেশে অনতি-উচ্চ, কিন্তু যথেষ্ট সমতল ক্ষেত্রও আছে। কর নিকোবর ছাড়া নিকোবর দ্বীপ সমষ্টিতে এটি সবচেয়ে উন্নত দ্বীপ এবং এখানেই নারকেল ও অন্যান্য ফলের চাষ সবচেয়ে ভাল হয়। বলতে গেলে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জমি এখানেই

এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা এখানে রয়েছে। পরে ভারত সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং রবার চাষের জন্য এর উন্নতি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। দ্বীপের পশ্চিমে একটি ছোট উপসাগর আছে এবং এর তীরে অবস্থিত গ্রামের নাম পশ্চিম উপসাগরীয় কাচাল। স্থানটি খুবই মনোরম এবং দ্বীপের সর্দার রমণী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপদেষ্টা কমিটির সভ্যা প্রাণচঞ্চল রাণী চাঙ্গা এখানেই থাকেন। দ্বীপের অন্য প্রধান স্থান পূর্ব্ব উপকূলে কাপাঙ্গা দ্বীপ। এরই কাছে রবার চাষের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

নিকোবর দ্বীপ সমূহের সর্ব্ব দক্ষিণের দ্বীপপুঞ্জ চারটি দ্বীপ—পুল্লোমিল্লো, ক্ষুদে নিকোবর, কোন্দুল, ডাগর নিকোবর। ক্ষুদে নিকোবরের উত্তরে ছোট দ্বীপ পুল্লোমিল্লো ; ওখানে বিদ্যালয়, ঔষধালয়, ট্রেডিং কোম্পানীর শাখা দোকান আছে। বস্তুতঃ ক্ষুদে নিকোবরের লোকেরা নারকেলের শুকনো শাঁস এবং সুপুরির ব্যবসা এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের জন্য এই দ্বীপের উপর নির্ভর করে। পুল্লোমিল্লোর সমুদ্রতীর অত্যন্ত নয়নাভিরাম এবং দর্শকদের কাছে খুবই প্রিয়। পুল্লোমিল্লো ও ক্ষুদে নিকোবরের মাঝখানে খুব সুন্দর সুরক্ষিত একটি ক্ষুদে পোতাশ্রয় আছে।

ক্ষুদে নিকোবর একটি বড়সড়, চতুষ্কোন দ্বীপ, ৬০ বর্গ মাইল আয়তন, কিন্তু জনবসতি ছড়ানো ছিটানো। দ্বীপটি ঘন জঙ্গলে ঢাকা, কিন্তু জঙ্গলের কোন বাণিজ্যিক মূল্য নেই।

ভূমি প্রায় পার্ব্বত্য তবে উপকূলের কাছে কিছু সমতল ভূভাগ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে দ্বীপটি অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু উত্তম পোতাশ্রয় থাকার কারণে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে, যদি অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও যথোচিত প্রচেষ্টা করা হয়।

ক্ষুদে দ্বীপ কোন্দুল ডাগর নিকোবরের উত্তরে। এখানে রয়েছে একটি থানা, ঔষধালয় ও বিদ্যালয়। ট্রেডিং কোম্পানির শাখাও

এখানে। এখান থেকেই প্রতিবেশী দ্বীপ ডাগর নিকোবরে লোকেদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা মেটানো হয়। কোন্দুলের লোকেরাও ভাল ডোঙা তৈরী করে; চাওড়ার ডোঙার পরেই এগুলোর খুব চাহিদা।

ডাগর নিকোবর সর্ব্ব দক্ষিণে অবস্থিত এবং নিকোবর দ্বীপ সমষ্টির মধ্যে বৃহত্তম দ্বীপ। আয়তন প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল, নিকোবর দ্বীপ সমষ্টির অন্য সমগ্র দ্বীপগুলির আয়তনের প্রায় সমতুল্য। প্রায় মনুষ্যস্পর্শ বর্জ্জিত, নিবিড় সবুজ উদ্ভিদে ভরা এই দ্বীপের চেহারা ঠিক যেন একটি খাঁটি গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতই। দ্বীপটি যেন হাতছানি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছে কে আসবে তার ভেতরকার রহস্য উদ্ঘাটন করতে, তার ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ঘটাতে।

দ্বীপের বেশ কিছুটা অংশ পাহাড়ী, বিশেষতঃ পূর্ব্ব উপকূলে পাহাড়ের সানুদেশ বেশ উঁচু। সবচেয়ে উঁচু থুলিয়ার পাহাড়, ২,১০৫ ফুট।

নিকোবর দ্বীপ সমষ্টির এটিই একমাত্র দ্বীপ যেখানে নদী আছে। নদীগুলি শান্ত। এঁকে-বেঁকে দ্বীপের মধ্যে দিয়ে আড়াআড়ি-ভাবে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত। গালথিয়া, আলেকজান্দ্রা, দাগমার ইত্যাদি নদী বেশ বড়, কোথাও কোথাও পনের কুড়ি ফুট গভীর। সব নদীগুলিই অত্যন্ত সুন্দর, দুই তীরে শ্যামল ঘাসে ভরা প্রান্তর, প্রান্তরের অদূরে ঘন বন।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য যে কোন দ্বীপের তুলনায় ডাগর নিকো-বরে অধিক বৃষ্টিপাত হয় এবং কচিৎ কখনও পরিষ্কার দিন পাওয়া যায়। বহুকাল ধরে জঙ্গল ক্ষয়ের ফলে উদ্ভিদের জৈব ধ্বংসাবশেষ যুক্ত হয়ে হয়ে এখানকার মাটি অত্যন্ত উর্ব্বর হয়ে গেছে এবং এই মাটিতে খুব ভাল গাছপালা হয়। সেইজন্যই সমস্ত দ্বীপ জুড়ে ঘন বনের রাজত্ব। যদিও ব্যবসা বাণিজ্যের উপযোগী কাঠ খুব কমই পাওয়া যায়, তবে বেত, বাঁশ প্রচুর আছে।

সমস্ত দ্বীপে বন্য জন্তু ছেয়ে আছে। নিকোবর দ্বীপ সমূহের

অন্য যে কোন দ্বীপের চেয়ে এখানেই রকমারি জানোয়ার আছে। অসংখ্য প্রকারের কীট-পতঙ্গ ও সাপ ইত্যাদি থাকায় জায়গাটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর। নদীতে অনেক কুমীর। পাখীর রকমারি ডাক, বানরের কিচির মিচির দ্বীপটিকে যেন রহস্যময় করে রেখেছে।

দ্বীপটির জনসংখ্যা অত্যন্ত কম, প্রায় তিনশো। দ্বীপটির বৈশিষ্ট্য আরও একটি কারণে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে শুধু এই দ্বীপেই দুই শ্রেণীর উপজাতি রয়েছে—নিকোবরী ও সম্পেন। নিকোবরীরা সংখ্যায় প্রায় ১৪০ জন এবং তারা উপকূল ভাগে বাস করে। তাদের গ্রামগুলি কুঁড়ে ঘরের একটা দুটো জুটি ছাড়া আর কিছুই নয়। সবগুলিই পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, ভূমি অনেক সমতল হওয়ায় নারকেল গাছ লাগান সহজ। অতীতে পূর্ব্ব উপকূলে বেশ কয়েকটি গ্রাম ছিল, কিন্তু তার অধিকাংশ এখন পরিত্যক্ত।

শম্পেনরা বড় অনুন্নত জাতি। শুধু ডাগর নিকোবরেই ওরা বাস করে। বেশির ভাগ তারা ভেতরের দিকে বাস করে যদিও কিছু আবার উপকূলের দিকেও; তাদের সঙ্গে যোগাযোগ বড় কম বলেই তাদের যথার্থ সংখ্যা জানা যায়না। তবে মনে হয় ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে এবং আদিম জীবনযাত্রা অনুসরণ করার ফলে আস্তে আস্তে তাদের জাতি লোপ পেয়ে যাচ্ছে। তাদের দেহ সুগঠিত; নিকোবরীদের চেয়ে বেশ কিছুটা লম্বা, তবু ওরা ততটা স্বাস্থ্যবান নয়। তাদের গায়ের রঙ নিকোবরীদের চেয়ে কালো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চাঁছাছোলা, বিশেষতঃ নাক ও চোয়াল।

শম্পেনদের সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ ওরা জংলি ফল মূল মধু এবং নদীতে যে মাছ পাওয়া যায় তাই খেয়ে জীবনধারণ করে। ওদের কেউ কেউ নাকি আবার ট্যাপিওকা, মিষ্টি আলু, কলা এবং তামাকের চাষ করে। পুরুষেরা নেংটি, নারীরা কোন কোন গাছের বাকল থেকে ঘাগরার মত বানিয়ে পরে। ওরা শূয়োর পোষে এবং মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করে।

ওদের ঘর মাটি থেকে উঁচুতে শক্ত কাঠের ওপর এবং বাঁশ, কাঠ আর শনের তৈরী। কিন্তু ঘরগুলো তেমন মজবুত নয় বা নিকোবরীদের গৃহের মত অত সৌষ্ঠবপূর্ণও নয়। জমি থেকে পনের কুড়ি ফুট উঁচুতে খুবই ছোট ছোট করে বানানো বলে এদের ঘরগুলোকে যথার্থ ঘরের চেয়ে পর্যবেক্ষণ ঘাটি বলেই মনে হয়। সম্পেনরা আগুনের ব্যবহার জানে। গাছের বাকলের তৈরী বাসনে খাদ্যবস্তু রাখে। ওদের বর্শা ও মাছ মারার হুঁক আছে, ওরা এগুলো তৈরী করে আদিম ক্রুর উপায়ে। ওরা ধূমপান করতে ভালবাসে। কিছু শুকনো তামাক বা বিড়ি সিগ্রেটের প্যাকেট উপহার পেলে ওরা যতটা খুশি হয় এমন আর কিছুতে নয়।

সাম্পেনদের যে হিংস্র বলা হয় তা ততটা ঠিক নয়। ওরা বহিরাগতদের সংস্রব এড়িয়ে চলে কিন্তু ওরা আন্দামান দ্বীপের জারোয়াদের মত উগ্র প্রকৃতির নয়। জারোয়ারা সব সময় তাকে তাকে থাকে বাইরের লোকেদের ঘিরে ফেলে কখন মেরে ফেলবে। বস্তুতঃ সাম্পেনরা বহিরাগতদের সম্পর্কে এত ভীত যে একজন বহিরাগত ওদের গ্রামে একবার গেলে ওরা সমস্ত গ্রামই ছেড়ে চলে যায়। লাজুক ছলনাপূর্ণ স্বভাবের হলেও এরা অন্য লোকের সঙ্গে সংযোগ রাখতে একেবারেই যে অনিচ্ছুক তা কিন্তু নয়। যখন বহিরাগতদের ভাল কোন খবর পায় তখন খুব সহজভাবেই তাদের কাছ থেকে কাপড় ও তামাক উপহার নিতে বেরিয়ে আসে। উপকূলভাগে যেসব নিকোবরী আছে তাদের সঙ্গে এদের অনেকেরই ভালরকম যোগাযোগ আছে। যে সব নিকোবরীরা আলস্যবশতঃ নিজেদের কাজ করতে চায়না, তাদের ক্ষেতে অনেকেই শ্রমিক হিসাবে আবাদীর কাজ করে। নিকোবরীদের কাছ থেকে তারা জঙ্গলের মৌচাক থেকে সংগৃহীত মধুর বদলে কাপড়, লোহার টুকরো এবং তামাক নেয়। নিকোবরীরা এইসব বস্তু সংগ্রহ করে পাশের দ্বীপ কোন্দুলের ট্রেডিং কোম্পানীর দোকান থেকে।

শুধু দ্বীপের উত্তরে দুর্গম অন্তর্দেশে বোধহয় কিছু হিংস্র

প্রকৃতির সম্পেন আছে যারা শুধু যে বহিরাগতদের আক্রমণ করতেই পটু তাই নয়, দ্বীপের নিকোবরী ও অন্যান্য সম্পেনের সঙ্গেও সর্ব্বদা লড়াই করতে অভ্যস্থ।

অনেকের বিশ্বাস যে, সাম্পেনরা নিকোবরী জাতি। ওরা বাইরের জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এবং ওদের জীবনযাত্রা পদ্ধতি শত শত বছর আগের মতই। এটা কতদূর সত্য বলা শক্ত কারণ মনে হয় সম্পেনরা দেখতে-শুনতে নিকোবরীদের চেয়ে একেবারে আলাদা এবং ওরা সম্পূর্ণ আলাদা ভাষা বলে। এই অদ্ভুত উপজাতীয় লোকদের সম্পর্কে আরো বেশী জানা দরকার। এদের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন যাতে এদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য যথার্থ কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

সাধারণতঃ ডাগর নিকোবরের সব দ্বীপে যাওয়া বেশ শক্ত ব্যাপার এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করার এটি একটি বড় বাধা। তবে দ্বীপের পূব দিকে ক্যাম্পবেল উপসাগর নামে মোটা-মুটি সুরক্ষিত একটি উপসাগর আছে। সেখানে একটি জেটি নির্ম্মিত হচ্ছে এবং দ্বীপের ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে এটা সুনিশ্চিত প্রথম পর্যায়। সম্প্রতি এখানে একটি থানা এবং ঔষধালয় স্থাপিত হয়েছে। এই থানাটি সম্ভবতঃ দেশের সর্ব্ব দক্ষিণ থানা এবং এটি সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি বড় এলাকার উপর পাহারা দিচ্ছে এবং সম্পেনদের সঙ্গে অনেক ভাল সংযোগ রাখার চেষ্টা করছে।

ক্যাম্পবেল উপসাগরে স্বচ্ছ বালুকাময় অতি চমৎকার বেলাভূমি আছে। আধ মাইলের উপর লম্বা, এবং দশ থেকে বিশ গজ চওড়া। ভবিষ্যতে এটাকে ট্যুরিস্টদের খুব বড় আকর্ষণ করে তোলা যেতে পারে।

সম্প্রতি ডাগর নিকোবর দ্বীপ সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে খুব দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, কারণ এটি দেশের সর্ব্ব দক্ষিণ স্থান

এবং ইন্দোনেশিয়ার খুবই সন্নিকটে। এখানে বিশাল এলাকার জমি কাজে লাগান যেতে পারে, অধুনা যেখানে নিবিড় জঙ্গল ছাড়া কিছু নেই। যদিও দ্বীপটির অবস্থা খুবই জটিল তবু মনে হয় বেশি অর্থ ব্যয় এবং যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ভবিষ্যতে দ্বীপটির উন্নতির রাস্তা খুলে যাবে এবং প্রচুর আর্থিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি সম্ভব হবে।

সম্প্রতি ভারত সরকারের কয়েকটি বৈজ্ঞানিক বিভাগের প্রতিনিধিদের একটি যুক্ত দল এই দ্বীপে কাজ করে গেছেন এবং আশা করা যায় তাদের রিপোর্টে দ্বীপের কিছু গূঢ় তথ্য প্রকাশিত হবে যাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির পরিকল্পনা করতে সুবিধা হয়।

নিকোবর দ্বীপ সমূহের বাকি দ্বীপগুলিতে মনুষ্য বসতি নেই। তিলঙচাঙ একটি অত্যন্ত প্রস্তরময় সঙ্কীর্ণ দ্বীপ এবং ভবিষ্যতে কদাচিত কোন কাজ এতে হতে পারবে। কাত্রা, মেরো, ট্রাক, ট্রেইস, মাঞ্চাল এত ছোট জায়গা যে মানচিত্রে বিন্দু দাগ মাত্র, কোন গুরুত্বই এদের নেই।



তৃতীয় অধ্যায়

প্রাকৃতিক অবস্থা

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বিষুব রেখার নিকটেই অবস্থিত বলে এখানকার জলবায়ু গ্রীষ্মপ্রধান। সমস্ত বছর এখানে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া। তবু চারদিকে সমুদ্র থাকায় আর ফুরফুরে হাওয়া চলে এবং প্রায়ই বর্ষা হয় বলে তাপমাত্রা কখনো খুব উপরে ওঠেনা, যেমন দেখা যায় ভারতের মূল ভূখণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে। সবচেয়ে গরমের মাস মার্চ্চ ও এপ্রিল। সবচেয়ে ঠাণ্ডা ডিসেম্বর ও জানুয়ারী। এই মাসগুলোতেও আবার মেঘ ও বৃষ্টি অনুযায়ী গরম ও ঠাণ্ডা দিন। একটি দিনেই তাপমাত্রার অনেক রকম হেরফের হয়, কারণ একবার মাত্র বৃষ্টি পড়লেই তাপমাত্রা কমে যায় ও বেশ ঠাণ্ডা পড়ে যায়। সবচেয়ে গরমের মাসে সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২° সেন্টিগ্রেড এবং সর্ব্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪° সেঃ হয়। শীতের মাসে সর্ব্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮° সেন্টিগ্রেড এবং সর্ব্ব নিম্ন তাপমাত্রা ২২° সেন্টিগ্রেড ওঠে।

সারা বছর আবহাওয়া এখানে একই রকম। ঋতুর বিভাজনও এখানে নেই বললেই হয়। বছরকে ভাগ করার একমাত্র উপায় মৌসুমি বায়ু।

মে থেকে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত প্রধান বারি-বাহক দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ উত্তর পূর্ব্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে পড়ে, এতেও বৃষ্টিপাত হয় তবে দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুতে যেমন প্রবল তেমন নয়। দ্বীপপুঞ্জের বার্ষিক বারিপাত প্রায় গড়ে ২৬০ সেন্টিমিটার, যদিও ডাগর নিকোবরে একটু বেশি বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু মে মাসে সুরু হয়, কিন্তু জুলাইর আগে তেমন তীব্র হয় না। মে জুন মাসে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হয়। এবং জুলাই, আগস্ট

ও সেপ্টেম্বর—এই তিন মাসে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু সেপ্টেম্বরের পর কমতে থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব্ব এই দুই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবেই অক্টোবরে পুনরায় মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমি বায়ুর ফলে নভেম্বর-ডিসেম্বরে মাঝারি এবং জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে অপেক্ষাকৃত কম বৃষ্টিপাত হয়। মার্চ্চ এপ্রিল মাস বছরে শুষ্কতম মাস এবং এই সময়ে কখনো সখনো এক আধ পশলা বৃষ্টি হয়। বলতে গেলে এই সময়ে জলকষ্টই থাকে। ইঁদারাতে জল অনেক খানি নীচে নেমে যায় এবং সমস্ত দ্বীপগুলি জুড়ে খালি শুকনো ধূলোর দাপাদাপি চলে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এবং আবার এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বায়ুর গতি অনিশ্চিত থাকে এবং দুইটি মৌসুমি বায়ুর পরিবর্ত্তনের সময়টায় কোন বায়ুই তেমন প্রবল হতে পারে না। তাই সাধারণতঃ এই সময়টায় ঘূর্ণিবাত্যার আবহাওয়া থাকে এবং বায়ু দিগবিদিকে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় বলে এই সময়টা জাহাজ চলাচলের পক্ষে সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল।

এই সব দ্বীপে বৃষ্টিপাতের একটি বিশেষত্ব এই যে বৃষ্টি হয় খুব কম সময় ধরে। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী হাওয়ার গতিবেগ তীব্রতম থাকে এমনিতে আকাশ হয়তো দিনের পর দিন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। একদিন হয়তো বৃষ্টি এমন তোড়ে এল যে, কেউ বাইরে হাজার বস্ত্রের আচ্ছাদনে ঢাকা থাকলেও আত্মরক্ষা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং উজ্জ্বল সূর্য্য বেরিয়ে আসে। আকাশ স্বচ্ছ হলেই আকাশের রঙ হবে চমৎকার উজ্জ্বল গাঢ় নীল এবং পরিষ্কার আবহাওয়ার জন্য সূর্য্যকিরণ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়।

আবহাওয়াতে আর্দ্রতা থাকার দরুন রাত্রে গাঢ় শিশির পড়ে। সেজন্য এখানে রাত্রে বাইরে শোওয়ার রেওয়াজ নেই।

জলবায়ু সারা বছর ধরে উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে বলে শরীরের বেশ শক্তি ক্ষয় করে ও দেহে ক্লান্তি ও অবসন্নতা আনে। বোধকরি নিকোবরীদের এই আলস্য-মন্থরতায়-ভরা জীবন-ছন্দ এবং পরিশ্রম-বিমুখতা এই দ্বীপপুঞ্জের অদ্ভুত আবহাওয়ার জন্যই হয়েছে। এ রকম আবহাওয়াতে কঠিন পরিশ্রম করা শক্ত যদিও একেবারে অসম্ভব নয়। একটি দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপের জমির গঠনের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। সাধারণ ভাবে বলা যায় সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী জমির প্রকৃতি বেলে-দোঁয়াশ এবং উপকূলের দূরবর্তী জমির প্রকৃতি এমন কি স্থানে স্থানে এঁটেল দোঁয়াশও হয়। জমিতে বালির ভাগ বেশী থাকায় আবাদী জমিতে জল জমে না এবং উপকূলবর্তী জমিতেও বৃষ্টির পরও কাদা না হয়ে গ্রাম বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে। দ্বীপের মধ্যভাগের এঁটেল দো আঁশলা মাটিতে বৃষ্টির জল বেশ কিছুক্ষণ সঞ্চিত থাকে এবং মশা উৎপন্ন হওয়ার উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

প্রায় সর্ব্বত্রই মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত উদ্ভিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে খুব উর্ব্বরা।

গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়া ও উর্ব্বরা মাটির জন্য এখানে উদ্ভিদের অফুরন্ত বিস্তার। জমি ও সমুদ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে স্থান থেকে স্থানান্তরে উদ্ভিদের পার্থক্য আছে। দ্বীপের বাইরের দিকে নারকেল গাছ ও উপকূল সমীপে অরণ্য। গরান কাঠের অরণ্যও আছে কিন্তু জ্বালানী ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা হয়না। জ্বালানীর জন্যই ওই কাঠ ভাল। দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে উষ্ণ মণ্ডলের নিবিড় অরণ্য কিন্তু মূল্যবান কাঠ কিছুই নেই। শুধু কাচাল এবং বোধ হয় ডাগর নিকোবরে কিছু ভাল গাছ আছে, যেমন বাদাম।

বড় চিত্তাকর্ষক অরণ্য! কত রকমের বৃক্ষ লতা আর তাদের সর্বক্ষণ বেঁচে থাকার প্রয়াস। ১০০ থেকে ১২৫ ফুট পর্য্যন্ত পাদপগুলি লম্বা হয়। শীর্ষ দেশে পাতার মুকুট, সরল ঋজু ডাল তলদেশ বিশাল নোঙ্গরের মত, কখনো বা ৪০ ফুট পরিধি। এক টুকরো কাঠ বা পাথরের আঘাত করলে একরকম অদ্ভুত উচ্চ গম্ভীর ধ্বনি নির্গত হয়, প্রতিধ্বনি ওঠে নিস্তব্ধ বনভূমিতে। সবুজ পাতার আচ্ছাদন ভেদ করে সূর্য্যালোক প্রবেশ করতে পারে না। ফলে বনভূমি আঁধার ও রহস্যময় হয়ে থাকে। তাছাড়া প্রচুর সূর্য্যকিরণের অভাবে এবং পুরু মাটির জন্য বৃষ্টির জল যথাযথ শুকাতেও পারে না, জমি কর্দ্দমাক্ত থাকে এবং তাতে বনের মধ্যে চলা ফেরা করা কঠিন হয়। বনভূমি ঘন ঝোপঝাড় এবং সুন্দর ফার্ণ গাছে ভরা। বড় বড় গাছ নানা রঙয়ের অর্কিডে ঢাকা থাকে।



নিকোবরীদের কাছে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় নারকেল গাছ। ওদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান অবলম্বন হল ওই গাছ। দ্বীপের প্রান্তে সমুদ্রতটের কাছে মাটি যেখানে লোনা ও বালুকাময় সেখানে এ গাছ জন্মায়। নারকেলের পরই সুপারি গাছ। সুপারি গাছ একটু অভ্যন্তর ভাগে জন্মায় যেখানে হাওয়ায় আর্দ্রতা

অধিক ও মাটিও অধিকতর ঘন। সুপারি এখানকার অধিবাসীদের অর্থোপার্জ্জনের দ্বিতীয় প্রধান উপায়।

নিকোবরীদের আর একটি খুব দরকারী গাছ পান্তানাস বা মেলারি, হিন্দিতে বলে কেরাদি। বেশির ভাগই সমুদ্রতটের কাছে জন্মায়, অভ্যন্তর ভাগেও কিছু কিছু হয়। এ গাছ ১৫।২০ ফুট লম্বা হয়; গুঁড়ি মোটা, গাছের ওপরের দিকে শাখা-প্রশাখা। প্রতি শাখার চূড়ার দিকে পাতলা ও বড় বড় ঘাসের মত লম্বা লম্বা পাতা। এর ফলের আকৃতি গোলকের মত, পরিধি ১-২ ফুট, মটরশুঁটি বা সীমের কয়েকটী ছোট ছোট দানার মত জিনিসে তৈরী। ভেতরে বীচি বা শাঁস রয়েছে। পাকা ফল খাওয়া হয়। পাতা দিয়ে মাদুর তৈরী হয়। এক জাতীয় বুনো পান্তানাস আছে তার ফল খাওয়া যায় না, কিন্তু ভারী সুন্দর সুগন্ধি ফুল হয়। এগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ডের কেওড়ার মত, তবে গন্ধ তত বেশি নয়।

দীর্ঘকাল বহিঃসংযোগের ফলে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অধুনা অনেকরকম ফল ও সবজির চাষ হচ্ছে। অতীতে মিশনারীরা এসবের অনেক বীজ এনেছিল। সম্প্রতি কর নিকোবর সমষ্ঠি উন্নয়ন ব্লক এবং কৃষি বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের বেশ উন্নতি হয়েছে। অভ্যন্তর ভাগে ফলের মধ্যে লেবু, কমলা, বাতাবীলেবু, আম, সাপোটা, পেয়ারা, পেঁপে এবং আতা ফল খুব জন্মায়। পেঁপে ও আতাফল খুব বেশী হয়। অসংখ্য রকমের কলা পাওয়া যায়, লাল, হলুদ, সবুজ নানা রঙয়ের ও নানা আকারের। কলা আর পেঁপে পাকা ফল হিসাবেই শুধু খাওয়া হয়না। কাঁচা তরকারী হিসাবেও লোকে খায়। আনারস আর একটি প্রয়োজনীয় ফল, এবং সিঙ্গাপুরী ও হাওয়াই জাতীয় আনারসও পাওয়া যায়। কাঁঠাল, জাম, ব্রেডফ্রুট যা সেঁকলে রুটির মত লাগে—এই সব অন্য প্রিয় ফল। সুন্দর শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে থাকা গাছে ব্রেডফ্রুট ফলে, এর খোসা সবুজ, গায়ে কাঁঠালের মত খাঁজ-কাটা, মনে হয় যেন

ছোট ছোট কাঁঠাল। কিন্তু খুব নরম ও ভেতরে বীচি নেই। দক্ষিণ সমুদ্রের ইয়োরোপীয় অভিযাত্রীরা তাদের লেখায় যে ফলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এ হল সেই ফল। এই ফলকেই দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ থেকে ক্যাপটেন ব্লিগ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাউন্টি জাহাজে করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে নিয়ে এসেছিলেন।

অধিকতর উন্নত দ্বীপগুলির অভ্যন্তর ভাগে ট্যাপিওকা, মিষ্টি আলু এবং আখের চাষ করা হয়। সম্প্রতি ক্যাস্টর চাষ সুরু হয়েছে ও খুব ফলন হচ্ছে।

সব্জি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যা হওয়া সম্ভব তা যথেষ্ট পরিমাণে হয় যেমন ঢ্যাঁড়স, বেগুন, উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, নানা রকম টমেটো, ধুন্দুল, সীম, বীন, ডাঁটা শাক আর পয় ইত্যাদি নানা তরকারি।

এ ছাড়া নানা জাতীয় কচু হয়। নিকোবরীদের আহার্য্যের একটি বড় উপকরণ কচু। কচুকে এরা বলে 'নিয়া', তা আবার হরেক রকমের যেমন তাহাগে, রামু, সিনম্মেন এবং ভকবেল। কতকগুলি খেলে আবার মুখ চুলকায়। টৌকিনি নামে এক জাতীয় কচু আছে যা খেলে মুখ বা গলা একটুও চুলকায় না। এগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ডের ওল কচু জাতীয়।

বনাঞ্চলে বেত ও বাঁশ পাওয়া যায়, গৃহ নির্ম্মানে, ঝুড়ি তৈরীর কাজে তার বিশেষ প্রয়োজন। দ্বীপগুলির অভ্যন্তর ভাগে নানা জায়গায় প্রচুর পরিমাণে পান হয়।

বাইরে থেকে আমদানি করা কিছু কিছু দরকারী গাছও ওখানে আছে, এ গুলোতে বেশ উপকার হয়। কয়েক জায়গায় নিম গাছ লাগান হয়েছে, নিমপাতা ওষুধের কাজে লাগে। ঝাউ গাছ বোধ হয় ডেনিশ মিশনারীরা রোপণ করেছিল। দেখতে পাইন গাছের মত লম্বা লম্বা। জ্বালানী হিসেবে তো বটেই বড়দিনে উৎসবের সময়ও এ. গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয়। রেশম তুলোর গাছও প্রচুর। শয্যাদ্রব্যের জন্য প্রচুর তুলো এখান থেকে সরবরাহ করা হয়।

কিছু দেশীয় গাছপালাও আছে। কিনায়া নামে, এক রকমের বড় গাছ আছে, তার পাতা খুব বড় বড়, মাছ মারার জন্য এরা এই পাতা ব্যবহার করে। সমুদ্রের কাছে যে কিনায়া গাছ জন্মায় তার ভেতরের শঙ্খাকৃতি বীজগুলি ভেঙ্গে সমুদ্রের জলে ফেলে দেওয়া হয়। এতে মাছের মাদকতা আসে, ফলে মাছ ধরতে সুবিধা হয়। অভ্যন্তর ভাগে একটু আলাদা ধরনের কিনায়া গাছ হয়। এগুলোর বীচি আর একটু ছোট গোল গোল। এগুলোও ভেতর দিকের পুকুর বা জলাশয়ের মাছ ধরার কাজে লাগান হয়। ডোঙ্গা তৈরীর জন্য কিনিয়া নামে একরকম গাছ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কর নিকোবরে অবশ্য এ গাছ খুব কমই পাওয়া যায় এবং 'টাকাওকিয়ি' নামে একরকম গাছ দিয়ে তারা নৌকো তৈরী করে; এটি একরকম বুনো কাঁঠাল গাছ। টাকাওকিয়ি ও কিনিয়া দুরকম গাছের কাঠই হাল্কা কিন্তু সমুদ্রজলের আঘাত সইবার উপযোগী।

দ্বীপের অধিবাসীরা বনের গাছপালা খুব ভাল চেনে। বিভিন্ন গাছপালা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বেশ ভাল কাজে লাগায়। নানা-রকম বুনো ফল পাতা সংগ্রহ করে বেশ তরিবত করে খায়। কিছু গাছ গৃহ নির্ম্মানের কাজে, কিছু ঔষধের কাজে, কিছু আবার জ্বালানির কাজ লাগে।

বনাঞ্চলে কিনিওল নামে একরকম ছোট ছোট কাঁটায়-ভরা বেত গাছ পাওয়া যায়। এর বোঁটায় কাঁটায় ভরা; নারকেল কোরানোর কাজে আসে।

একরকম মজার গাছ আছে যে গাছ আমের মুকুলের মত পুষ্পিত হয় আর ফলগুলি কাজুর মত; নাম বীপ। কিন্তু এর পাতাগুলি স্পর্শ করলেই চুলকায়, তাই সযত্নে একে পরিহার করে চলতে হয়। সবচেয়ে বিপজ্জনক বৃক্ষ পানরুল। এর লম্বা লম্বা বাদামী রঙের ফলগুলি কতকটা তেঁতুলের মত দেখতে, পাতলা সূক্ষ্ম আঁশে ঢাকা। আঁশগুলি গায়ে লাগলে খুব চুলকানি হয়। কখনো কখনো চুলকাতে চুলকাতে ঘা হয়ে যায়।

বুনো ফুল কিন্তু খুব কমই আছে। আশ্চর্য্য যে, নিকোবরী ভাষায় ফুলের কোন পরিভাষা নেই। এখন ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগের ফলে 'পুল' শব্দটি ওদের ভাষায় এসে গেছে। সন্দেহ নেই 'ফুল' থেকেই 'পুল' শব্দ এসেছে। একমাত্র বুনো ফুল যাকে বলা যায় তা হল কিনায়া গাছের ফুল। বড় বড় হলদে রঙের কাচনার বা কাঞ্চন ফুলের মত। আর একরকম ফুল 'থাঙ্গাডা,' বড় বড় লাল ফুল হয় প্রায় ছয় ফুট লম্বা গাছে। গাছের পাতাগুলো বেশ বড় বড়। সাপে কাটলে তার ঔষধের জন্য এগুলির ব্যবহার হয়। টাকুরোটঙ নামে এক রকম সাদা ফুলও আছে, বেল ফুলের মত দেখতে কিন্তু গন্ধহীন। হলদে রঙের ঘণ্টার মত দেখতে মাঝারি আকারের টাওকো ফুল ছোট ছোট গাছে ফোটে। এই গাছের বাকল জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদার কাজে ও বাড়ীঘর ও ডোঙ্গা নির্ম্মানের কাজে জোড় বাঁধার জন্য ব্যবহৃত হয়। লানানক্যাপ খুব ছোট ছোট বেগুনি রঙের ফুল, মাটিতে গুল্ম লতার মত জন্মে। বিশাল বৃক্ষে 'মালক' বলে ফোটে খুব ছোট ছোট লাল ফুল। আর ক্ষুদে ক্ষুদে ডেইজি। আইপোমিয়া নামে এক রকম ঘণ্টার মত আকারের বেগুনি ও গোলাপি রঙের ফুল উপকূল ভাগে ফোটে। এসব ফুলের কোন গন্ধ নেই। গাছ থেকে তুলে ফেলার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুকিয়ে যায়।

বাইরে থেকে যেসব ফুল আনা হয়েছে তাদের মধ্যে করবী এবং দোপাটি জাতীয় ফুল এখানে সেখানে প্রচুর ফোটে। বাগানের ফুলও কতো—জবা, কলাবতী, জিনিয়া, লিলি, গাঁদা, কসমস ইত্যাদি ফুল যেখানে সেখানে চোখে পড়ে।

বড় গাছের ফুল যেমন কৃষ্ণচূড়া, শিউলি, চাঁপা ইত্যাদি খুব ফোটে। নানা রকমের পাতাবাহারও এনে লাগান হয়েছে, অনেক সময় সেগুলি অযত্নে দশ থেকে বিশ ফুট লম্বা হয়ে যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা যখন এই দ্বীপপুঞ্জ দখল করেছিল, তখন ওরা কয়েকটি জাতের পত্রবহুল গাছ লাগিয়েছিল,

বোধহয় বহিঃশত্রুর শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবার জন্য। এইসব গাছপালা অনেক দূরে দূরে ছড়িয়ে রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ইউপাটোরিয়াম ঝোপ, যা কর নিকোবরের উপকূল অঞ্চলে মাটিতে এখন ঘন হয়ে আছে। এতে খাদের কাজ বেশ ভাল হতে পারে তবু আবাদীর কাজে ও পল্লী অঞ্চল সাফ রাখতে এগুলি অসুবিধা সৃষ্টি করে।

দ্বীপপুঞ্জে পশু পাখীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। এর কারণ সারা বছর বোধহয় এখানে মিষ্টি জল পাওয়া যায় না। মার্চ্চ-এপ্রিলের খরার সময়ও দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে জলাশয়ে বর্ষায় সঞ্চিত জলও শুকিয়ে যায়। বন্য জন্তুর মধ্যে শুধু শূয়োর ও গরু। এদের মধ্যে অনেক প্রাণীই বুনো; কারণ, তাদের মালিকরা তাদের ছেড়ে দেওয়াতেই তারা বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে অনেক সময় বুনো শূয়োর পাওয়া যায় এবং কখনো কখনো তাদের শিকারও করা হয়।

কয়েক জাতের শূয়োর ও গরু ছাড়াও বাইরে থেকে আমদানি করা হয়েছে কুকুর, বেড়াল, ছাগল, হাঁস, মুরগী। লেঙ্গুর শুধু (কালো মুখ বিশিষ্ট ধূসর রঙের বানর) কাচাল ও কর নিকোবরে পাওয়া যায়। ওখানে নারকেল ও ফলের বাগানের ওরা বড় ক্ষতি করে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পাখী কিন্তু বেশী নেই! পাখীদের হিসেব দেওয়া শক্ত কারণ নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত তীব্র শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডের অনেক পাখী উড়ে আসে। সারা বছর যে সব পাখী থাকে তারা হল (১) শাহী কবুতর, (২) সবুজ কবুতর, (৩) হলুদ ওরিয়েল, (৪) নানা রঙের মাছরাঙা (সাধারণতঃ কালো সাদা ও হাল্কা নীল রঙের, গলার কাছে সাদা), (৫) সাধারণ চড়ুই, (৬) বৌ কথা কও, (৭) চিল, (৮) কাঠ ঠোকরা, (৯) সবুজ তোতা, (১০) ছোট প্যাঁচা, (১১) ঘুঘু, (১২) হাঁস, (১৩) তিলিশ, (১৪) শালিক, (১৫) ড্রাঙ্গো, (১৬) বক, (১৭) শ্রাইক।

পাখীদের মধ্যে শাহী ও হরিয়াল গ্রামবাসীদের প্রিয়। তারা এদের শিকারও করে। বাবুই পাখীর মত এক রকম পাখীর বাসা ওরা খেয়ে ফেলে। সেগুলি আজকাল লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তবু কোথাও কোথাও দেখা যায়। ধূসর রঙের বুনো শেয়াল কখনো কখনো দেখা যায় কিন্তু এরা এত সেয়ানা যে এদের শিকার করা শক্ত। ডাগর নিকোবরে মেগাপড বলে একরকম দুর্লভ পাখীও দেখা যায়। কাক কিন্তু বড় একটা দেখা যায় না।

সমুদ্র পাখীর মধ্যে সাদা পেট কালো ঈগল পাখী প্রধান। কখনো কখনো বকও দেখা যায়। দ্বীপের অভ্যন্তরে বড় বড় গাছে প্রচুর বাদুড় ঝোলে। নিকোবরীরা বাদুড় শিকার করে পরমানন্দে খায়।

সব রকম সরীসৃপ পাওয়া যায়। অভ্যন্তর ভাগে বৃহৎ অজগর সাপ দেখা যায়। কখনো প্রায় পনের ফুট লম্বা অজগরও চোখে পড়ে। এরা বনাঞ্চলেই থাকে, কদাচিৎ লোকালয়ের কাছে আসে। মুরগী ও ছোট শূয়োর খাবার জন্য। সাধারণতঃ ওরা লোকের ক্ষতি করে না কিন্তু নিকোবরীরা ছুরি দিয়ে ওদের মারে। নানা রকম মেটে সাপ পাওয়া যায় কিন্তু ওরা খুব বিষাক্ত হয় না। সবচেয়ে বিষাক্ত জীব বিছে, এক ফুটেরও বেশি লম্বা তবে বিছার কামড় খুব মারাত্মক হয় না।

আর আছে অসংখ্য ইঁদুর। এরা নারকেল গাছের বড় ক্ষতি করে। নানা রকমের ও নানা আকারের ব্যাঙও পাওয়া যায়।

বর্ষায় সঞ্চিত জলাশয়ে মশা ও নানা রকম কীট-পতঙ্গ জন্মায় এবং কোন কোন দ্বীপে মশা দংশনের ফলে ম্যালেরিয়া ও গোদের সমস্যা এখনো রয়েছে। মাছিও আছে তবে মাছি নিয়ে তত সমস্যা নেই। ফড়িং, উচ্চিংড়ে, গুবরে পোকা ইত্যাদির অভাব নেই। প্রজাপতি দুর্লভ জিনিস, বোধহয় ফুলের অভাবের জন্যই। কিন্তু সামান্য যা দেখা যায় তা অতি সুন্দর রঙবেরঙের।

মধুমক্ষিকাও দেখা যায়, 'বিশেষতঃ ডাগর নিকোবরে' যেখানে

সম্পেনরা মধু সংগ্রহ করে এবং তা অন্য জিনিসপত্রের বিনিময়ে বাইরের লোকদের দেয়। কর নিকোবরে মৌমাছি নেই।

ক্ষেতে-মাঠে রকমারী পতঙ্গ সারাদিন বেশ জোরে গুঞ্জন করে। বিশেষ করে সূর্য্যাস্তের সময় তাদের গুঞ্জনধ্বনি বেড়ে যায়।

প্রচুর ঝিঁঝিঁ পোকা। কালোগুলি নারকেল গাছের ক্ষতিকারক, আক্রমণ করে ওদের সবুজ শুঁড় দিয়ে। সবুজ টিকটিকিও দেখা যায়। বড় বড় গুবরে পোকা, শামুক অনেক। জাপানী দখল কালে বড় গুবরে পোকা দেখা গিয়েছিল। তখন বড় বড় গাছ কেটে ফেলে পচতে দেওয়া হয়েছিল। এগুলি নারকেল গাছ আক্রমণ করে, গাছের গোড়া দুর্ব্বল করে দেয়। অবশ্য জমি বালুকাময় হওয়ায় এদের বিস্তার কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কৃষি বিভাগ থেকে কীটনাশক ঔষধ ছড়িয়ে দেওয়া সত্বেও নারকেলের খুব ক্ষতি হচ্ছে। জাপানী অধিকারে থাকা কালে বাইরে থেকে কিছু গাছ আমদানী করার সময় বড় বড় আফ্রিকান শামুকও এসে পড়ে। এখন এগুলো এত ছড়িয়ে পড়েছে যে, এতে বড়ই ক্ষতি হচ্ছে। মিষ্টি আলু, কলা ইত্যাদি খেয়ে ফেলে এরা খুবই অনিষ্ট করে। এদের বংশ এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে, এদের দমন করা শক্ত। শূয়োররা পেলে কিছু খায় বটে তবু এরা বড় সমস্যার কারণ হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে অভ্যন্তর ভাগে যেখানে এদের প্রচুর দেখা যায়। এদের মারার একমাত্র উপায় হল গরম জল ঢালা বা নুন ছিটিয়ে দেওয়া। কিন্তু নিকোবরীরা একটু কুঁড়ে হওয়ায় এরা নিয়মিতভাবে তা করে না। হাওয়াই থেকে বৃহৎ মাংসাশী শামুক আমদানী করার জন্য কৃষি বিভাগ পরিকল্পনা করছে, যারা এই শামুকেদের খেয়ে ফেলবে।

দ্বীপগুলিতে কিছু সামুদ্রিক প্রাণীও আছে। দ্বীপপুঞ্জের নানা-স্থানে সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবাল কীট ছড়িয়ে আছে, সমুদ্রতলে ভারি মনোরম প্রবাল প্রাচীর তৈরী করে রেখেছে। নানা রঙের, নানা আকারের, নানা গড়নের ঝিনুক, শঙ্খ পাওয়া যায়। গৃহ-

সজ্জার উপকরণ হিসাবে ভ্রমণকারী ও দর্শকদের কাছে রাজা শঙ্খ, রানী শঙ্খ, শামুক ও নানা রঙের ঝিনুকের খুবই চাহিদা।

দ্বীপের চারদিকের জলে মাছ ভরা। বিশেষ করে কামোরটা দ্বীপের বাত্তিমালব, পিলপিল্লোরের কাছে প্রচুর মাছ। প্রচুর মাছ কাচাল, ডাগর ও ক্ষুদে নিকোবরের কাছে। এসব জায়গায় কোথাও কোথাও ছোট ছোট মাছের ঝাঁকে সমুদ্রজল কালো দেখায়। ডাগর নিকোবরের কাছে জলস্রোতে প্রচুর মাছ ভেসে আসে, ফলে ওখানে খুব ভাল কয়েকটি মৎস্যচারণ ক্ষেত্র আছে। মাছের প্রধান জাত হল সার্ডিন, মাকারেল, সিলভার বার, তুনা, মুলে, রে, অ্যাঙ্গেরিস, চাঁদা, টটোম পার্চেস, পমফ্রেট, গলদা চিংড়ি। অক্টোপাসও পাওয়া যায়। উড়ন্ত মাছ ও নানারকম জল সাপও দেখা যায়। হাঙরও আছে তবে তারা তীরের কাছে বড় আসে না; হাঙরের কামড়ের কথা বড় একটা শোনা যায় না।

ডাগর নিকোবরের নদীগুলি কুমীরে ভরা। কর নিকোবরেও কাইমাস্ ক্রীকে একরকম অদ্ভুত কুমীর পাওয়া যায়।

কচ্ছপও পাওয়া যায় তবে বেশী নয়। কারণ দ্বীপগুলির তীরের কাছে গভীর বালুকা বলয় নেই, যেখানে তারা ডিম পাড়তে পারে। কচ্ছপ এখানে খাওয়া হয়। তাদের খোলক দিয়ে ছোট ছোট আংটি ও অলঙ্কার তৈরী করা হয়।

স্থলকাঁকড়া অনেক পাওয়া যায়, এদের খোলক প্রায় আড়াই ইঞ্চি; সাধারণতঃ সমুদ্র তীরে, রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। রাত্রেই ওরা বেরিয়ে আসে। কর নিকোবরের কাকানা গ্রাম কাঁকড়ার জন্য বিখ্যাত। এই দ্বীপের কাছে পূর্ণিমা বা তার কাছাকাছি দিনে কাঁকড়ারা সমুদ্রের দিকে যায়। নিকোবরীরা শুধু হাতে বা কাঁটা দিয়ে এদের ধরে আর মজা করে খায়।

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রাম

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও সমস্ত জনপদ উপকূল সমীপবর্ত্তী। কারণ অতীতে সমস্ত যাতায়াত সমুদ্রপথেই হত। মাছধরা ছিল লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রধান অঙ্গ। অবশ্য কর নিকোবর ও চাওড়াতে প্রধান গ্রাম সমুদ্রতীর থেকে দু'শ তিনশ গজ ভেতরের দিকে নারকেল তরুশ্রেণীর অন্তরালে অবস্থিত, যাতে জনপদবাসীরা প্রবল সামুদ্রিক হাওয়ার অভিঘাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কর নিকোবরে সমুদ্রতীরের সৈকতভূমির উপরে কয়েকটি কমিউনিটি হাউস বা সমষ্টি ভবন আছে। এইসব ভবনের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল পরিচ্ছন্ন বারোয়ারী গৃহ বা এল পানাম। এটি একটি বৃহৎ সুনির্ম্মিত দালান; গ্রামবাসীরা এটার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এটার একদিকে অতিথিভবন এবং অন্যদিকে সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যেমন বাইচ খেলা, গাঁয়ের ভোজ এবং নানা ঋতু উৎসব পালন।

পরিচ্ছন্ন সমষ্টি ভবনের কিছু দূরে সমুদ্রতটের উপরেই দুটি অপরিচ্ছন্ন কমিউনিটি হাউস, ওরা এটাকে বলে জন্ম ও মৃত্যুগৃহ। নিকোবরীরা বিশ্বাস করে জন্ম ও মৃত্যুর রীতি অপরিচ্ছন্ন তাই দুটিই থাকবে প্রধান গ্রামের বাইরে, লোকের বাসগৃহের সীমা ছাড়িয়ে। সর্ব্বসাধারণের জন্ম ও মৃত্যুর গৃহও এই সমস্ত গ্রামের দ্বারাই সংরক্ষিত হয়, কিন্তু অশুচি বলে ঘর দুটির ওপর সবচেয়ে কম নজর দেওয়া হয়; তাই ঘর দুটি বড় নোংরা থাকে। কর নিকোবরে সাধারণতঃ শ্মশানও সমুদ্রতীরে অবস্থিত মৃত্যুগৃহের পাশেই সুরক্ষিত প্রাচীর ঘেরা স্থানে।

জন্মগৃহের পিছনে প্রায় একশো গজ ভিতরের দিকে, কিন্তু আসল গ্রাম থেকে দূরে কতকগুলি কুঁড়ে ঘর আছে। প্রতিটি ঘর গ্রামের

বিভিন্ন পরিবারের অধিকারভুক্ত। এগুলিকে প্রসূতি ঘর বলে, এখানে প্রসবের এক সপ্তাহ পর মা চলে আসে শিশুকে নিয়ে আর সঙ্গে থাকে পরিবারের কোন লোক। আপন বাসগৃহে ফিরে যাবার আগে প্রায় বছর খানেক থাকে। কর নিকোবরে আসল গ্রাম সমুদ্রতট থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে থাকে। গাঁয়ের মাঝখানে থাকে বড় একটি খোলা মাঠ। মাঠের জমি বেশ শক্ত, সমুদ্র-তীরের বালু এনে পিটিয়ে পিটিয়ে তৈরী করা। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত গ্রামে এই মাঠ বিশেষ প্রয়োজনীয়, কারণ গ্রামের সব সম্মেলন, খেলাধূলা, নৃত্য এবং অন্যসব সামাজিক ক্রিয়াকর্ম যেমন পল্লীর ভোজ এবং উৎসব সব কিছুই এখানে হয়।

একটি গ্রাম নানা অংশে ভাগ করা, প্রতি ভাগের ছোট ছোট কয়টি কুঁড়ে ঘর আছে। যদিও পল্লীর অধিকাংশ হিস্যাই পরস্পর সংলগ্ন। কেবলমাত্র গুটি কয়েক গাছের, একটুখানি মাঠের বা খোলা জায়গার দ্বারা পৃথক করা, তবু কয়েকটি বিভাগ আবার প্রধান গ্রাম থেকে বেশ দূরে এবং অভ্যন্তর ভাগে অবস্থিত।

কয়েকটি কুঁড়ে ঘর নিয়ে গ্রামের এই ছোট ছোট হিস্যাকে বলে 'তাহেত'। যত্রতত্র এগুলি অবস্থিত কারণ অতীতে লোকে যখন জঙ্গল আবাদের জন্য পরিষ্কার করেছে তখন আবাদী ক্ষেত্রের কাছেই তাদের কুঁড়ে ঘর তৈরী করেছে। জনসংখ্যা ও গ্রামের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ লোক একত্র হয়ে গ্রামের প্রধান জায়গায় বাস করতে স্থুরু করেছে এবং এখন তো 'তাহেত'-গুলিও প্রায়ই পরস্পর সংলগ্ন। কতকগুলি 'তাহেত' আবার অভ্যন্তর ভাগে রয়েছে এবং লোকেদের বহুদূর বিস্তৃত আবাদী ক্ষেত দেখাশোনা করার পক্ষে তা প্রয়োজনীয়ও বটে।

গ্রামের বিভাগগুলি আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারপ্রধান-দের কেন্দ্র করে হয়েছে। একজন পরিবারপ্রধান এবং তার নিকটতম আত্মীয়রা একটি একক 'তাহেত' বা গ্রামের একটি হিস্যাকে পরিচালনা করে।

গ্রামগুলির বসতি অঞ্চলের পিছনের দিকে ; দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তর ভাগে গভীর জঙ্গল। কিন্তু এই অভ্যন্তর ভাগকে ফেলে রাখা হয়নি। যেখানে জমি উপযোগী সেখানে কোথাও কোথাও নারকেল, সুপারি, মিষ্টি আলু, কলা এবং অন্যান্য ফল ও সব্জির চাষ হচ্ছে। অন্য জায়গায় ঘাসের জমি রেখে দেওয়া হয়েছে ঘর ছাওয়ার জন্য। আবার কাঠ সরবরাহ এবং লোকের ঘরের জন্য অনেক জায়গায় বনাঞ্চল সংরক্ষিত হয়েছে। বেত বাঁশ জ্বালানীর কাঠ—সব কিছুরই এটা উৎস।

নিকোবরীদের কাছে দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগও প্রয়োজনীয় এবং কর নিকোবর ও চাওড়ার মত ঘন বসতিপূর্ণ জায়গায় জঙ্গল এলাকার প্রতি বিন্দু জমি বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রামগুলি খুবই সুন্দর। বিশেষতঃ কর নিকোবর এবং চাওড়ার গ্রামগুলি অত্যন্ত মনোরম। অন্য গাঁয়ের চেয়ে এখানকার গ্রামগুলি বেশি পরিষ্কার, ঘরগুলিও অনেক বেশি সুন্দর করে তৈরী। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রামের এক দিকে দিগ্‌দিগন্তব্যাপী মহিমাময় সমুদ্র। তীরের কাছে সাধারণতঃ সমুদ্রের রঙ হাল্কা নীল। সমুদ্রতলের প্রকৃতি ও গুণ অনুযায়ী জলের রঙ বদলায়, তীর থেকে দুশ গজ অবধি নীলে সবুজে মেশা নানা বর্ণচ্ছটা চোখে পড়ে। জল অত্যন্ত স্বচ্ছ, এত স্বচ্ছ যে, সাগর যখন শান্ত থাকে ও সাগর জলে থাকে না ঢেউয়ের কোন বিক্ষেপ তখন নানা রঙের ও নানা আকারের নয়ন মনোহর শঙ্খ, ঝিনুক, প্রবাল সমুদ্রতলে স্পষ্ট দেখা যায়। তীর থেকে প্রায় দুশ গজ দূরে সমুদ্রের উপরিভাগে অতি সুন্দর গভীর নীল জলের উপর দুগ্ধ-শুভ্র উর্মিমালার সফেন তরঙ্গ।

অধিকাংশ গ্রামে সমুদ্রের বেলাভূমির ঢাল একটু খাড়া, ফলে জলের একেবারে কিনারে বিশাল ঢেউ তীরের উপর প্রচুর দুগ্ধধবল ফেনরাশি উদ্গীরণ করে ভীমবেগে আছড়ে পড়ে। বেলাভূমির বালি ধবধবে সাদা, নানা রঙের ও নানা আকারের শঙ্খ, ঝিনুক

ও সামুদ্রিক প্রাণীর খোলায় বিকীর্ণ, সূর্য্যালোকে সবকিছু ঝকমক করতে থাকে।

বেলাভূমির ভিতর দিকে কিনারে কিছু ছোট ছোট গাছ এবং বিপুল কেনায়া বৃক্ষ। সেই সব বৃক্ষের প্রশস্ত ঘন সবুজ পাতার ছায়া তীরের সৈকত ভূমিতে পড়ে। কিছু বুনো প্যান্ডানাস তরুর দীর্ঘ ঘাসের মত পাতায় দ্বীপের চেহারা আরো মোহময় লাগে। এদের পেছনে কোথাও বা বালুকাময় বেলাভূমির একেবারে উপরে নারকেলের দীর্ঘ তরুশ্রেণী—সোজা উঠে গেছে সহজ সুন্দর লাবণ্যে; শীর্ষদেশে পল্লব-মুকুটের মনোহর শোভা।

তীরভূমি থেকে নারকেল গাছের শ্রেণীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে প্রধান গ্রাম। সেখানে নানা আকারের বাসগৃহ। কোনটা গম্বুজের আকৃতি। অষ্টকোণ বিশিষ্ট কোনটা, টালির ছাদওয়ালা উন্নততর গৃহ, দুটো একটা পাকা বাড়ী একটি খোলা জায়গা ঘিরে বাড়ীগুলি দাঁড়িয়ে আছে। একটির চেয়ে অন্যটি পৃথক। সারা গ্রাম ঘিরে, বাসগৃহগুলির আশেপাশে সর্বত্র নারকেল গাছ। কর নিকোবরের গ্রামগুলিতেও সুন্দর ব্রেড ফ্রুট গাছ এখানে সেখানে। এই গাছগুলির গভীর খাজকাটা সরু ঘন সবুজ পাতা, কাশ্মীরের চিনার গাছের পাতার মত। এই সব গাছের পত্রচ্ছায়ায় পল্লী অঞ্চল স্নিগ্ধ সুন্দর দেখায়। চাঁদনি রাতের আলোছায়া গ্রামগুলিকে অপরূপ মোহময় করে তোলে।

যাতায়াত

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যাতায়াতের প্রধান রাস্তা সমুদ্রের পথ। কর নিকোবর ছাড়া রাস্তার উন্নতি কোথাও করা হয়নি। তাই দ্বীপের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে সমুদ্রপথে ডোঙ্গায় করে যেতে হয়। যাতায়াতের এটাই সাধারণ ব্যবস্থা। নিকোবরীরা সুদক্ষ নাবিক, তাদের জীবনের সঙ্গে সমুদ্রের নিবিড় সম্পর্ক আছে বলে সমুদ্রের অশান্তপনাকে তারা ভয় পায়না।

দুটি একটি লোক ডোঙ্গায় চেপে তীর থেকে ছ-সাত মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে সারারাত মাছ ধরে বেড়াচ্ছে ; এটা মোটেই অস্বাভাবিক দৃশ্য নয়। সমুদ্র সম্পর্কে তাদের গভীর জ্ঞান, বিচক্ষণতা, সমুদ্রে যে কোন কঠিন অবস্থা সামলে নেবার ক্ষমতা, ডোঙ্গা চালনার অসীম দক্ষতা—এসব কিছুর জন্য সমুদ্রে দুর্ঘটনায় প্রাণহানি বড় একটা হয় না বললেই হয়।

নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত সমুদ্র যখন শান্ত থাকে লোকে তখন ডোঙ্গায় চড়ে অন্য দ্বীপে যায়। তাদের কাছে ডোঙ্গা বড় নিরাপদ যান।

সমুদ্রের মেজাজ সম্পর্কে নিকোবরীদের অদ্ভুত জ্ঞান। জোয়ার ভাঁটার অবস্থা, সমুদ্রের প্রকৃতি ও স্রোতের গতি সম্বন্ধে তারা নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে। ঢেউ গোনার রীতিও তাদের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার আগে কতক্ষণ স্তব্ধ থাকবে আর ডোঙ্গায় চড়া বা ডোঙ্গা থেকে তীরে নামা কখন অনুকূল হবে, তারা এসব ঠিক ঠিক জানে। বস্তুতঃ ওদের এ সম্পর্কে অদ্ভুত জ্ঞান আছে তাই রক্ষা, নয়ত সমুদ্রে ডোঙ্গায় রওনা হবার কালে বা ফিরে আসবার সময় যদি ভুল তরঙ্গের উপর সওয়ার হওয়া যায় তাহলে ডোঙ্গা একেবারে কাত হয়ে উল্টে যাবে আর ডোঙ্গার লোকেরা জলে পড়ে যাবে।

কিছু সরকারী ও বেসরকারী জাহাজ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে যাতায়াত করে ও দক্ষিণ আন্দামানে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের হেড কোয়ার্টার পোর্ট ব্লেয়ারের সঙ্গে দ্বীপ সমূহের যোগাযোগ রাখে।

ভারতের মূল ভূখণ্ডে যেতে কর নিকোবর ও পোর্ট ব্লেয়ার হয়ে সরকারী জাহাজ শুধু মাদ্রাজ ও কলকাতার মধ্যে যাতায়াত করে। কর নিকোবরে এইরকম জাহাজ গড়ে মাসে একবার আসে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নোঙর করার জায়গা বা পোতাশ্রয়ের কাজে লাগে এমন সুরক্ষিত সমুদ্র এলাকা খুব কম আছে। কোন জেটিও

নেই যেখানে বড় জাহাজ এসে ভিড়তে পারে। সেইজন্য জাহাজ তীর থেকে অনেক দূরে নোঙর করে। যাত্রী ও মাল মোটর লঞ্চে নামিয়ে তীর থেকে একশ গজ দূরে নিয়ে এসে আবার ছোট ছোট ডোঙ্গায় করে তীরে নামান হয়। কোন কোন জায়গায় আবার মোটর লঞ্চও নেই। সেখানে যাত্রী ও মাল জাহাজ থেকে সরাসরি ডোঙ্গায় করে তীরে নিয়ে আসা হয়। এই অবস্থায় মাল খালাস ও বোঝাই করা বেশ বিপজ্জনক, কিন্তু নিকোবরীরা এ কাজে ওস্তাদ হয়ে গিয়েছে।

এখন কর নিকোবরের মালাক্কা ও মাস গ্রামে, কামোরটার হেড কোয়ার্টার এলাকায় পাকা জেটি তৈরী হচ্ছে। কাচাল দ্বীপের কাপাঙ্গাতে এবং ডাগর নিকোবরের ক্যাম্পবেল উপসাগরে পণ্টুন জেটি বা নৌকার সেতুও নির্ম্মিত হচ্ছে। এইসব জেটিতে মাল খালাস ও মাল বোঝাই করার কাজের যথেষ্ট সুবিধা। নয়ন কার্ডরি দ্বীপের চাম্পিনে একটি কাঠের জেটিও তৈরী হচ্ছে, সেখানে ছোট ছোট জাহাজ ভিড়তে পারে।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর সাপ্তাহিক প্লেন সার্ভিস কর নিকোবর ও কলকাতার কাছে বারাকপুরের মধ্যে যাতায়াত করে। দ্বীপের জরুরী ডাক এতেই আসে কিন্তু অসামরিক যাত্রীরা এই প্লেনে ভ্রমণ করতে পারে না। যে সব অসামরিক যাত্রী ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আসতে চায় তাদের কলকাতা ও পোর্ট ব্লেয়ারে যাতায়াতকারী ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস করপোরেশনের সাপ্তাহিক প্লেনে আসতে হয়। এই প্লেন অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত নির্ম্মল আকাশে চলাচল করে।

কর নিকোবরে দ্বীপের অভ্যন্তরে যাতায়াতের জন্য নয়া সড়ক তৈরী হয়েছে। বত্রিশ মাইল লম্বা রাস্তা এই দ্বীপ ঘিরে আছে। দ্বীপের সমস্ত পল্লীকে যুক্ত করে পাকা সড়ক উপকূল ঘিরে বেষ্টন করে গেছে। ষোল ফুট চওড়া বেশ ভাল রাস্তা। কাকানা গ্রামের সঙ্গে হেড কোয়ার্টারকে যুক্ত করে একটি পাকা রাস্তা তৈরী

হচ্ছে। পাকা রাস্তা থেকে অনেক কাঁচা সড়ক ও পাকদণ্ডী বেরিয়ে চলে গেছে দ্বীপের ভিতর দিকে, লোকের ক্ষেত আবাদের দিকে।

কর নিকোবরে এখন সরকারী বাস সার্ভিস আছে। আরং, সাওয়াই, টেকটপ ছাড়া সব গ্রাম ও হেড কোয়ার্টারের মধ্যে বাস চলাচল করে। দ্বীপের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারী বিভাগ ও ট্রেডিং কোম্পানির অনেক যানবাহন রাস্তায় চলাচল করছে।

রাস্তায় চলাচলের রীতিনীতি সম্বন্ধে নিকোবরীরা খুবই সজাগ। মোটর গাড়ীর সামান্য আওয়াজেই তারা সরে গিয়ে রাস্তা খালি করে দেয়। তবে তাদের পোষা জানোয়ার বিশেষ করে শূয়োরগুলিকে (যাদের স্বভাব হল অসতর্কভাবে যানবাহনের সামনে দিয়ে ছুটোছুটি করা) নিয়ে মোটর চালকের অবস্থা বড়ই করুণ। সেইজন্যই শূয়োর নিয়ে রাস্তায় দুর্ঘটনা হামেশাই হয়। আগে তো লোকে এসব দুর্ঘটনা খুব খারাপভাবে নিত, প্রতি শূয়োরের বিনিময়ে এক থলি চাল চাইত। এখন ওরা বুঝতে পেরেছে যে, মোটর চালকেরই সব সময় দোষ নয়। তবু যখনি দুর্ঘটনা ঘটবে, মোটর চালক গাড়ী থামিয়ে আগে গ্রাম প্রধানকে খবর দেবে-এখনো এটা ওরা আশা করে।

পাকা সড়ক হবার পর কর নিকোবরে সাইকেল খুব জনপ্রিয় হয়েছে। ছেলেমেয়ে সবাই এখন দক্ষ সাইকেল চালক, কিন্তু এটা ভারি মজার ব্যাপার যে, এই সেদিন পর্য্যন্ত লোকে সাইকেলে ব্রেক লাগাতে চাইত না। স্থানীয় যে দোকান থেকে সাইকেল কিনত ব্রেক সেখান থেকেই দূর করে দিত। কর নিকোবরে গরুর গাড়ীও কিছু দেখা যায়। ছাগলে টানা ও মানুষে টানা গাড়ীও দেখা যায়। ভারতের মূল ভূখণ্ডে যেমন দেখা যায় গাড়ীগুলি সেইরকমই ; ওখানকার গ্রামেই তৈরী, যদিও চাকা ও চাকার আষদণ্ড বাইরে থেকে আনতে হয়।

এইসব গাড়ীতে করে প্রধানতঃ নারকেল ও অন্যান্য ফসল নেওয়া

হয়। একে তো গাড়ীগুলো সব সময় যে প্রথম শ্রেণীর থাকে তা নয় তার উপর অতিরিক্ত মাল বোঝাই করার ফলে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। সেইজন্য প্রায়ই দেখা যায় রাস্তার পাশে গাড়ী উল্টে পড়ে আছে।

এসব ছাড়াও কর নিকোবরে কাচালে নতুন সড়ক নির্ম্মাণ হচ্ছে ষোল মাইল লম্বা, পূর্ব্ব উপকূলে কাপাঙ্গা থেকে শুরু করে পশ্চিম উপকূলে ওয়েস্ট বে কাচাল পর্যন্ত। এই রাস্তা নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হলে দ্বীপের মধ্যে যাতায়াতের সমস্যার অনেক সুরাহা হবে এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্ম্মেরও সুবিধে হবে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সব দ্বীপগুলিতে নিকোবরীরা স্থান থেকে স্থানান্তরে পদব্রজে যাতায়াত করে। ওরা আবার একলা চলা পছন্দ করে না, সাধারণতঃ দল বেঁধে যায়। যদিও চলে অলস পদক্ষেপে, তবু অনেক দূর চলতে পারে এবং ভারি বোঝা বহন করে নিতে পারে। সাধারণতঃ তারা লাঠির মাথায় বোঝা বেঁধে নিয়ে কাঁধে বহন করে।

পানীয় জল

চাওড়া ছাড়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মনুষ্য অধ্যুষিত সমস্ত দ্বীপেই প্রচুর পরিমাণে পানীয় জল পাওয়া যায়। পানীয় জলের সাধারণ উৎস হল কূপ। ডাগর নিকোবরে তাজা পানীয় জলের স্রোতস্বিনী আছে। অন্য দ্বীপের দু-একস্থানে, যেমন কামোরটার রামজাউতে, নানকাউরির তাপঙে ঝরনাও আছে। সমুদ্রতটের কাছে কখনো কখনো আট দশ ফুট মাটির নীচে মিঠা জল পাওয়া যায় কিন্তু অভ্যন্তর ভাগে প্রচুর জল পাবার জন্য ত্রিশ চল্লিশ ফুট মাটি খুঁড়তে হয়। ভাল জল কোথায় পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে নিকোবরীদের অদ্ভুত জ্ঞান, কূপ খননের জন্য তারা সবসময় সঠিক স্থান নির্ব্বাচন করে।

প্রধানতঃ তিন প্রকারের কূপ। প্রথমতঃ একেবারে পুরানো কুয়ো যেগুলিতে প্রচুর জল জমা করে রাখার জন্য নালা খুঁড়ে রাখা হয়েছে। এসব কুয়োর কিনারা অমসৃণ এবং অসমতল। কয়েকটির জল টেনে তোলা মুখের উপর একটার পর একটা কাঠের গুঁড়ি প্রায় তিন ফুট উঁচু করে বসান হয়েছে, দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য।

পরিত্যক্ত ড্রাম একটার পর একটা বসিয়ে কুয়োর প্রাচীর তৈরী করে দ্বিতীয় প্রকারের কূপ নির্ম্মিত হয়েছে। কুয়োটা সুরক্ষিত রাখার জন্য সবচেয়ে উপরের ড্রামটা মাটি থেকে দু'তিন ফুট উঁচুতে বসান হয়েছে।

তৃতীয় এবং সবচেয়ে উন্নত ধরনের ইঁদারা সিমেণ্টে নির্ম্মিত এবং আগাগোড়া প্লাস্টার করা। বুক সমান প্রায় তিন চার ফুট উঁচু পাকা সিমেণ্টের দেয়াল এক থেকে দু'ফুট চওড়া। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক থেকে সিমেণ্ট ও কারিগরদের সাহায্য নিয়ে নিকোবরীরা নিজেরাই এই কুয়ো তৈরী করে। অনুন্নত সম্প্রদায়ের কল্যাণমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য। অন্য দ্বীপ-গুলিতে পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের দ্বারা ইঁদারা তৈরী হয়েছে।

জল তোলার জন্য একটি শক্ত বাঁশ বা খুঁটি খাড়া করে মাটিতে পোতা হয়। এটির সঙ্গে আড়া-আড়িভাবে আর একটি বাঁশ বা খুঁটি বাঁধা হয় আর পেছনের দিকে ভারী কিছু একটা বাঁধা হয়, আর এটার অপর প্রান্তের দিকে বাঁধা থাকে একটি শিকল বা দড়ি ইঁদারার গভীরতার মাপে। জল ভরার সময় দড়ি টেনে বালতি ইঁদারার মধ্যে নামান হয়, দড়ি ছেড়ে দিলে বাঁশটা নীচে বাঁধা ভারের টানে আকাশের দিকে উঁচু হয় আর সঙ্গে সঙ্গে জল-ভরতি বালতি উপরে উঠে আসে।

নিকোবরীরা পরিষ্কার জল খাবার ব্যাপারে বিশেষ সচেতন। তাদের পানীয় জলের কূপ আছে আবার স্নান ও ধোয়ার জন্য আলাদা কূপ।

গৃহপালিত পশুদের কাছ থেকে রক্ষা করার জন্য কখনো কখনো পানীয় জলের কূপ নারকেল পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অনেক



বুড়ো মানুষ পরিষ্কার জলের জন্য এত সাবধানী যে, তাঁরা শুধু তাঁদের নিজেদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ইঁদারা থেকে জল পান করেন, অন্য কাউকে সে জল স্পর্শও করতে দেন না। তাছাড়া গ্রামে কারো মৃত্যু ঘটলে কখনো কখনো বুড়োরা তাঁদের কুয়ো পক্ষকাল ধরে ঢেকে রেখে দেন যাতে মৃতদেহ থেকে কোন বীজাণু হাওয়ায় উড়ে এসে কুয়োতে না পড়ে। এটা লক্ষ্য করে মজা লাগে যে, এরকম কুয়ো যা অপরের স্পর্শ নিষিদ্ধ করে বিশেষভাবে পরিষ্কার রাখা হয় তাকে বলে 'হিন্দু কুয়ো'। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে হিন্দুরা যেভাবে একটা আচারগত শুচিতা রক্ষা করে এ যেন তারই অনুকরণ!

সাধারণতঃ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জল সুস্বাদু তবে বিজ্ঞানীরা যাকে বলে খরা জল, তাই। বিশেষকরে অভ্যন্তর ভাগের কুয়োর জল তো বটেই।

চাওড়াতে জল সমস্যার এখনো কোন সন্তোষজনক সমাধান হয়নি। দ্বীপ এত ছোট যে ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত খরার দিনে ইঁদারাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে মিঠাজল থাকেনা বরং লোনা জল আসে। লোকেরা বছরের পর বছর ধরে এই সমস্যার সমাধান করেছে কতকটা

এই লোনা জলে অভ্যস্ত হবার চেষ্টা করে, কতকটা পাশের দ্বীপ টেরাসসা থেকে শূন্য নারকেলের খোলায় করে জল বয়ে নিয়ে এসে। দ্বীপে পানীয় জলের সমস্যা দূর করার জন্য পাব্লিক-ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট কয়েক বছর আগে একটি জলাধার নির্ম্মাণ করেছিল, এই আশায় যে, এতে বর্ষার সঞ্চিত জল খরার মাসগুলিতে কাজ দেবে। তবে জলাধার সিমেণ্টে তৈরী হয়েছে বলে এখানকার তুকতাকের ঐন্দ্রজালিক ডাক্তারেরা এবং দ্বীপের অন্য অনুন্নত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা এর তীব্র বিরোধীতা করে। তাঁদের ভয় হল এতে লোকের অনেক বেশী ক্ষতি হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ জলাধারটি নির্ম্মিত হবার পর হাঁস মুরগী ও শূয়োরদের মধ্যে মড়ক লেগে গেল এবং কিছু প্রাণী মারাও গেল। এতে তুকতাকের ডাক্তারেরা তো পেয়ে বসল। একরাতে তারা এবং তাদের অধীনস্থ অন্য লোকজন জলাধারটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিল। আবার এও ওরা বলে যে, ক্ষতিকারক বস্তুগুলো সমুদ্রে ফেলে দেবার পর দ্বীপের চারদিকের সমুদ্র আরো অশান্ত হয়েছে।

চাওড়াতে বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য একটি জলাধার নির্ম্মাণের কত যে উপযোগীতা সরকারী কর্ম্মচারীরা তা লোকেদের বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত লোকেদের কুসংস্কার এবং যাদুকর ডাক্তারদের প্রভাব এই কাজে একটি অপ্রতিরোধ্য বাধা হয়ে আছে। পানীয় জলের অভাব দ্বীপে এখনো আগের মতই তীব্র।

পঞ্চম অধ্যায়

অধিবাসী

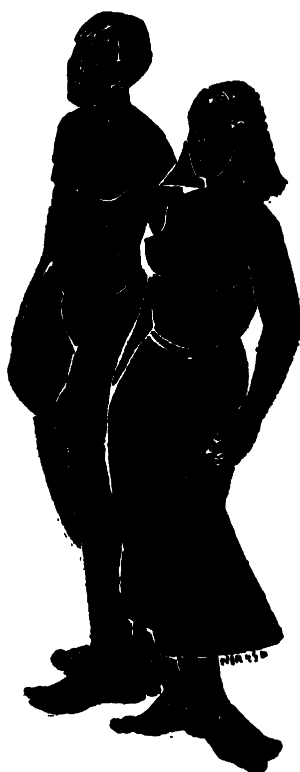
ডাগর নিকোবর দ্বীপের স্বল্প সংখ্যক সম্পেনরা ছাড়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা একই গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত। চেহারায়, ভাষায়, রীতিনীতিতে যে সামান্য পার্থক্য আছে তা শুধু আঞ্চলিক বৈচিত্র্য মাত্র, বংশগত কোন অসাম্যের জন্য নয়।

নিকোবরীরা এই সব দ্বীপের মূল অধিবাসী অথবা তারা বাইরে থেকে এসেছে কিনা তা এখনো সঠিক নির্ণয় করা হয়নি। এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার মত কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি।

নিজেদের জন্ম সম্পর্কে নিকোবরীদের মধ্যে কয়েকটি গল্প প্রচলিত আছে। তার মধ্যে একটি হল, একদা এক রাজকুমারী বিবাহের পূর্ব্বেই অন্তঃসত্ত্বা হয়। রাজা তাকে নির্ব্বাসন দিলে সে নৌকায় চড়ে ভেসে যায়। ভাসতে ভাসতে তরী এসে ঠেকল কর নিকোবরের পূর্ব্ব উপকূলে, এখন যেখানে বড় লাপাটি গ্রাম সেখানে। রাজকুমারীর একটি পুত্র সন্তান হল। বছর কয়েক পর তার সঙ্গেই রাজকুমারীর যৌন সম্পর্ক হল। ছেলেকে সে দ্বীপের মধ্যে অন্য কোথাও যেতে বললো এবং ছেলে অন্যত্র চলে গেল। রাজকুমারী তখন এক সুন্দরী কুমারীর বেশে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। এই ভাবে মায়ের সঙ্গে মিলনের ফলে যে বংশের উৎপত্তি তারাই প্রথম নিকোবরী জাতি।

এ গল্পের সত্যতা কতখানি বলা শক্ত কিন্তু এ কথা সুনিশ্চিত যে, কর নিকোবরে এখন যেখানে বড় লাপাটি গ্রাম সেখানে প্রথম অধিবাসীদের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দ্বীপের অন্যত্র লোক ছড়িয়ে পড়তে লাগল আরো জমি ও জীবিকার অন্বেষণে, আর এই ভাবেই দ্বীপের নানা জনপদ গড়ে

উঠতে লাগল। এটা উল্লেখযোগ্য যে, কর নিকোবরীরা এখনো বড় লাপাটিকে তাদের পূর্ব্বপুরুষের গ্রাম বলে মনে করে। দ্বীপবাসীরা সমবেতভাবে যেসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং বিশিষ্ট অভ্যাগতদের স্বাগত জানায় সেই সব অনুষ্ঠান এই গ্রামেই হয়। কয়েক বছর আগে পর্য্যন্ত দ্বীপের বিভিন্ন গাঁয়ের অধিবাসীরা মৃতদেহ বড় লাপাটি গ্রামেই কবর দিত, দ্বীপের মোড়ল বা সর্দ্দার এই গ্রাম থেকেই নির্ব্বাচিত হতো। আজকাল অবশ্য এই সব পুরনো প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছে।



এটাও খুব সম্ভব মনে হয় যে, কেবল কর নিকোবরের অধিবাসীরাই নয়, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত দ্বীপের অধিবাসীরাই আগে একটি দ্বীপে একই জায়গাতেই থাকত, সেখান থেকে তারা বিভিন্ন দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছে। আর যেহেতু বিভিন্ন দ্বীপের অধিবাসীরা সাধারণতঃ একটি দ্বীপকেই তাদের পিতৃভূমি বলে মনে করে না অথবা অন্য কোন প্রমাণও নেই বলে এ ব্যাপারে সঠিক করে কিছু বলা যায় না।

সুদূর অতীতে নিকোবরীদের বাইরে থেকে এই সব দ্বীপে আসার সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বটে তবু বহু শতাব্দী ধরে বাইরের অন্য কোন সাংস্কৃতিক প্রভাব থেকে তারা বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং এখন তারা সম্পূর্ণ একটি পৃথক সাংস্কৃতিক সত্তার অধিকারী হয়েছে। তাদের জীবনযাত্রার

রীতি, ভাষা এবং সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থা অন্যান্য জাতির থেকে আলাদা।

সাধারণতঃ এদের আকৃতি মঙ্গোলয়েড। তবে অধিকাংশ মঙ্গোলয়েড জাতের লোকের চেয়ে তারা অনেক স্বাস্থ্যবান এবং তাদের বর্ণ কৃষ্ণতর। তাদের সুগঠিত মাংসল দেহ। এদের মধ্যে পাতলা রোগা চেহারার লোক সত্যিই বিরল। চোয়ালের হাড় বেশ উঁচু, অন্য মঙ্গোলয়েডদের ততটা নয়। সাধারণতঃ নাক ছোট ও চ্যাপ্টা তবু অধিকতর তীক্ষ্ণ। কারো কারো বেশ সুগঠিত তীক্ষ্ণ নাক এবং একহারা গড়ন। অন্য মঙ্গোলয়েডদের মত তাদের চুলও অত সিধা নয়, কারো-বা ঢেউ খেলান চুল। রঙ কালো ও বাদামী থেকে নিয়ে বেশ পরিষ্কার। কোন দ্বীপে বিভিন্ন গাত্রবর্ণের লোক দেখা যায়; কর নিকোবরের লোকেরা অন্য দ্বীপের অধিবাসীদের চেয়ে কালো। বিশেষতঃ দক্ষিণ দিকের দ্বীপগুলি, পুল্লোমিল্লো ক্ষুদে নিকোবর, কোন্দুল এবং ডাগর নিকোবরের লোকেদের রঙও বেশ পরিষ্কার। নিকোবরীরা খুব লম্বা নয়। খুব খর্ব্বাকৃতিও নয়। গড়ে পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা। চামড়া মসৃণ। বোধহয় তৈল মর্দ্দন করার জন্য। অতিরিক্ত পান খায় বলে মুখ সর্ব্বদা খোলা, শৈশব থেকে মুখ বুজে থাকার শিক্ষা ওদের মার কাছে ওরা কখনো পায়ই নি। ওরা খুব বলিষ্ঠ পদক্ষেপে হাঁটে না। মনে হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বুঝিবা একটু শিথিল, বোধ হয় গাছে চড়ার জন্যে। গাছে চড়ায় ওরা অতি শৈশব থেকেই অভ্যস্ত এবং এই জন্যই ওদের পাগুলি কিছুটা ধনুকের মত বাঁকানো। চলে লঘু পদক্ষেপে। পা দুটি শরীরের দিকে একটু তেরচা, গতি একটু মন্থর। হাঁটার রীতি অবশ্য ক্রমেই উন্নত হচ্ছে। এখন অনেক তরুণই, বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বেশ দ্রুত ও সপ্রতিভ ভাবে চলাফেরা করে।

নিকোবরীদের ললাট সুগঠিত। চোখ অল্পবিস্তর ফোলা ফোলা।

অতিরিক্ত ধূমপান, পান চিবানো ও তাড়ি খাওয়ার জন্য ওদের দাঁত খারাপ।

অল্প বয়সীরা সাধারণতঃ সুদর্শন। নিকোবরী শিশুরা বেশ হাসিখুশি, মুখ কৌতুকোজ্জ্বল। চেহারা মধুর ও নিষ্পাপ, আপন ভোলা।

প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ পর্য্যন্ত ওদের চেহারা বেশ ভাল থাকে। নারীর চেয়ে পুরুষদের চেহারা প্রিয়দর্শন। তরুণদের সুগঠিত পেশল দেহ, আপন ভোলা দৃষ্টি ও হাসিমুখ তাদের চেহারায় একটা অদ্ভুত মাধুর্য্য এনে দিয়েছে। যে সব তরুণের নাক মুখ চোখ আর একটু বেশি কাটা কাটা এবং চেহারা একটু ভাল তারা তো চোখে লাগার মত সুশ্রী। তরুণীদের দেহও সুগঠিত, তন্বী ও মাধুর্য্যময়ী। তাদের মধ্যে বেশ সুন্দরীও যে না পাওয়া যায় তা নয়। তবে বোধহয় বাইরের শ্রমশীল কাজের জন্যই অধিকাংশ নারীরই বেশ পুরুষালী চেহারা। সেটি অবশ্যই সৌন্দর্য্যের হানিকর। অধিকাংশ নারীরই চ্যাপ্টা স্তন যদিও নিকোবরীদের মধ্যে এটা বিশেষ সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক নয়।

পঁয়ত্রিশের পরই প্রায় অতিরিক্ত পান ও তাড়ি খাওয়ার ফলে ওদের দেহের সৌন্দর্য্য ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌকুমার্য্য নষ্ট হতে থাকে। ওদের জীবনের বহির্মুখী স্বভাবের দরুন বয়স্কদের চেহারায় একটা রিক্ততার ভাব ফুটে ওঠে। তাছাড়া ওদের খাদ্যের শ্বেতসার অংশের আধিক্যের জন্যও দেহ স্থূল হয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নর-নারীই খুব মোটা হয়ে পড়ে।

এখানকার লোকের আয়ু দীর্ঘ, সত্তর আশি বয়সের উপর অনেক লোককে দেখা যায়। নিকোবরীদের চেহারার একটা বিশেষত্ব এই যে, এদের বুড়ো মনে হয় না। এদের যথার্থ বয়স অনুমান করা শক্ত।

ছেলেদের দাড়ি গোঁফ কম। চেহারার তারুণ্যের এও কতকটা কারণ বটে। চুল কালো, খুব কম লোকেরই চুল পাকে।

বুড়োদের নিজেদের বয়সের কোন ধারণা নেই, পঞ্চাশ বছরের লোক নিজের বয়স বলবে পঁচিশ। আজকাল তরুণদের অবশ্য নিজেদের বয়স সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়েছে কারণ অধিকাংশ লোক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং গীর্জার খাতায় ছোটদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নিকোবরীদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর। বস্তুতঃ আগের দিনে তারা দাবী করত যে, বিভিন্ন জায়গার লোকেদের তফাৎ ওরা গায়ের গন্ধেই বুঝতে পারে। (চাওড়ার লোকদের গায়ের গন্ধ সবচেয়ে খারাপ)।

চোখের দৃষ্টি সাধারণতঃ ভাল, খুব বুড়োরাও বিনা চশমাতেই নিজেদের কাজকর্ম্ম সারে। তাদের মুখের স্বাদ কিন্তু উল্লেখ করার মত নয়। এর কারণ বোধ হয় এই যে, ক্রমাগত পান চিবুনোর ফলে মুখের ঝিল্লী কর্কশ হয়ে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা ভোঁতা হয়ে গেছে। মুখের স্বাদ এভাবে নষ্ট হওয়াতে নিকোবরীরা খাবার উপযুক্ত যে কোন খাদ্যই খায়। আহার্য্যের গুণের চেয়ে আহার্য্যের পরিমাণের দিকেই ওদের নজর বেশি।

লোকসংখ্যা তত্ত্ব

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৬১ সালের লোক গণনা অনুসারে এই সব দ্বীপের লোকসংখ্যা ছিল, ১৪,৫৬৩ ১৯৫১ সালে ১২,০০৯। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় শতকরা ২১ ভাগ, বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ২.১ ভাগ। হিসাব করা হয়েছে যে, ১৯৬৬ সালে দ্বীপপুঞ্জের মোট জনসংখ্যা ছিলো ১৬,০০০। বাস্তবিক এই শতাব্দীতে নিকোবরী জনসংখ্যা অবিরাম বেড়েই চলেছে। এটি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ সাধারণতঃ দেখা গেছে যে, বাইরের সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর আদিবাসী সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা কমেই গেছে। নিকোবরীদের বেলায় জনসংখ্যা কমার বদলে বেড়ে গেছে। এটি তাদের জীবনীশক্তি ও সংহত জীবনের প্রশংসনীয়

পরিচয়। দ্বীপের মধ্যে বাস করার ফলে তাদের বহিঃসংযোগ খুবই সীমিত। তা ছাড়া বিবাহাদি ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানী মনোভাব এবং বাইরের লোকের সঙ্গে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন করতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক বলে তারা পৃথক একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হয়ে থাকতে পেরেছে। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি উপজাতি সম্প্রদায়ের মত তাদের বহিরাগতদের সঙ্গে সংমিশ্রণ হতে পারেনি। বস্তুতঃ স্বাধীনতার পরবর্ত্তী কালে বর্দ্ধিত সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা ও সমাজকল্যাণের নানা কর্ম্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এইসব কারণে মৃত্যুর হারও খুব কমে গেছে। জন্মের বর্দ্ধিত হার আগের মতই আছে। দুঃখের বিষয় জন্মনিয়ন্ত্রণের উপকারিতা নিকোবরীরা এখনো বোঝেনা। ফলে তাদের জনসংখ্যা ভয়াবহরূপে বেড়ে যাচ্ছে। এইসব দ্বীপে আবাদী জমি খুবই সীমিত ; এখন কর নিকোবর ও চাওড়াতে জনসংখ্যা হ্রাসের তাগিদ সুরু হয়েছে। বর্ত্তমানে সমস্যা অতটা তীব্র নয় এবং এখনো প্রচুর জমি এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্বৃত্ত জনতার জন্য খাদ্য সংগ্রহ সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এখন থেকে লোকেরা যদি পরিবার পরিকল্পনা সুরু না করে ভবিষ্যতে এই লোকসংখ্যা নিয়ে তীব্র সঙ্কট দেখা দেবে।

ভাষা

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা প্রায় সবাই একটি ভাষা বলে, নিকোবরী ভাষা। কোন কোন পণ্ডিত এই ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার সাদৃশ্যের কথা বলেন। বিশেষতঃ তাঁরা বলেন যে, ভারতের মূল ভূখণ্ডের কোন কোন উপজাতি যেমন খাসিয়া, মুণ্ডা—এদের ভাষার সঙ্গে নিকোবরী ভাষার কিছু সাদৃশ্য আছে। যদিও এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না তবু এটা সুনিশ্চিত যে নিকোবরী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ভাষা ; অন্য ভাষার সঙ্গে এ ভাষার অল্পই যোগাযোগ আছে। বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই এ ভাষা গড়ে উঠেছে।

এটি বিশেষ লক্ষণীয় যে, নিজেদের জীবনের ভাব ভাষা বস্তু সব কিছুরই চাহিদা মেটাবার মত ব্যাপকতা এ ভাষার আছে।

নিকোবরী ভাষার ছয়টি উপভাষা আছে। সেগুলি পরস্পরের সমগোত্রীয়; তবু তাদের মধ্যে বিশেষ কতকগুলি পার্থক্য আছে। সবচেয়ে প্রধান ভাষা অবশ্য নিকোবরী ভাষা (কর নিকোবরের লোকেদের ভাষা)। বস্তুতঃ নিকোবরী ভাষা বলতে আমরা প্রধানতঃ কর নিকোবরী ভাষা বুঝি।

অতীতে বহু শতাব্দী ধরে কর নিকোবরীদের (ভাষায় অথবা নিকোবরীদের অন্য কোন উপভাষা) কোন অক্ষর ছিল না। ১৯১২ সালে জর্জ্জ হোয়াইট হেড নামে এক ব্যক্তি নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও এজেণ্ট ও মিশনারী রূপে কয়েক বছর বাস করেছিলেন। তিনি বিশপ রিচার্ডসনের সাহায্যে একটি বর্ণমালার প্রণয়ন করেন। এই বর্ণমালা মূলতঃ রোমান অক্ষর, কর নিকোবরী ভাষার সমস্ত অদ্ভুত শব্দগুলি বিশুদ্ধ ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য কতগুলি সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও অতিরিক্ত স্বরবর্ণ সংযুক্ত করা হয়েছে।

স্বরবর্ণ

a, ā; e, ē, é, ê, i, ī; o, ō; õ, ö; öö, u, ū, eu, ēu, eui, eūi.

ব্যঞ্জনবর্ণ

ç ch, f, h, j, k, l, m, n, n, ng, ny, p, r, r, s, t, v, y.

এই বর্ণগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় নিকোবরী ভাষায় স্বরবর্ণ বিশেষ বিস্তৃত, ব্যঞ্জনবর্ণ আবার সংখ্যায় কম। এ ভাষায় কোন ব দ গ জ নেই। r s, যদিও দুটো। নিকোবরী ভাষায় কোন কোন শব্দ বিশেষ করে যেগুলি, ng, ny, eu, eui, দিয়ে গঠিত, সেই শব্দগুলি উচ্চারণ করতে দাঁত ভাঙ্গে, বিদেশীদের সঠিক উচ্চারণ করতে খুব কষ্ট হয়। আশ্চর্য যে, এ ভাষায় অনেক মূর্দ্ধন্য বর্ণ আছে বিশেষ করে ng এবং ny ব্যঞ্জনবর্ণ দিয়ে যেগুলোর আরম্ভ।

এ ভাষার ব্যাকরণও একটু গোলমেলে, কোন বিশেষ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাষাটির মূল তত্ত্ব আয়ত্ত করা খুবই কঠিন।

একই অর্থবোধক কয়েকটি শব্দ আছে, কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় একটির ব্যবহারই সঠিক হয়। যেমন 'তুমি'কে নিকোবরীতে বলে 'মে' (meh), ম্যান (man), ওম (om)। বিভিন্ন বাক্যে তিনটি সমার্থবোধক শব্দের একটি অর্থই সঠিক, কিন্তু এর কারণ বোঝা যায় না।

ক্রিয়ার বিভিন্ন কাল হয়। অতীতকাল বোঝাতে সাধারণতঃ বাক্যের প্রথমে 'ঙ্গেঁইচ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। পৃথকভাবে শব্দটির মানে 'শেষ হয়ে গেছে'। ভবিষ্যত কাল বোঝাতে বাক্যের শেষে 'মিন' শব্দের ব্যবহার হয়। এরও কয়েকটি ব্যতিক্রম আছে; কখনো 'ঙ্গেঁইচ' ও 'মিন' শব্দ দুটি ব্যবহার না করেও অতীত ও ভবিষ্যত কাল বোঝায়। বর্ত্তমান কাল ও অপূর্ণ বর্ত্তমান কালের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় না। পূর্ণ ভূতকাল বোঝাবারও কোন উপায় নেই।

প্রশ্নবোধক বাক্যও আছে। কি করে, কি, কোথায়, কে, কেন কত ইত্যাদি সব শব্দই নিকোবরীতে এক রকম। এর জন্য কোন বাঁধধরা নিয়ম নেই। নিকোবরীতে 'কি' হল 'অস্থু', 'তুমি কি চাও' নিকোবরীতে (আশু অপ লোন মে), 'তুমি কি করছ', (আশু অপ লেয়েন মে) ইত্যাদি; এই সব বাক্যে 'আশু' শব্দের প্রয়োগ হয়। তবে নাম জিজ্ঞাসা করলে 'তোমার নাম কি', নিকোবরীতে বলে (আছিপ্ অপ মিনে এনি মে) কিন্তু 'আছিপ্' শব্দের মানে কে। 'আছিপ' শব্দটি 'আশু'র স্থানে ব্যবহৃত হল। 'আশু' মানে কে।

একটি বিশেষ জিনিস অনেক রকম বাক্যে বোঝান যায়, যেমন এখানে এস, 'তা ইহি', 'আই মানা' এই দুটি বাক্যেই বোঝায়, অন্যদিকে অনেক জিনিস বোঝাতে আবার পৃথক বাক্য নেই, একই শব্দ বা বাক্যে কাজ চালাতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ পানাম

মানে ভূমি, গ্রাম, দ্বীপ, দেশ সব বোঝায়। মাক বলতে জল, কুয়ো, স্রোত বোঝায়। চোন বললে বোঝায় ঘাস, কাঠ, গাছ, লাঠি, ইত্যাদি।

তারপর কত না এ ভাষায় উপসর্গ, সন্ধি, বিভক্তি ইত্যাদি। অনেক সময়ই এদের অর্থ বোঝা দুষ্কর।

এ ভাষায় কয়েকটি শব্দ আছে প্রাণীবাচক শব্দের লিঙ্গভেদ বোঝানর জন্য। মানুষের বেলায় এটি বোঝান হয় পুরুষ সম্পর্কে কিকিনায়া ও নারী সম্বন্ধে কিকানা শব্দ যোগ করে, জন্তুর বেলায়, পুং জন্তুর সম্পর্কে কান, স্ত্রী জন্তুর বেলায় কনে শব্দ যোগ করে। যদিও স্ত্রী পুরুষ সম্পর্কে কোন সর্ব্বনামের ব্যবহার নেই। অ্যান শব্দ বললে স্ত্রী পুরুষ দুই-ই বোঝায়। তার, তাকে বোঝাতে বলে "ō"।

ক্রিয়াপদ সর্ব্বনামের সঙ্গে বদলায়। প্রশ্নবোধক বাক্যে অবশ্য আলাদা, কিন্তু হিন্দীর মত কর্ম্মের লিঙ্গ অনুসারে বদলায় না। লোকের জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বর্ণনার দিক্ দিয়ে ভাষাটি খুব সমৃদ্ধশালী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় নারকেলের বাড় বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর বোঝাতে সাতটি বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়। অন্যদিকে লোকেদের সহজ সরল জীবনযাত্রার কারণে অর্থনৈতিক, নৈতিক বোধ এবং অন্য নানা বিষয় প্রকাশ করবার ব্যাপারে ভাষাটির পরিধি খুবই সীমিত।

ক্রিয়াপদ থেকে প্রত্যয়সিদ্ধ বিশেষ্য তৈরী করার শক্তি ভাষাটির বেশ আছে, যেমন 'হেকপ' মানে শেখা। 'হেকপ' থেকে হয়েছে 'মহাকোপাটি' মানে শিক্ষক, আর 'মহাকাপোটেন' মানে ছাত্র। এই রকম ক্রিয়াপদ 'কুইচ' মানে লেখা, এটি থেকে এসেছে 'কা-নুইচ' মানে লেখনী, 'কিনুই চিও' মানে লেখা বস্তু।

কোন কোন স্থানে বাক্যগুলি খুবই সহজ, সরল। অন্য ভাষায় যা আট দশটি শব্দে বোঝাতে হয়, নিকোবরী ভাষায় তা দু-তিনটি শব্দেই প্রকাশ করা যায়। একটি দুটি শব্দে সরল বাক্যের

গঠন, যা অন্যভাষায় সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং যা ভাবপ্রকাশের বিশুদ্ধ ও সঠিক রীতি নয়, নিকোবরী ভাষায় তা খুবই প্রচলিত এবং আরো শব্দ জুড়লেও ভাবের কোন পূর্ণতর প্রকাশ সম্ভব নয়।

বাক্যের গঠনও ইংরেজী বা হিন্দী থেকে আলাদা। ক্রিয়াপদ সাধারণতঃ আগে, সর্ব্বনাম শেষে বসে। আমি হাসপাতালে যাই, নিকোবরীতে হবে চুহ-আসপু, চিন (যাই হাসপাতালে আমি)। ক্রিয়াপদ চুহ মানে যাওয়া—বসল বাক্যের আরম্ভে। যদিও বাক্য গঠনের এই সাধারণ রীতির ব্যতিক্রমও আছে। যেমন 'টুপিটা ব্যাগের মধ্যে' নিকোবরীতে হবে এল ইন্ন্যুল অ্যান নগ্যাম সাপি-অভ। শব্দের স্থিতি বদল না করে অনুবাদ করলে এটি হবে, (মধ্যে ব্যাগের হচ্ছে টুপিটা)। এই বাক্যে ক্রিয়াপদ অ্যান (মানে ইজ, is) প্রথমে আসে না, বরঞ্চ এল (মানে ভিতরে) শব্দটি দিয়ে এটি সুরু হবে।

নিকোবরী ভাষা সংক্ষিপ্ত ও একটু অস্পষ্টও বটে। উচ্চারণে, বিশেষ বিশেষ স্থানে জোর দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। বড় বড় কথাগুলি যেন নিয়মিত ছন্দে জোর দিয়ে একটা সুরেলা ধ্বনিতে ওরা বলে। এমন অঙ্গভঙ্গী করে বলে যে, কথিত শব্দের চেয়েও তা ধ্বনিময় লাগে। যেমন হ্যাঁ বলতে হলে নিকোবরীরা বলে হন, সেটি বলতে উপরে নীচে সমানে মাথা ঝাঁকাবে। না বলতে হলে বলে হা হা, সেই হা হা বলতে মাথা ঝাঁকাবে এক দিক থেকে অন্য দিকে।

ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান যোগাযোগের ফলে নিকোবরী ভাষার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে। লোকের জীবনযাত্রা এবং তাদের অর্থনীতি ক্রমশঃ জটিল হয়ে উঠছে এবং নতুন ভাব প্রকাশের তাগিদে কিছু নতুন শব্দ চয়নকরা হচ্ছে। অন্য ভাষা থেকেও অনেক শব্দ গ্রহণ করা হচ্ছে। এদিক দিয়ে হিন্দী থেকে এরা খুব বেশী শব্দ নিচ্ছে, ইংরেজী থেকেও নিচ্ছে তবে অপেক্ষাকৃত কম। অন্যভাষা থেকে অনুবাদও এ ভাষার ক্রমোন্নতির পক্ষে সহায়ক হচ্ছে। অবশ্য

এখন পর্যন্ত অনুবাদগুলি হচ্ছে ধর্ম্মমূলক উদ্দেশ্যে। ওল্ড টেস্টামেণ্টের দ্বাদশ অংশ এবং আরো আটাশটি বিশপ রিচার্ডসনের দ্বারা অনূদিত হচ্ছে। ১৯৩০ সালে নিউ টেস্টামেণ্টের উনত্রিশ ভাগের অনুবাদ হয়ে গেছে এবং তা এখনও চলছে। নিকোবরীতে স্তোত্র সহ একটি প্রার্থনা পুস্তকের অনুবাদ বহুদিন আগেই হয়েছে। আশা করা যায় শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যক শিক্ষিত নিকোবরী অন্য-ভাষা থেকে আবশ্যকীয় বিষয়ের অনুবাদ করবেন। এতে নিকোবরী ভাষা আরো সমৃদ্ধ হবে।

যদিও কর নিকোবরের লোকেরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য উপ-ভাষা কিছু কিছু জানে, তবু কর নিকোবরীকেই অধিকাংশ দ্বীপের জাতীয় ভাষা বলা চলে। নানকাউরি, কাচাল, কামোরটা, টেরাসসা, চাওড়ার লোক সকলেই কর নিকোবরী ভাষা জানে এবং কর নিকোবরের লোকের সঙ্গে ওদের ভাষাতেই কথা বলে। শুধু দক্ষিণের লোক যেমন পুল্লোমিল্লো, ক্ষুদে নিকোবর, কোন্দুল ও ডাগর নিকোবরের লোকেদের কর নিকোবরের লোকেদের সঙ্গে খুবই কম যোগাযোগ। তারা নিকোবরী ভাষা জানে না। সেইজন্য কর নিকোবরের লোকেরা ক্বচিৎ কখনো যখন এই চারটি দ্বীপের অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসে তখন কথাবার্ত্তা বলতে বড়ই অসুবিধা বোধ করে; তখন তারা যে সামান্য হিন্দী জানে তাতেই কাজ চালায়।

নিকোবরীরা অন্য ভাষা শিখতে খুব পটু। অনেক বছর ধরে হিন্দী মোটামুটি তারা ভালই জানে, বিশেষ করে পুরুষেরা তো জানেই। বাইরের লোকের সঙ্গে তারা হিন্দীতে কথাবার্ত্তা বলে। দ্বীপের সমস্ত প্রধান ব্যক্তিরাই কিছু কিছু হিন্দী জানে যদিও তাদের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বেশ সীমিতই। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা অনেকেই ভাল হিন্দী জানে এবং বই-ঘেঁষা হিন্দী এত বলে যে ভারতের মূল ভূখণ্ডের হিন্দীভাষী লোকেরাও তাদের দৈনন্দিন জীবনে এত বই-ঘেঁষা হিন্দী বলে না।

খুব কম লোক ইংরাজী শিক্ষার সুবিধা পেয়েছে। তারা কিন্তু ইংরেজী বেশ ভালই বলে। আগে ভারতের মূল ভূখণ্ডে যেমন ছিল এদের মধ্যেও তেমনি দেখা যায়। কোন কোন অল্প শিক্ষিত লোক ইংরেজীতে একটা দুটো শব্দ বলে গর্ব্ব বোধ করে। বোধহয় দেখাতে চায় যে, কিছু শিক্ষা তারা পেয়েছে। যদিও তারা যা ইংরেজী শব্দ বলে তা প্রায়ই ভুল এবং হয়ত দুপুরবেলা প্রচণ্ড রোদের মধ্যেই তারা বলবে গুড নাইট !

যে সব লোক হিন্দী বা ইংরেজী শিখেছে তারা উচ্চারণ মোটামুটি ঠিকই করে যদিও কথা বলে একটু মুখব্যাদান করে এবং 'শ' উচ্চারণ করতে হিমসিম খেয়ে যায়।

নিকোবরীরা অন্য ভাষা সহজেই শেখে। তবুও তারা কিন্তু নিজেদের ভাষা নিয়েই সবচেয়ে বেশী গর্ব্ব বোধ করে এবং কোন বাইরের লোক যদি তাদের ভাষায় কথা বলে তবে ভারি খুশী হয়। এমনকি কোন বাইরের লোক যদি তাদের কঠিন ভাষা আয়ত্ত করতে অসমর্থ হয় এবং শুধু মাত্র বাছা বাছা দু'একটি শব্দ বা বাক্য শেখে আর কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করে তাহলে সেই শব্দ ও বাক্যগুলি তাদের অন্তর স্পর্শ করে এবং তারা তার খুব আপন হয়ে যায়। সত্যি, যদি কেউ এইসব দ্বীপে এসে কাজ করতে চান ও তাদের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে চান তবে সব কিছুর উপরে তিনি যেন এদের ভাষাটি আগে আয়ত্ত করে নেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সমাজ

সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং যৌথ পারিবারিক প্রথা

নিকোবরী সমাজের বৈশিষ্ট্য হল তাদের লক্ষণীয় একতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং এক সমাজে বাস করার মত মনের গড়ন। সমাজের ইচ্ছা ও স্বার্থের কাছে এরা এদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও স্বার্থকে বড় করে দেখতে অভ্যস্থ নয়।

সামাজিক শাসন এবং অধিকারের সাম্য এই দুটি আপাত-বিরুদ্ধ নীতি নিকোবরী সমাজের বিশেষত্ব। লোকেরা গ্রাম প্রধান, পরিবারের প্রধান এবং অন্যান্য গুরুজনের অধীনে কাজ করে, বস্তুতঃ এই জনাকয়েক লোকই গ্রামের সমস্ত জরুরী বিষয় স্থির করে। অন্যদিকে গ্রামের সব লোকের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে এবং অপরের স্বার্থ হানিকর কোন কাজ করার সুযোগ সুবিধা বিশেষ কারোর নেই। নিকোবরীদের কাছে সমস্ত সমাজই যেন একটি বড় পরিবার, একটি বিশেষ পরিবারের সভ্য হিসেবেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে স্নেহ-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ।

সামাজিক ক্ষেত্রে সবাই স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করে। ভারতের মূল ভূখণ্ডের কোন কোন স্থানের মত এদের কোন সামাজিক বিধি-নিষেধ নেই। নিকোবরী সমাজে এটা একেবারে অপরিচিত।

নিকোবরী সমাজে চূড়ান্তরকমের যৌথ পরিবার প্রথা প্রচলিত। সমগ্র সমাজের ক্ষুদ্রতম অংশ হল পরিবার। ভারতের মূল ভূখণ্ডের পরিবার থেকে নিকোবরী পরিবারের গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই বোনেরাই শুধু যে পরিবার অন্তর্ভূক্ত তাই নয়, বহু দূর সম্পর্কের লোকেরাও এদের পরিবারের অন্তর্ভূক্ত, কখনো একটি পরিবারে শতাধিক সভ্যও থাকে।

যৌথ পরিবারকে চালায় পরিবারের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা। অন্যসব

সভ্য তাদের আদেশে কাজ করে। সাধারণতঃ পরিবারের কর্ত্তা আগের কর্ত্তার ছেলেই হয় তবে এ বিষয়ে কোন আইন কানুন নেই। পরিবারের প্রধান নির্বাচিত করার মাপকাঠি হল বয়স, নেতৃত্বের গুণ, বুদ্ধি ও শাসন ও হুকুম করার ক্ষমতা। পরিবারের প্রধান মৃত্যুকালে গুণ অনুসারে পরবর্ত্তী প্রধানকে নির্বাচিত করে এবং পরিবারের অন্য সভ্যরা তাকে (স্ত্রী বা পুরুষ যেই হোক) বিনা দ্বিধায় ও বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে। যদি কিছুকাল পর দেখা যায় নতুন পরিবার প্রধান অযোগ্য বা সে কোন গর্হিত আচরণের জন্য অপরাধী তাহলে পরিবারের সভ্যরা গাঁয়ের অন্যান্য গুরুজনের সাহায্যে আর একজন প্রধান নির্ব্বাচিত করে নেয়।

পরিবার প্রধানের কর্তব্য পরিবারের সমস্ত সভ্যের মঙ্গলামঙ্গল দেখা ও ভরণপোষণ করা। খাদ্য সংগ্রহ কি ভাবে হবে, দৈনন্দিন কাজকর্ম্ম কি ভাবে চলবে, শ্রম বণ্টন কি ভাবে হবে তার ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। পরিবারের সমস্ত উপার্জ্জন তার কাছেই প্রথমে দেওয়া হয়, সেই পরিবারের সভ্যদের প্রয়োজন অনুসারে সব বণ্টন করে দেয়। পরিবার যখন খুব বড় হয় তখন গ্রাম প্রধানের পক্ষে পরিবারের প্রতিটি সভ্যের কল্যাণ ও প্রতিদিনের প্রয়োজন অপ্রয়োজন দেখা সম্ভব হয় না। সে তখন পরিবারে সহকারী প্রধান নিযুক্ত করে। দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজ এই সব সহকারী প্রধানদের হেফাজতে থাকে এবং পরিবার প্রধান সামগ্রিকভাবে দেখা শোনা করে ও কর্তৃত্বের শিখরে থাকে।

পরিবার প্রধান বা তার সহকারী পরিবারের সব সভ্যের সঙ্গে 'তাহেত' নামে পৃথক কতকগুলি গৃহে থাকে। সাধারণতঃ এদের রান্না একত্রে হয় এবং যদি চার পাঁচটি গৃহ থাকে তাদের সব সভ্যদের জন্য। অনেক সময় সকলের জন্য একটি রান্নাঘরের ব্যবস্থা থাকে।

যৌথ পরিবার সমাজের শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় রাখে। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন দেখার পক্ষেও এটা অনুকূল ব্যবস্থা। স্বাভাবিকভাবে অসুস্থ ও অসমর্থদের দেখা শোনা করা হয়। প্রত্যেক নিকোবরীর

এদের সমাজে পুরুষদের মত নারীদের সমান স্থান ও সমান অধিকার। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করায় তাদের কোন বিধিনিষেধ নেই।

তবে তারা সমাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না, গাঁয়ের জরুরী বিষয়েও থাকে না। তাদের মধ্যে খুব কমই পরিবারের প্রধান নির্ব্বাচিত হয়। সাধারণতঃ তারা পরিবার বা পল্লী প্রধানের দায়-দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে চায়। কিন্তু কখনো কোন নারীর নেতৃত্ব-ক্ষমতা ও গুণ যদি পুরুষ সভ্যের চেয়ে বেশি দেখা যায় তাহলে তাকে পরিবারের প্রধান কর্ত্রী হিসেবে নির্ব্বাচিত করা হয় ও যথা-যোগ্য সম্মান দেওয়া হয়। পরিবারে বয়স্ক ও বৃদ্ধদের খুব সম্মান দেওয়া হয়। ছোটরা তাদের হুকুম পালনে অভ্যস্ত, বড়দের শৃঙ্খলাবোধ বা নীতির ব্যাপারে মাথা ঘামাতে হয় না।

লোকেরা শিশু প্রিয়। প্রাচীনকালে দত্তক গ্রহণের রীতি ছিল। কখনো বা লোকেরা দত্তক গ্রহণ করার জন্য শিশু আনতে অন্য দ্বীপে যেত। এ প্রথা এখন আর চালু নেই। কিন্তু কোন শিশু যদি পিতৃমাতৃহীন হয় বা তার নিকট আত্মীয়-স্বজন না থাকে তবে যৌথ পরিবার অথবা সমাজের অন্য লোকজন তাকে সযত্নে পালন-পোষণ করে।

গ্রাম প্রধান

পল্লীর নানা পরিবারের প্রধান ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে থেকে একজন মোড়ল বা সর্দ্দার নিযুক্ত করে। সাধারণতঃ মোড়লের পুত্রই সর্দ্দার হয় কিন্তু হবেই যে এমন কোন কড়াকড়ি নিয়ম নেই! পরিবারের কর্তা নির্ব্বাচনের সময়ে যেমন গাঁয়ের মোড়ল নির্ব্বাচনের কালেও তেমনি; ব্যক্তিগত গুণের ভিত্তিতেই নির্ব্বাচন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, নেতৃত্বের ক্ষমতা, আদেশ করার, দমন করার শক্তি, অপরের বিশ্বাস অর্জ্জন করার শক্তি—নির্ব্বাচন কালে এসবই বিবেচনা করা হয়।

গাঁয়ের মোড়লের হাতে সব ক্ষমতা। গ্রামের সমস্ত জরুরী বিষয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করা হয়। সে বিভিন্ন পরিবারের কর্তাকে নির্দ্দেশ দেয়। তারা আবার তাদের পরিবারের অন্য সদস্যের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়।

গাঁয়ের মোড়লের কর্তব্য অন্যান্য গাঁয়ের মোড়লদের ও সরকারী কর্ম্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, অভাব-অভিযোগ ও সমুদয় ব্যাপার জানানো। অন্যদিকে সরকারী কর্ম্মচারীরা—বস্তুতঃ যে কোন লোক গ্রামে যদি কিছু কাজ করতে বা করাতে চান অথবা গ্রামবাসীদের কোন সাহায্য চান তাহলে প্রথমে তাদের গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অন্য লোকের কাছে যাওয়া বৃথা, কারণ তারা গাঁয়ের মোড়লের অনুশাসন ছাড়া বাইরের কারুর কথা শুনবেই না। নিকোবরীদের অদ্ভুত সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী গাঁয়ের মোড়লকে কেন্দ্র করেই শাসন ও উন্নয়নমূলক সব কাজ করান সম্ভব। এই সব কাজে তার সহযোগীতা শুধু যে বাঞ্ছনীয় তাই নয়, প্রয়োজনও বটে। গ্রামের উন্নতি গাঁয়ের মোড়লের ব্যক্তিত্বের উপরেই নির্ভর করে। যদি সে উন্নতি চায়, নতুন ভাবধারা গ্রহণ করতে তৎপর হয়, তাহলে খুব দ্রুত পল্লীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে। যদি সে রক্ষণশীল হয় উন্নয়নমূলক কাজে তার উৎসাহ না থাকে, সারা গ্রাম পেছনে পড়ে থাকে।

অনেক ক্ষমতা উপভোগ করা সত্বেও উল্লেখযোগ্য গাঁয়ের মোড়লরা সুচারুভাবে তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করে। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে না এবং সাধারণতঃ সমস্ত গাঁয়ের মঙ্গলের জন্য আন্তরিক ভাবে কাজ করে। কোন ধনী ব্যক্তি গ্রামের সর্দ্দার হবে এমন কোন কথা নেই। বস্তুতঃ মোড়লেরা অনেক সময় গাঁয়ের অন্য লোকের চেয়ে অনেক বেশি গরীব।

মোড়লেরা কোন বিশেষ সুবিধা ভোগ করে না। ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাদের অধিকারও বেশী নেই।

খাদ্য, পানীয়, পোষাক-আদির ব্যাপারে অন্য লোকদের মতই তারা

চলে। দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তারা সবার কাজ থেকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান পায়, এমনকি গ্রামবাসীদের কাছ থেকেও।

নিকোবরীদের সমাজ-ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক বা গ্রাম প্রধান আর পরিবারের কর্তারা সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের ক্ষমতা ভোগ করেন, এটা বলা সম্পূর্ণ ভুল। গাঁয়ের মোড়লকে কোন মতেই সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের সঙ্গে তুলনা করা চলে না, কারণ কাউকেই সে শোষণ করে না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষত্ব যে শ্রেণী-বৈষম্য বা শ্রেণী-বিরোধ, নিকোবরী সমাজে নেই বললেই চলে। পরিবারের কর্তারা পরিবারের আর পাঁচজনের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, ঠিক তেমনি গাঁয়ের মোড়লরা গ্রামবাসীদের প্রতি আচরণ করে থাকে। সামন্তবাদী জমিদারের দাসের প্রতি আচরণের মত মোটেই নয়।

পরিবারের কর্তার মত গাঁয়ের মোড়ল জীবনভোর মোড়ল থাকে। অবশ্য যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে, স্বার্থপরতা দেখায় বা কোন অপরাধ করে তাহলে তাকে সরাবার অধিকার গ্রামবাসীদের থাকে। সেরকম অবস্থায় গ্রামের সমস্ত পরিবারের কর্তারা, গাঁয়ের বয়োজ্যেষ্ঠরা এবং দ্বীপের অন্য গাঁয়ের মোড়লরা একত্র হয়ে তাকে সরিয়ে অন্য মোড়ল নির্ব্বাচিত করে। তবে এরকম ভাবে কচিৎ-কখনও মোড়লকে সরান হয় এবং বলতে গেলে দ্বীপের অধিকাংশ পল্লীতে স্মরণাতীত কালের মধ্যে এরকম ব্যাপার হয়নি।

এই মোড়ল ছাড়াও প্রতি গাঁয়ে আরো দু'জন সর্দ্দার থাকে। তাদের বলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মোড়ল। গাঁয়ের মোড়লের মত তাদেরও নির্ব্বাচিত করা হয় এবং মোড়লকে তারা সব কাজে সাহায্য করে। মোড়লের অনুপস্থিতিতে পল্লীর দেখাশোনার কাজ করে।

মজার কথা যে, গাঁয়ের মোড়ল ও তার সহকারী দুটিকে লোকে বলে কাপ্তেন। অতীতে গুটি কয়েক জাহাজের মাধ্যমেই নিকোবরীরা বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতো। এই জাহাজগুলি মাঝে মাঝে এই দ্বীপপুঞ্জে ভিড়ত আর পাঁচটা দেশের মত এদের সঙ্গেও পণ্য বিনিময় করতো। তখন উপজাতীয় লোকেরা

জাহাজের কাপ্তেনের শক্তি ও সম্মান দেখে মুগ্ধ হত। তাই নিজেদের সম্মান ও পদ-মর্য্যাদা বাড়াতে গাঁয়ের মোড়লরা নিজেদের জন্য কাপ্তেন শব্দটি গ্রহণ করেছিল। শব্দটি গাঁয়ের মোড়লের জন্য খুবই উপযুক্ত হয়েছে কারণ জাহাজের কাপ্তেনের মতই গাঁয়ের মোড়ল গাঁয়ের ভাগ্যবিধাতা ; ইচ্ছা করলে জাহাজের মতই গ্রামকে ডুবিয়ে দিতে পারে আবার উন্নতি ও কল্যাণের পথেও নিয়ে যেতে পারে।

ভুমি ব্যবস্থা—মালিকানা ও উত্তরাধিকার

নিকোবরীদের ভূমি ব্যবস্থা জনসংখ্যার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নিকোবরীরা বোধহয় আগে দ্বীপের একটি নির্দিষ্ট স্থানেই বসবাস করতো, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে। তখন প্রচুর ভূমি ছিল এবং লোকসংখ্যা ছিল নগন্য। যে সব পরিবার অরণ্য অঞ্চল সাফ করে ফসলের আবাদ করত তারাই পেতো জমির মালিকানাস্বত্ব। এইভাবে সমস্ত জমি কয়েকটি পরিবারের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেল, এবং পরিবারগুলির কর্ত্তারাই জমির আসল মালিক হল। তাদের মৃত্যুর পর মালিকানাস্বত্ব তাদের উত্তরাধিকারীর হস্তে বর্ত্তাল। প্রত্যেক মূল মালিকের জমির চিরাচরিত সীমারেখা এবং তাদের উত্তরাধিকারীদের মালিকানাস্বত্ব এখনও নিকোবরীদের স্বীকার করে নেয়।

জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির চাহিদা বাড়তে লাগল এবং মূল মালিকেরা অথবা তাদের উত্তরাধিকারীরা নারকেল ইত্যাদি লাগানোর বা অন্য ফসল ফলাবার জন্য নিজেদের জমির অংশ অন্যদের দিতে লাগল। বস্তুতঃ জমির কোন অংশ যদি অনাবাদী পড়ে থাকে তাহলে একই গাঁয়ের বা দূর গাঁয়ের লোকেরা এসে জমিটা চাষের উদ্দেশ্যে তাদের দিয়ে দিতে বলতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে মালিক জমিটা চাষ করার কথা যদি চিন্তা না করে তাহলে সাধারণতঃ সে জমিটা দিয়ে দেয়। একবার জমি দিয়ে দিলে

জমিটা মালিকের নামে থাকে বটে কিন্তু জমি যে ব্যবহার করে আসলে তারই প্রায় হয়ে যায়। সে নারকেল বা অন্যান্য গাছ লাগায়। জমিতে উৎপন্ন ফসলের কিছু অংশ জমি মালিককে দেবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের শ্রমের ফসল ভোগ করবে এটাই নিকোবরী ভূমি ব্যবস্থার মহৎ নীতি। কিছুকাল পরে মালিক তার নিজের ব্যবহারের জন্য জমিটা ফেরৎ নিতে চাইলেও যতক্ষণ ঐ জমির ওপর অন্য ব্যক্তির রোপিত বৃক্ষ থাকে ততক্ষণ সে তা ফিরিয়ে নিতে পারে না।

অবশ্য জমির মালিকের প্রতি জমির ব্যবহারকারীর একটা বাধ্য-বাধকতা থাকে। যদি জমির মালিক নৌকা বাইচ খেলার ব্যবস্থা করে এবং বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে তাহলে জমির ব্যবহারকারীর পরিবারের কাউকে কিছু রান্নাবান্না করে মালিকের অতিথিদের দিতে হয়। আর জমির মালিকের মৃত্যু হলে, যে ভোজের আয়োজন করা হয়, তাতে মালিকের পরিবার যে সব বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রিত করে, জমির ব্যবহারকারীর পরিবারবর্গেরও তাদের কিছু রান্নাবান্না করে পরিবেশন করতে হয় এবং তাদের সুবিধা অসুবিধাও দেখতে হয়। এটা এমন কিছু নয়। এমন উপলক্ষ খুব কমই আসে। জমি ব্যবহার করেছে বলে তার কাছ থেকে কিছু আদায় করে নেবে এমন মনোবৃত্তি জমির মালিকদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। বরঞ্চ জমির ব্যবহারকারীরা জমিকে কাজে লাগাচ্ছে বলে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাদের ক্রিয়াকর্ম্মের দিনে কিছু সাহায্য করার চেষ্টা করে। এমন কি, জমি যে নিয়েছে সে যদি মরেও যায় এবং মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান বা উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান থাকে তাহলে জমি মালিককে ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। যদি জমির ব্যবহারকারী কোন উত্তরাধিকারী না রেখে যায় বা জমি যে উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল তা আর পূরণ করা সম্ভব না হয় (গাছপালা জমির উপর আর না থাকে) তা হলেই শুধু জমি মালিকের কাছে ফিরিয়ে

দেওয়া হয়। দ্বীপের সমস্ত গাঁয়ের মোড়লরা ও বৃদ্ধরা সমবেত হয়ে এই প্রত্যর্পনের কাজটি সমাধা করে।

বনাঞ্চল, অভ্যন্তর ভাগের জলাশয়, সমুদ্রতট এমনকি ভাঁটার সময়ে সমুদ্রের যেসব কিনারা খালি পড়ে থাকে সেই সব জমিই বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা হয়। পরিবারগুলির কর্ত্তারা তার দখল নেয়। বনাঞ্চল যদি নিজস্ব না হয় বা যে এলাকায় মাছ ধরবে তাও যদি নিজেদের না হয়, সেখান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে হলে নিকোবরীরা আগে জমির মালিকের অনুমতি নিয়ে নেয়।

রাজস্ব আদায়ের জন্য ভূমি জরীপের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামের সীমা বা ব্যক্তিগত জমির সীমানা কোন মানচিত্রে আঁকা বা দলিলে উল্লিখিত নেই। কোথাও কোথাও কাঠবোর্ড, নির্দ্দিষ্ট গাছ, বিশেষ করে বাঁশঝাড় লাগিয়ে সীমানা চিহ্নিত করা হয়। এগুলি ছাড়া বাকী অংশের সীমানা চিহ্ন লোকের মনে পরিষ্কার গাঁথা থাকে। এ নিয়ে ঝামেলা হতে বড় একটা দেখা যায় না।

পরিবারের সমস্ত সভ্যেরই জমি ও সম্পত্তি ভোগের সমান অধিকার আছে। তা সত্বেও পরিবারের কর্তাই জমি ও সম্পত্তির মালিক, পরিবারের অন্য সভ্যদের কোন স্বত্বাধিকার নেই। পরিবারের সভ্যের শুধু ভরণপোষণের অধিকার আছে। পরিবারের অন্য পাঁচজনের আহার-বিহার ও অন্য কোন বিষয়ে যাতে কোন কষ্ট না হয়, পরিবারের কর্তার সেটা দেখা কর্তব্য। মৃত্যুর পর যাকে কর্তা নির্ব্বাচিত করা হয়, সম্পত্তির স্বত্ব তারই উপর বর্ত্তায়। সম্পত্তির মালিক বলে তাকেই মেনে নেওয়া হয়।

পরিবারের অন্য সভ্যদের পারিবারিক সম্পত্তির স্বত্বে কোন অধিকার নেই তবু সম্পত্তি ভোগের অধিকার খুবই বাস্তবধর্মী। সম্পত্তি বাঁটোয়ারার অধিকারও আছে, সেটা কদাচিৎ ঘটে। পরিবার যখন এত বৃহৎ হয়ে পড়ে যে তাকে নিয়ন্ত্রন করা কঠিন, বা পরিবারের কোন কোন সদস্য যদি মনে করে যে পারিবারিক

সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার তারা ভোগ করতে পারছে না এবং তাদের কেউ কেউ যদি সম্পত্তির পৃথকীকরণ বাঞ্ছনীয় মনে করে, তাহলে পারিবারিক সম্পত্তি ভাগ করা হয়। দ্বীপের সব মোড়ল ও গাঁয়ের বুড়োদের সামনে এটা করা হয়। ভূমির নতুন সীমা ঠিক করে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়। একটি পরিবার ভেঙ্গে যে কটি নতুন পরিবার সৃষ্টি করা হয় তার সংখ্যা অনুযায়ী সম্পত্তির বাঁটোয়ারা হয়। নতুন পরিবারগুলি তাদের কর্তা নির্ব্বাচিত করে এবং বিভক্ত পারিবারিক সম্পত্তির স্বত্ব এই সব কর্তাদের হাতেই বর্ত্তায়। পুরুষ ও নারী, উভয় বংশধরেরই পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও উপভোগের অধিকার রয়েছে। যদি কোন নারী পরিবারের কর্ত্রী নির্ব্বাচিত হয় তাহলে তিনিও সেই পরিবারের জমি ও সম্পত্তির মালিক।

পণ প্রথা নেই। কর নিকোবরে এবং অন্য নানাস্থানে বিয়ের সময়ে কোন পক্ষেরই টাকাপয়সা দিতে হয় না। শুধু বিচার্য্য বিষয় এই যে ছেলেমেয়ের মধ্যে কে কার পরিবার ছেড়ে অন্য পরিবারে বাস করবে এটি পরিবারের সভ্য সংখ্যার উপরে নির্ভর করে। যে পরিবারে অধিক সভ্য সেই পরিবারের ছেলে বা মেয়ে তার পরিবার ছেড়ে অন্য পরিবারে গিয়ে তার স্ত্রী বা স্বামীর সঙ্গে বাস করে। ছোট পরিবারে কাজের জন্য বেশী লোক চাই আর লোক বাড়িয়ে বড় পরিবার ভারাক্রান্ত করা সঙ্গত নয় বলেই এই ব্যবস্থা। একবার যদি ছেলে বা মেয়ে তার নিজের বাড়ী ছেড়ে অন্য বাড়ীতে আসে তাহলে নতুন পরিবারের কর্তা সেই ছেলে বা মেয়ের সব দায়িত্ব নেয় ও পরিবারের অন্য সভ্যের মত সকলে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে। নিজের পরিবার ছাড়লে সেই ছেলে বা মেয়ের তার মূল পরিবারের সম্পত্তির কোন অধিকার থাকে না। এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে সম্পত্তির হস্তান্তর হয় না। ছেলে বা মেয়ে বিয়ের পরে, এক পরিবারে যে সম্পত্তি ভোগের অধিকার হারায়, অন্য পরিবারে গিয়ে তা ফিরে পায়।

চাওড়াতে বিয়ের সময়, ছেলের পরিবার, মেয়ের পরিবারকে

শুয়োর, মিষ্টি আলু, নারকেল, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি উপহার দেয়।

নিকোবরী পরিবারের এই অদ্ভুত ভূমি প্রথা এবং সম্পত্তির স্বত্বাধিকার ব্যবস্থা সেইরকম সমাজেই সম্ভব যেখানে পরস্পরের অধিকারকে নিঃসন্দেহে এতটা মর্য্যাদা দেওয়া হয়। বস্তুতঃ এক গাঁয়ের লোকেরা, জমির মালিকের অনুমতি নিয়ে তাদের নিজেদের গৃহ থেকে দশ পনের মাইল দূরে অন্য গ্রামের এলাকায় যখন ফসল বোনে বা নারকেল ইত্যাদি গাছ লাগায়, তখন তারা ক্ষেতের উৎপন্ন দ্রব্যের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে। কারণ আশেপাশের লোকেরা তা কখনও চুরি করে না। গাছ থেকে ফল পড়লেও কেউ তুলে নেয় না। ফসল কাটার সময় হলে ফসল রোপনকারী যায়। কিন্তু ফসল পাহারা দেবার জন্যে তাদের কখনো যেতে হয় না।

নিকোবরীরা যখন তাদের গৃহ ও ক্ষেত থেকে দূরে থাকে তখন পিপাসার্ত্ত হলে অন্যের গাছ থেকে ডাব পেড়ে নিয়ে জল পান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। সে অধিকার তাদের আছে। এইজন্য মালিকের অনুমতি নেবারও প্রয়োজন হয় না। তবে যে ফল পাড়ে তাকে প্রথম সুযোগেই খবরটি ফলের মালিককে জানিয়ে দিতে হয়। যে ফল নেয় কখনও কখনও মালিককে জানাবার জন্যে শুধু নিজের নাম ও ফলের সংখ্যা সে এক টুকরো কাগজে লিখে রেখে যায়। ভ্রমণের সময়ে লোকেরা রাস্তায় ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্যে ইচ্ছে হলে একটা দুটো নারকেল অন্যের গাছ থেকে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নারকেলের শাঁস করার জন্য বা পরে ব্যবহার করবে বলে অপরের গাছ থেকে নারকেল বা অন্য ফল কেউ নিতে পারে না। আশু প্রয়োজনে অন্যের গাছ থেকে নারিকেল বা অন্য ফল নিতে পারে বলে দ্বীপের অধিবাসিদের খুব সুবিধাই হয়। দৈনন্দিন কাজে, বিশেষ করে শিকারের সময় বহু লোককে ঘর থেকে অনেক দূরে যেতে হয়; এই রেওয়াজ প্রচলিত থাকায় নিজের ঘর থেকে খাদ্য ও পানীয় বয়ে নিয়ে যাবার ক্লেশ থেকে তারা রেহাই পায়।

অবশ্য এ অধিকার সব সময় সর্ব্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করার উপায় নেই। কখনো কখনো ক্ষেতের মালিক টাকয়া নামে একটা চিহ্ন রেখে দিয়ে নারকেল বা অন্য ফল নেওয়া নিষিদ্ধ করে দেয়। তখন ক্ষুৎ-পিপাসায় কেউ কাতর হলেও ফল-ফকারী কেউ নিতে পারে না। দুটি লাঠি মাটিতে সমান্তরাল ভাবে পুঁতে আর একটি লাঠি সে দুটির মাথার উপর দিয়ে বেঁধে দিয়ে এই চিহ্নটি করে। আবার টাকয়া চিহ্নের একটু রকমফের করে কি উদ্দেশ্যে এটি করেছে বোঝান হয়। কখনো কোন লোকের মৃত্যুর পর পরিবারের জমির এক অংশে এই চিহ্নটি লাগান হয়। কয়েক টুকরো কাপড় দিয়ে বেঁধে একটি নারকেল পাতার ঝালর উপরে ঝুলিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য এই মৃত ব্যক্তির জমির একটি অংশ সম্বৎসর কাল তার আত্মার ভোগের জন্য রেখে দেওয়া হয় এবং প্রায় এক বছর পর বাৎসরিক ভোজ অনুষ্ঠিত হবার পর এবং মৃত ব্যক্তির অস্থি পুনরায় সমাধিস্থ করার পর এই টাকয়া খুলে নেওয়া হয়। এখন অবশ্য এই পুরনো প্রথা অনেক স্থানেই পরিত্যক্ত হয়েছে। মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বিশেষ করে কফিনের কাপড়ের জন্য (এক টুকরো কাপড় ঝুলিয়ে রাখা হয়) যদি প্রচুর খরচপত্র হয়ে যায় অথবা অন্য খরচপত্র সামলাতে নারকেলের কোপতা বা শাঁস তৈরী করার জন্য নারকেল জমা করে রাখার প্রয়োজন হয়, তাহলে তা দেখাতে তারা টাকয়া চিহ্ন ব্যবহার করে, মাঝে মাঝে টাকয়া চিহ্নের ওপর নারকেলের কাঁদি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এর অর্থ শুয়োরদের নারকেল খাওয়াবার জন্য মালিক ফল জমা করে রাখতে চায়। কখনো টাকয়ার ওপর ছোট নারকেল রেখে দেয়। এই নির্দ্দেশের অর্থ ডাব পাড়া চলবে না, কারণ মালিকের ইচ্ছা ঝুনো নারকেল হোক। তবে ক্ষেতের মালিকের অর্থাভাব হলে সে নারকেল সংরক্ষণ করে রাখতে চায় নারকেলের শুকনো শাঁস তৈরী করে বিক্রী করবে-বলে। তখনও সে টাকয়া লাগায়। টাকয়াকে সব সময় মান্য করা হয় এবং নিকোবরীরা নিষিদ্ধ এলাকা থেকে ফল সংগ্রহ করার কথা ভাবতেও পারে না। অপরের অধিকারের

এতটা মূল্য দেয় বলেই এটা সম্ভব, অবশ্য টাকয়া না মানলে তার দণ্ডও কঠোর। কেউ নিষিদ্ধ স্থান থেকে ফল নিয়েছে বলে যদি প্রমাণিত হয় তবে তাকে তিনটি শুয়োর ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে হয়। শুয়োরের তিনটি চোয়াল টাকয়া চিহ্নের ওপর রেখে দেওয়া হয়। এ চিহ্ন না মানাতে কে শাস্তি পেয়েছে, লোককে স্মরণে রাখতেই এ ব্যবস্থা। নিষিদ্ধ স্থান থেকে কেউ যাতে ফল না নেয়, তার জন্য বহুকাল ধরে লোকদের একথা বোঝান হয়েছে যে নিষিদ্ধ স্থানের ফল খেলে কঠিন রোগ হয়। স্বাস্থ্য ও জীবনের ভয়েও নিকোবরীরা টাকয়া চিহ্ন দেওয়া ক্ষেতের ফসলে লোভ করে না।

খুব আবশ্যক না হলে অথবা ফল সংরক্ষণের প্রয়োজন না থাকলে মালিকরা যাতে টাকয়া চিহ্ন যখন-তখন না লাগায় সেটা দেখা নিকোবরীদের একটা সামাজিক দায়িত্ব।

অবশ্য নিকোবরীদের অদ্ভুত ভূমি প্রথা ও স্বত্বাধিকারের কথা কোথাও লেখা নাই। নিকোবরীরাও এটা জানে। তাদের সমাজে এত ঘনিষ্ঠ বন্ধন থাকার ফলেই তারা জানে অন্যের কতখানি অধিকার এবং ব্যক্তিগত ভূমির সীমানা কোথায়। সেইজন্য জমি ও জমির স্বত্ব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদও কম হয়।

শাসন ব্যবস্থাও লোকের প্রথাগত অধিকারকে মেনে চলে। এই দ্বীপ সমূহে কোন সংহত কৃষি ব্যবস্থা নেই এবং লোকের কাছ থেকে কোন রাজস্বও আদায় করা হয় না। তাই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ভূমির জরীপ ও রাজস্ব ব্যবস্থা নেই। এই রাজস্ব আদায়ই তো সমস্ত জরীপ ব্যবস্থাদির ভিত্তি। তাছাড়া এই সব দ্বীপে জমি নিয়ে কোন ঝগড়া-বিবাদ হয় না। এই কারণে লোকের অধিকার ও সীমানা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত দলিল রাখার প্রয়োজন নেই। লোকের জমির স্বত্বাধিকারের জন্য কোন দলিল দস্তাবেজের ব্যবস্থা না থাকলেও নিকোবরীদের মধ্যে, যাদের জমির উপরে অধিকার অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকৃত, তাদের দাবি সরকার স্বীকার করে। যদি কোন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কিছু জমির আবশ্যক হয় তবে

সেই জমির স্বীকৃত মালিকের কাছে গাঁয়ের মোড়লের মারফৎ সব সময় আবেদন করা হয়। যদি জমির মালিক ও গাঁয়ের মোড়ল, যে কারণে জমি চাওয়া হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে তাহলে সেই নির্দিষ্ট কাজের জন্য তারা জমিটুকু সরকারের ওই বিভাগের কাছে অর্পণ করে। তবু নিকোবরীরা সেই জমি মালিকের বলেই উল্লেখ করে। মালিকের কাছ থেকে অন্য কেউ ফসল ফলাবার জন্য নিলে, সেই জমি অধিকার করার পূর্ণ অধিকার তার থাকে বটে কিন্তু জমিটা মালিকের নামেই থেকে যায়। অবশ্য তা নিয়ে সরকারি কাজের কোন ব্যাঘাত হয় না—কারণ জমি একবার সরকারের কাছে অর্পিত হলে মালিক কখনো তা ফিরে চায় না। অবশ্য যে কাজের জন্য জমি নেওয়া হয়েছিল তা সমাধা হয়ে গেলে ভবিষ্যতে আবার কখনো জমিটি যদি অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহলে জমির মালিক প্রত্যাশা করে তার মৌখিক সম্মতি নেওয়া হবে।

সরকারি কাজের জন্য জমি নেওয়ার ব্যাপারটা একটু জটিল মনে হলেও বাস্তবে খুব সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। সরকার বুঝেছে যে পারস্পরিক সহযোগীতার মাধ্যমে জমি নেওয়া অনেক ভাল, সরকারি কাজের ব্যাপারে লোকেদের উৎসাহিত করে তোলা অনেক শ্রেয়। ভূমি দখল আইন অনুসারে ঘোরানো পথ বেছে নিলে প্রায়ই তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে লোকসান হবার ভয় জাগতে পারে।

পল্লী ও দ্বীপের কাউন্সিল

সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারে সমাজের সমষ্টিগত ইচ্ছার প্রকাশ পায় গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল বা মন্ত্রণা সভার মারফৎ। এরকমটা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। দেশ জুড়ে গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকরণ হওয়ার পরও সারা ভারতে যেমন পঞ্চায়েতরাজ

ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রবর্ত্তিত হয়েছে, ভাল কাজ হবার ফলেই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তার কোন প্রয়োজন হয় নি।

গ্রাম ও দ্বীপের মন্ত্রণা সভা, বিশেষ করে কর নিকোবরে খুবই সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চাওড়াতেও তাই, তবে একটু কম। অন্য সব দ্বীপে জনসংখ্যা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত, তাছাড়া লোকেরা খুব বেশি কাজ করতে অনিচ্ছুক বলে মন্ত্রণা সভার কাজ-কর্ম্ম ও কর্ত্তৃত্ব কিছুটা সীমিত।

গাঁয়ের প্রধান মোড়ল, সহকারী দু'-নম্বর তিন নম্বর মোড়ল এবং অন্য পরিবারের কর্তারা মিলে গাঁয়ের কাউন্সিল বা মন্ত্রণা সভা গঠন করে। গাঁয়ের সব জরুরী কাজ দেখাশোনা করার দায়িত্ব এই মন্ত্রণা সভার। সাধারণতঃ গ্রামের কাউন্সিলের অন্যান্য প্রধান ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া গাঁয়ের মোড়ল কোন আবশ্যকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। বিশেষ কোন জরুরী ব্যাপার ঘটলে পরিবারের কর্তারা পরিবারের সভ্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এবং তাদের মতামত কাউন্সিলকে জানায়। বস্তুত এ একদিকে যেমন নিকোবরী সামাজিক সংগঠনে জ্যেষ্ঠের ও পদমর্যদাসম্পন্ন ব্যক্তির অগ্রাধিকার অন্যদিকে, তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত গণতান্ত্রিকবোধ। যাঁরা কর্ত্তৃত্বের আসনে আসীন তাঁরা নিজেদের ইচ্ছা খুব কমই অপরের উপরে চাপান। কাউন্সিলের বৈঠকে আলাপ-আলোচনা ও খোলাখুলি মতামত প্রকাশ করা হলেও নিকোবরী চরিত্রে আপোষের মনোভাব মজ্জাগত বলেই চরম সিদ্ধান্ত নেবার সময় সাধারণতঃ সবাই একমত হয়ে যায়। কোন বিশেষ কাজ পড়ে থাকলেই গাঁয়ের মন্ত্রণাসভা বসে। জঙ্গল এলাকায় জাপানীদের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা উপাদান দিয়ে তৈরী ঘণ্টা বাজিয়ে আজকাল কাউন্সিলের সভার বার্ত্তা ঘোষণা করা হয়। ঝগড়া-বিবাদ বাধলে গ্রাম্য কাউন্সিলের সভা সাধারণতঃ গাঁয়ের মোড়লের বাড়ীতেই বসে, কখনো-বা সমাজ কল্যাণ গৃহে; সাধারণতঃ অভিযোগকারী বা যে দুঃখ ভোগ করে তার বাড়ীতে মোড়ল এবং সব গ্রামের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মোড়ল মিলে

দ্বীপের কাউন্সিল গঠন করে। এই মোড়লরা আবার নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান মোড়ল নির্ব্বাচিত করে। এই প্রধান মোড়ল আজীবন মোড়ল থাকে। দ্বীপের মধ্যে সে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। দ্বীপের সমস্ত অধিবাসী অবিসম্বাদিত ভাবে তার বাধ্য থাকে এবং ব্যক্তিগতভাবে গাঁয়ের সব মোড়ল তার নির্দ্দেশ মেনে চলে। তবে দ্বীপের কাউন্সিলে আলোচনার আগে বা অন্য মোড়লদের সমর্থন পাবার আগে প্রধান মোড়ল জরুরী বিষয়ে কোন মতামত দেয়না।

আগেই বলা হয়েছে যে, কর নিকোবরে একটা ঐতিহ্য, সব সময় বড় লাপাটি গ্রাম থেকে দ্বীপের বড় মোড়লকে নির্বাচিত করা হত ; কারণ ঐ গ্রাম নিকোবরীদের পিতৃভূমি, যেখান থেকে নাকি নিকোবরীরা দ্বীপের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। এ রেওয়াজ আজকাল আর নেই। যে মোড়ল সবচেয়ে যোগ্য ও সবার বিশ্বাস-ভাজন হয়ে উঠতে পারে তাকেই নির্ব্বাচিত করা হয়। তা ছাড়া দ্বীপে ক্রমবর্দ্ধমান শাসন বিভাগ ও উন্নয়নমূলক কার্য্যকলাপ বেড়ে যাওয়ার ফলে প্রবীন মোড়লের দায়-দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

একজন সহকারী মোড়লও নির্ব্বাচিত করা হয়। সেও প্রধান মোড়লের মতই ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী। প্রধান মোড়লকে সে সাহায্য করে। দ্বীপের কাউন্সিল এখনো অবশ্য বড় লাপাটি গাঁয়ে অনুষ্ঠিত হয়। তাই গ্রামের মোড়লরা মিলে এখানে একটি পাকা ও প্রশস্ত হল ঘর তৈরী করেছে।

শুধু দ্বীপের যাবতীয় বিষয়েই নয়, সব গ্রামের অভিন্ন সমস্যা নিয়েও দ্বীপের কাউন্সিল মাথা ঘামায়। তাছাড়া কোন গ্রামের কোন জরুরী সমস্যা দেখা দিলে সাধারণতঃ তার সমাধান ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় গ্রামের কাউন্সিলে নয়, দ্বীপের কাউন্সিলে।

গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল শাসন ও উন্নয়নমূলক সব কাজেই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিলে একটি জরুরী কাজ বিবাদ-বিসম্বাদে

ন্যায়বিচার করা। চুরি, ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, গালাগালি, মারামারি ও আক্রমণ, সীমানা সংক্রান্ত বিবাদ সব কিছুর নিষ্পত্তি হয় এই সব কাউন্সিলে। গাঁয়ের কাউন্সিল খুব ছোটখাট বিষয়ে বিচার সালিশী করে ; গুরুতর কলহ-বিবাদ ও অপরাধের মামলা হয় দ্বীপের কাউন্সিলে।

আগে "ডাইনী হত্যার" মত খুব গুরুতর মামলার রায় দেওয়া গ্রাম ও দ্বীপ উভয় কাউন্সিলের একটা বড় কাজ ছিল। দুষ্ট লোক ও বদমায়েস এবং হীন অপরাধে অপরাধী বা যাদুর সহায়তায় ব্যাধি ছড়িয়ে লোক হত্যা করছে বলে কাউকে সন্দেহ করা হলে লোকে বুঝতো যে তাকে শয়তানে ধরেছে। কাউন্সিলে একই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে তাকে মেরে ফেলার হুকুম দেওয়া হত। কাউন্সিল এইভেবে 'ডাইনী বধের' হুকুম দেবার সিদ্ধান্ত নিতো যে তার উপর সমাজের বিরাট দায়িত্ব এবং এ দায়িত্ব পালন করে কাউন্সিল মহান কর্তব্য করছে, সমাজকে ঘোর অমঙ্গল থেকে রক্ষা করছে। এই হত্যাকার্য্য নির্ব্বাহ করার জন্য কাউন্সিল জনা কয়েক যুবককে নিযুক্ত করত। তারা অপরাধীকে নিজের অজ্ঞাতে নিয়ে গিয়ে তার হাত পা এক এক করে ভেঙ্গে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে সমুদ্রে দেহটা ফেলে দিত। বৃটিশরা হত্যাকারীদের শাস্তি দিয়ে এই প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু এই হত্যার কারণে তাদের মধ্যে কোন অপরাধবোধ আসত না। তারা সর্ব্বদা ভাবতো সমাজকে তারা মহা অকল্যাণ ও বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

ক্রমে সভ্যতার আলো ওদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ায়, ভূত প্রেত পুজো ছেড়ে দেবার পর ওরাও ডাইনী হত্যার ভুল বুঝতে পেরেছে। বস্তুতঃ কর নিকোবরে এই প্রথাটি একেবারে উঠে গেছে। গত চল্লিশ বছরের মধ্যে একটিও ডাইনী হত্যা হয়নি। শেষ ডাইনী হত্যা হয় ১৯২২ সালে পারকা গ্রামে। তখন গাঁয়ে মড়ক লেগেছিল। রোগ ছড়াচ্ছে সন্দেহে একটি লোককে হত্যা করা হয়। বিশপ রিচার্ডসন তখন তহশীলদার। তারই অদম্য সাহসের জন্য

হত্যাপরাধীদের ঘেরাও করে গ্রেপ্তার করা হয়। দণ্ড হিসেবে পোর্টব্লেয়ারের জেলে পাঠান হয়। পরে অবশ্য তারা মুক্তি পায়। অন্যান্য দ্বীপে বিশেষ করে চাওড়া এখনো অনুন্নত আছে বলে সেখানে দশ পনর বছর অন্তর অন্তর একটা দুটা ডাইনী হত্যার খবর পাওয়া যায়। তুকতাকের ডাক্তাররা, যারা বহুদিন যাবৎ অর্কমন্য প্রতিপন্ন হয়েছে বা দুর্ব্যবহারের জন্য অপরাধী অথবা যাদু করে লোকেদের মেরে ফেলছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, তাদেরই সাধারণতঃ হত্যা করা হয়।

খুব প্রাচীনকালে কাউন্সিল সর্ব্বদা মৃত্যুদণ্ডই দিত। লোকে বলে দুশ বছর আগে কর নিকোবরের তাপোইমিও গ্রাম থেকে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি লোকেদের বুঝিয়েছিল যে সামান্য অপরাধের জন্য চরম দণ্ড দিলে নিকোবরীদের বংশে বাতি দেবার জন্য কেউ থাকবে না। সেই থেকে শুধু ডাইনী হত্যা ছাড়া মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার রেওয়াজ নেই। এখন কর নিকোবরে ডাইনী হত্যার প্রথা চালু নেই ; অন্যান্য দ্বীপেও কদাচিৎ হতে দেখা যায়। কাউন্সিলে মৃত্যু-দণ্ড দেবার আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। স্বাভাবিক দণ্ড অনুসারে এখন একটি শুয়োর দিতে হয়, বেশি হলে তিনটি। যে ক্ষতি করে তার ক্ষতিগ্রস্তকে এই জরিমানা দিতে হয়। যদি ক্ষতিকারকের শুয়োর দেবার মত অবস্থা না থাকে তাহলে কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তার কাছ থেকে গোটা কয়েক নারকেল গাছ নেওয়া হত। এখন আর তা করা হয় না কারণ লোকে বুঝেছে এতে সমস্ত পরিবারই ক্ষতি। শুয়োর জরিমানা না দিতে পারলে কিছুকাল পরে হয় দণ্ড মুকুব করে দেওয়া হয়, নয়ত আসামীকে অভিযোগ-কারীর জন্য কিছু কাজ করে দিতে হয়।

কাউন্সিল আর একটি দণ্ড দেয়। বিশেষ করে অপরাধী বালক হলে কাউন্সিল তাকে বেত মারার ব্যবস্থা করে। অপরাধী বালকের পিতা বা পরিবারের কর্তার উপরে বেত মারার ভার পড়ে। ওদের চিরাচরিত সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে নিকোবরীরা এটা করে।

তারা আসামীদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক সত্বেও একটুও বিচলিত হয় না। অবিক্ষুব্ধভাবে কাজটি নির্ব্বাহ করে। অন্যের সামনে দৃষ্টান্ত তুলে ধরার জন্য আগে প্রকাশ্যে বেত মারা হত। কিন্তু ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হয়েছে বলে নিকোবরীরা তাদের সামনে নিজেদের পরিজনকে বেত মারতে একটু সঙ্কোচবোধ করে বলে সবার সামনে বেত মারার রেওয়াজ আজকাল উঠে গেছে।

অপরাধমূলক ব্যাপারে বিচারান্তে যে রায় দেওয়া হয় তা অভ্রান্ত-ভাবে পালন করা হয়। অবাধ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবু যদি কেউ কখনো কাউন্সিলের আদেশ পালন না করে কোনরকম হিংসা বা বলপ্রয়োগ করা হয় না। তবে সমস্ত দ্বীপবাসীরা সংশ্লিষ্ট লোকটিকে এক ঘরে করে রাখে। নিকোবরীদের সুসংবদ্ধ সমাজে কাউকে বহিষ্কার বা একঘরে করা হলে সে খুব আর্থিক কষ্টে পড়ে। তাছাড়া এটা মানসিক ক্লেশদায়ক বটে। কাউকে একঘরে থাকতে হলে সে নিজেকে সংশোধন করতে বাধ্য হয়। কাউন্সিলের আদেশ মেনে নিয়ে সে সমাজে প্রবেশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল নিজেদের কাজ দায়িত্বপূর্ণভাবে নির্ব্বাহ করে। ন্যায় বিচারের খেলাপ বড় একটা হয় না। প্রশাসন বিভাগের কর্ম্মচারীরা কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দেয়। আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গঠিত সরকারী আদালত ও কাউন্সিলের কাজের মধ্যে কোনরকম বিরোধ হয় না। আপাত-দৃষ্টিতে লঘু অপরাধ নিয়ে কাউন্সিল কারবার করে। গর্হিত অপরাধের মামলা (যদিও তা খুব কমই হয়) সর্ব্বদা কর নিকোবরে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা মানকাউরিতে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দায়ের করা হয়। তাছাড়া যদি পুলিশ কখনো কোন অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারে বা আদালতে সে সম্পর্কে অভিযোগ করা হয় তাহলে কাউন্সিল সে ব্যাপারে আর মাথা ঘামায় না।

ওদের আর একটি অলিখিত নীতি আছে। নিকোবরীরা ছাড়া অন্য কেউ যদি কোন অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকে, সে মামলা কাউন্সিল কখনো নেয় না। যথাযোগ্য আইনসঙ্গত নীতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ব্যাপারটি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার তথা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশের কাছে পেশ করা হয়। কখনো বা সামান্য ব্যাপার হলে গাঁয়ের মোড়ল ঘটনাস্থলেই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করে দেয়। মামলায় জড়িত অ-নিকোবরী ব্যক্তিটির সঙ্গে একটা আপোষ রফা করে দেয়। এই আপোষ রফার ব্যাপারেও অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের সম্মতি চাওয়া হয়।

শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও যদি কোন সরকারী কর্ম্মচারীর হাতে কতৃত্বভার থাকে তবে দ্বীপের কাউন্সিল, গাঁয়ের প্রধান মোড়ল বা অন্য কোন মোড়লের মধ্যস্থতায় নিজেদের মনোভাব ও ইচ্ছা অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারকে জানিয়ে দেয় যাতে প্রয়োজন হলে তিনি আরো কিছু করতে পারেন। সাধারণতঃ কাউন্সিলের মতামত ন্যায়সঙ্গত হয়। অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার হয় নিজেই যথাযোগ্য ব্যবস্থা করেন নয়ত সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর দায়িত্ব দেন। ক্বচিৎ কখনো যদি কোন কারণবশতঃ কাউন্সিলের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার নিজে গাঁয়ের প্রধান মোড়লকে এবং অন্য মোড়লদের ডেকে বুঝিয়ে দেন। গাঁয়ের মোড়লরা অত্যন্ত বিবেচক। তারা ব্যাপারটি কখনও খারাপ ভেবে নেয় না বা জবরদস্তি করে না ; তারা নিজেরাই তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করতে না পারলে গ্রামের অন্য মোড়ল ও লোকেদের বুঝিয়ে বলে।

কর নিকোবরের গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল বিকেন্দ্রীকৃত, আদর্শ গণতান্ত্রিক সংস্থা। এই সব সংস্থায় দলাদলি নেই। ষড়যন্ত্র নেই, যা ভারতের মূল ভূখণ্ডের অনেক পঞ্চায়েতের অভিশাপ। এই সব সংস্থা এত সক্রীয় ও এত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যে, কাছের থেকে এদের কাজকর্ম দেখবার সুযোগ পেলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

সপ্তম অধ্যায়

লোকের পেশা

জর্জ্জ হোয়াইট হেড তাঁর 'নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে' নামক গ্রন্থে লিখেছেন একদিক দিয়ে নিকোবরীরা তাঁদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে—ওদের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য যতটা প্রয়োজন ওরা ততটাই কাজ করে তার বেশি নয়। নিকোবরীদের অলস মন্থর জীবনযাত্রার উপর এ টিপ্পনী অতিশয়োক্তির মত শোনায়। কর নিকোবর ও চাওড়ার লোকেরা প্রতিদিন প্রচুর পরিশ্রম করে। মাঝে মাঝে খুব বেশিই পরিশ্রম করে, তবুও তাদের সম্পর্কে এ উক্তি প্রযোজ্য নয়। তবু সন্দেহ নেই যে, মূল ভূখণ্ডের সমশ্রেণীর একজন লোকের চেয়ে কেবলমাত্র জীবিকা অর্জ্জনের জন্য একজন নিকোবরী অনেক কম পরিশ্রম করে।

নিকোবরীদের এই মন্থর জীবনযাত্রার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়ায় শরীরের বল যেমন ক্ষীণ হয়ে যায়, তেমনি কঠিন পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ করে তোলে। নিকোবরীদের চাহিদাও সামান্য। প্রাকৃতিক অগাধ প্রাচুর্য্যের জন্য খুব কম পরিশ্রমেই নিকোবরীরা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপন্ন করতে পারে। যৌথ পরিবার প্রথা, ব্যক্তিগত উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া নিতান্তই যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী নিকোবরীরা চাইতে অভ্যস্থ নয়। নিকোবরীদের কাছে নিজেদের উৎসব-অনুষ্ঠান, খেলা, গান, নাচ, ভোজ ইত্যাদি জীবিকা নির্বাহের মতই জরুরী। আমোদ-আহ্লাদের আয়োজনে ও তাতে অংশ গ্রহণে এদের অনেক সময় কেটে যায়।

নারকেল সুপারী, মিষ্টি আলু ও অন্যান্য সব্জীর ও ফলের চাষ ও ফলন, নারকেলের শুকনো শাঁস, নারকেলের তেল বার করা, মাছ ধরা ইত্যাদি নিকোবরীদের মূল পেশা। ওরা ঘরের কাজ করে,

যেমন জল তোলা, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ, নারকেল পাড়া, ক্ষেত-বাগিচার ফসল ঘরে আনা, রান্না করা, তাড়ি প্রস্তুত করা এসব নানা কাজ করে। প্রযোজন মত গৃহ নির্ম্মাণ ও মেরামত করে। মাছ ধরার নৌকা বা ডোঙা বানায়, কুয়ো খোঁড়ে ও পরিষ্কার করে এবং কুটির শিল্প, যেমন মাদুর ও বাস্কেট তৈরী করে।

সমস্ত নিকোবরীদের পেশা ও কাজের রীতি একই রকম। দর্জ্জি, নাপিত, ছুতোর মিস্ত্রী, রাজমিস্ত্রী, কর্মকার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশাদারী লোকের অভাব থাকলেও প্রত্যেকেই কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ, বিশেষতঃ মিস্ত্রির কাজে। কিছু তরুণ নিকোবরী যারা সরকারের অধীনে কাজ করে, যেমন শিক্ষক, কম্পাউণ্ডার, ড্রাইভার, পিওন, বার্ত্তাবাহক, শ্রমিক, যারা গির্জ্জার কাজ গ্রহণ করে পরে ধর্ম্মযাজক হয়েছে, ট্রেডিং কোম্পানির নিযুক্ত সেলসম্যান, কেরাণী, —এদের আলাদা পেশা। কিন্তু এদেরও কাজের শেষে ঘরে ফিরে গিয়ে গাঁয়ে তাদের দৈনন্দিন কাজে অংশ নিতে হয়। কোন কোন সময় যেমন মে মাসে পল্লীর সমস্ত শ্রমশক্তিকে চাষ-আবাদের জন্য সুসংহত করতে হয়, তখনো যেসব লোক অন্যত্র অন্য কাজে নিযুক্ত থাকে তাদের ছুটি নিতে হয় কিংবা গ্রামের কাজে অংশ নিতে রোজকার কাজ থেকে অনুপস্থিত থাকতে হয়।

স্ত্রীলোকদেরও পুরুষের মত সমান পেশা ও বৃত্তি। তারাও বাইরের কাজ করে; যেমন কৃষি কাজ, ক্ষেত থেকে ঘরে ফসল তোলা, জ্বালানী সংগ্রহ, জল আনা। গৃহ নির্ম্মাণের কাজ, কুয়ো খোঁড়া, ভারি বোঝা ওঠানো, গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা ইত্যাদি শ্রমসাধ্য কাজ স্ত্রীলোকেরা করে না; অনেক বেশি ঘরের কাজ করে যেমন, রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া, ঘর বাড়ী পরিষ্কার করা এবং শিশু পালন। মোটের উপর নিকোবরী মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি কাজ করে।

শিশুরাও খুব অল্প বয়সে পরিবার প্রতিপালনে সাহায্য করে। পরিবারের কর্ত্তা শিশুদের যোগ্যতানুসারে সব কাজের ভার দেয়।

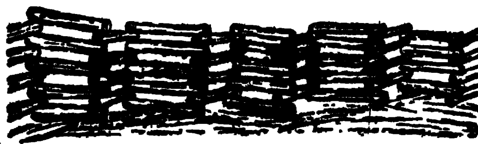
বিশেষতঃ মেয়েরা ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনা করে। এতে তাদের মায়েদের খুব সাহায্য হয়।

চাষ-আবাদ

নিকোবরীদের চাষ-আবাদ করার পদ্ধতি খুবই সহজ ও সরল। গ্রীষ্মমণ্ডলের আবহাওয়ার ও উর্ব্বর ভূমির পূর্ণ সুযোগ ওরা নেয়। উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়া ও উর্ব্বর ভূমিতে চমৎকার ফসল হয়। ওরা এমন ফসলের চাষ করে যার বীজ একবার মাটিতে পুঁতলে সহজেই জন্মায় ও অল্প আয়াসে বেড়ে ওঠে। এদিকে অবশ্য ওদের চাষ-আবাদের রীতি খুবই ভাল; ওরা জমির বুকে খুব বেশী আঘাত করে না। উষ্ণমণ্ডলের আবহাওয়াতে জমির যা ধাঁচ, বেশি খোঁড়াখুঁড়ি করলে, প্রবল বর্ষণে জমির উপরিভাগের স্তর ধুয়ে যায় বলে ভূমিক্ষয়ের খুবই সম্ভাবনা থাকে।

নিকোবরীরা ফসল বা শস্যাদির আবাদ করবার সময় একটি ভূমি-খণ্ড বেছে নেয়; তার আয়তন আট একর থেকে বহু একর হতে পারে। নিজেদের জমি না হলে জমি ব্যবহারের জন্য তারা মালিকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। তারপর পরিবারের সমর্থ লোকেরা একত্র হয়ে নিড়েন দিয়ে জমিটির আগাছা সাফ করে। ছোট ছোট গাছ কেটে ফেলে কিন্তু বড় বড় গাছ রেখে দেয়।

জমির চারদিকে বেড়া না দিলে শুয়োরছানা জমিতে ঢুকে চারা গাছগুলি সব নষ্ট করে দেয়। সারা গ্রাম যখন চাষ-আবাদে ব্যস্ত, তখন শুয়োরগুলিকে অভ্যন্তর ভাগের বনাঞ্চলের ভেতর জনাকয়েক



ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতে বেড়া দেবার সময় এরা ভিতরে ঢুকে বীজ খেয়ে ফেলতে পারে না।

ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে চাষ হয়েছে এমন জমিতে যদি চাষী পরিবারের অফলা নারকেল গাছ থাকে তাহলে বেছে বেছে সেগুলি কেটে ফেলা হয়। জমিতে নারকেল গাছ না থাকলে, জমির অন্তর্গত অন্য কোন বড় গাছ কেটে বা কাছের জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে এরা বেড়া তৈরী করে। গাছের গুঁড়ি আট ফুট লম্বা করে কেটে ও টুকরো করে নতুন বাগিচার বেড়া দেওয়া হয়। দরকারী টুকরোগুলি বেছে নিয়ে বাকি অংশ পুড়িয়ে ফেলে। ছাই কিন্তু ভাল সার। দুটো বড় কাঠের ফালি দশ-বারো ইঞ্চি তফাতে মাটির মধ্যে দু'ফিট করে গেড়ে দেওয়া হয়। এই রকম যুগ্ম কাট প্রায় ছ'ফিট দূরে দূরে আঁকাবাঁকা ভাবে পোঁতা হয়। নারকেল গাছের গুড়ির ভাঙ্গা টুকরোগুলি দুটি লাঠির ডাইনে ও বাঁয়ে লাগিয়ে দেওয়া হয়। বেড়ার উচ্চতা যখন প্রায় চার ফুট, অর্থাৎ শুয়োর বা ছাগলের বেড়া ডিঙ্গিয়ে ভেতরে ঢুকবার উপায় থাকে না, তখন বেতের রশি বা ঐ ধরণের কোন জিনিস দিয়ে গাঁঠে গাঁঠে বেড়াটিকে বেঁধে দেওয়া হয়। এই ভাবে জমির সমস্ত সীমানা ঘিরে বেড়া, কিন্তু দুয়ার থাকে না। যতবার ঢুকবে বেরিয়ে আসার সময় দরজাটি ঠিক বন্ধ করে আসবে কোন চাষীর পক্ষে এতটা সাবধান হওয়া সম্ভব নয় বলেই বেড়ার কোন দরজা রাখা হয় না। এক কোণে বেড়াটি এমনভাবে তৈরী করা হয় যে, দু'তিনটি সমান্তরাল কাঠি খুলে নিয়ে পথ করে নেওয়া যায়।

অল্প সময়ের জন্য ক্ষেতটি ব্যবহার করতে হবে, অথচ কাজের জন্য বেশী লোক পাওয়া যাবে না, এমন অবস্থায় তাড়াতাড়ি ফলে এমন কোন ফসল ফলাবার জন্য ওরা পাতলা কাঠি মাটিতে কোনাকুনি ভাবে লাগিয়ে বেড়া দেয়।

বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ মে মাসের মাঝামাঝি চাষীরা (কখনো তাদের বন্ধুরাও সঙ্গে থাকে) মাটিতে বীজ বোনে। নারকেল, সুপারি, মিষ্টি আলু ইত্যাদি লাগাবার পৃথক পৃথক পদ্ধতি। সচরাচর নারকেল, সুপারি, কলা ইত্যাদি একই সঙ্গে একই জমিতে

লাগায়। বীজ বোনার জন্যে দা বা কাষ্ঠ খণ্ডের তীক্ষ্ণ মুখ দিয়ে জমি প্রায় ছ'ইঞ্চি খুঁড়ে নেয়।

মাঝে মাঝে এক জমির থেকে অন্য জমিতে চাষ-আবাদ করা হয়। মিষ্টি আলু, কলা, পেপে ইত্যাদির খুব তাড়াতাড়ি ফলন হয়। দু'তিন বছর ব্যবহারের পর কোন একটা জমি ফেলে রাখে। নতুন জমিতে নতুন করে হলকর্ষণ হয়। কয়েক বছর অব্যবহৃত থাকায় ক্ষয়প্রাপ্ত ভেষজ পদার্থ জমে জমে পুরনো জমিকে আবার ধীরে ধীরে উর্ব্বর করে তোলে এবং কিছুকাল পরে সে জমি আবার চাষের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বীজ লাগাবার পর খুব একটা যত্ন নেওয়া হয় না। সারা বছর শক্ত বেড়া থাকায় শুয়োর ইত্যাদি ক্ষেতে ঢুকতে পারে না। মিষ্টি আলুর মত জিনিসের ফলন তাড়াতাড়ি হয় কিন্তু নারকেল ইত্যাদি গাছ লাগালে বেড়া আর মেরামত করার প্রয়োজন হয়। গাছগুলি যাতে বেশ বড় হয়ে উঠতে পারে এবং ছাগল শুয়োর ইত্যাদি মুড়িয়ে না খেতে পারে সেইজন্য দু'তিন বছর যাবৎ মজবুত বেড়া রাখতে হয়। ক্ষেতে দেশী সার বা বিলাতী খাদ বড় একটা দেওয়া হয় না। জলসেচের ব্যবস্থা থাকে। আগাছা সাফ করা ছাড়া বাগ-বাগিচার খুব একটা যত্ন নেওয়া হয় না।

নারকেল গাছের উপরেই নিকোবরীরা প্রধানতঃ নির্ভর করে। নারকেল গাছ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আগে থেকেই ছিল, কিংবা বাইরে থেকে আনা হয়েছে, সে কথা অবশ্য জানা যায় না। নারকেল গাছের উৎপত্তি নিয়ে নিকোবরীদের মধ্যে একটা লোককথার প্রচলিত আছে। কোন এক সময়ে একজন যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল, সে নিজের কনুই থেকে জল প্রবাহিত করতে পারত। আস্তে আস্তে সবাই একে বিপজ্জনক বলে মনে করতে লাগল। ভাবলো ওকে শয়তানে পেয়েছে! একদিন লোকেরা ওর মাথা কেটে জঙ্গলে ফেলে দিল। কিছুকাল পরে তার মাথার খুলি থেকে একটি গাছ জন্মালো। তার ফলগুলো মানুষের মাথার মত বড়। ফলগুলো জলে ভরা। দ্বীপে বেশ জলকষ্ট তবু

নারকেলের জল কেউ খাবে না। একদিন একজন রুগ্ন লোক প্রায় মৃত্যুর মুখে, তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। তাকে কিছুটা নারকেলের জল দেওয়া হল। লোকটা আরোগ্যলাভ করতে লাগল। তখন থেকে সব রুগ্ন লোককেই নারকেলের জল দেওয়া হত। এভাবে সবাই নারকেলের জল খেতে শুরু করল।

উপকূল ভাগের দু'তিন মাইল এলাকা জুড়ে সব চেয়ে ভাল নারকেল গাছ হয়। কর নিকোবর ও চাওড়ার মত ঘন বসতিপূর্ণ দ্বীপাঞ্চলের উপকূল ভাগে সমস্ত চাষযোগ্য জমি জুড়েই নারকেল গাছের ঘন বীথি। অভ্যন্তর ভাগে জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা; তাই সেখানে লোকেরা নতুন ক্ষেত আবাদ করেছে।

নারকেল গাছ লাগাবার আগে নিকোবরীরা ভাল জাতের বীজের সংরক্ষণ করে। জমি আগে থাকতে ঠিক করে রাখে। বর্ষার মুখে গাছ লাগায়। নারকেলের নবোদ্গত অঙ্কুর মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। নবোদ্গত চারার মুখ যাতে উপরের দিকে থাকে, ক্ষেতের আকার ও বিস্তার যাতে ভাল মত বোঝা যায় এবং চারাগুলি যাতে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়—এসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়। গাছগুলির উৎপাদন এত ঘন হয় বলে প্রত্যেকটি গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পক্ষে তা ক্ষতিকারক। একই সময়ে শত শত নারকেল গাছ লাগান হয়। কতকগুলি মরে যায়; তবু উর্ব্বর জমি ও অনুকূল জলবায়ুর জন্য প্রচুর নারকেল গাছ হয়।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নারকেল গাছ মূলতঃ একই রকম। একটু তফাত আছে সন্দেহ নেই। অনেকে সাত রকম নারকেলের শ্রেণী বিভাগ করে। কিছু খর্ব্বাকৃতি গাছ, মোটে পনের কুড়ি ফুট লম্বা। অধিকাংশ গাছই আকাশ ছুয়ে বেড়ে ওঠে, উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ষাট ফুট। ফলের রঙেরও তফাৎ আছে, সবুজ, লাল, হলুদ ও পাঁশুটে রঙের। নারকেলের ভেতরের খোলের আকার কখনো বা একটু লম্বাটে ধরনের। অতীতে হুঁকো তৈরীর জন্য এরকম নারকেলের খুব চাহিদা ছিল এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডে রপ্তানি করা হত।

আকারেও তফাৎ, সাধারণতঃ বড় আবার কখনো কখনো বেশ ছোট।

সমস্ত নারকেল গাছের ফলই চমৎকার, উপাদেয় জল আবার শুকনো শাঁস তৈরীর পক্ষেও ভাল। কোন কোন নারকেলের গাছের জল বেশ মিষ্টি। নিকোবরীরা ডাবের জন্য এই গাছগুলি পৃথক করে রাখে। এটা তারা অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারে। একটি মাত্র আলাদা জাতের নারকেল যাদের 'রাজা নারকেল' বলে। এই জাতের গাছ অল্পই আছে। বছর কুড়ি আগে দ্বীপপুঞ্জে এই গাছের আমদানী করা হয়েছে। এ গাছগুলি পনের ফুটের বেশি কখনো লম্বা হয় না ; এবং নারকেল হলদে রঙের। অন্য সাধারণ জাতের নারকেল গাছের চেয়ে এদের পরমায়ু ও ফলন অনেক কম। সেইজন্য এদের আবাদও কম। তবে দেখতে মনোহর ; তাই গ্রামাঞ্চলে কেউ কেউ বাড়ীর পাশে একটা দু'টো লাগায়।

নারকেল গাছের বিস্ময়কর প্রজনন শক্তি। সাধারণ নিকোবরী নারকেল গাছ রোপনের সাত বছরের মধ্যে ফল ধরে। এ গাছ দীর্ঘকাল ধরে বাড়ে, ছড়া বিস্তার করে, তাতে সাত থেকে চোদ্দ কাঁদি নারকেল হয়। আট দশ মাসে পাকে। গড়পড়তায় নারকেল গাছের পরমায়ু আশি নব্বুই বছর। গড়ে একটি নারকেল গাছে দু'বার ফল আর প্রতিবার প্রায় পঞ্চাশটি করে নারকেল হয়। নারকেল পাড়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। সারা বছরই কিছু কিছু ঝুনো নারকেল পাওয়া যায়।

পোকা-মাকড়ে নারকেল গাছের খুব ক্ষতি করে, ইঁদুর আর এক-রকম গুবরে পোকাও। অবশ্য শুয়রেরা গুবরে পোকা খেয়ে ফেলে। তবু ফসলের একটা বড় অংশ (শতকরা প্রায় দশভাগ) পোকায় নষ্ট হয়।

নিকোবরীরা সব গাছ থেকে ঝুনো নারকেল নিয়মিতভাবে পেড়ে নেয় না। এক পরিবারের ক্ষেত-আবাদ হয়ত দ্বীপ জুড়েই রয়েছে, কখনো বা বাড়ী থেকে মাইল খানেক দূরে। প্রতিদিন বাড়ীর

লোকেদের পক্ষে সমস্ত গাছ থেকে ফল পেড়ে আনা সম্ভব নয়। ঝুনো নারকেল গাছ থেকে টপাটপ পড়ে মাটিতে জমা হয়। অন্য নিকোবরীরা তো এগুলো কখনও স্পর্শ করে না। শুয়োরের উৎপাত অবশ্য লেগেই আছে। শুয়োরেরা সর্ব্বদা খাদ্যের অনুসন্ধানে থাকে এবং অনেক নারকেল নষ্ট করে। এদের হাত থেকে নারকেল বাঁচলে দিন কয়েক পরে মালিকের পরিবারের লোকেরা এসে কুড়িয়ে নিয়ে যায়। এই সব নারকেল দিয়ে শুকনো শাঁস তৈরী করে এরা শুয়োরদের খাওয়ায়। নিজেদের জন্য লোকেরা গাছ থেকে তাজা নারকেল পেড়ে নেয়।

নিকোবরী পুরুষ ও নারী উভয়েই খুব সহজে গাছে চড়তে পারে। তবে মেয়েরা কমই চড়ে। গাছে চড়বার সময় নারকেল পাতার আঁশ দিয়ে দড়ি বানিয়ে গোল করে নিয়ে পা এবং গোড়ালির মধ্যে আটকে নেয়। নারকেল পাড়ার জন্য সঙ্গে নেয় দা, ওঠার সময় দু'হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে মুখে করে দা নেয় কখনও বা হাতে। তাল খেজুর গাছে চড়ার পদ্ধতি একটু আলাদা। দড়ির সাহায্যে না উঠে, দা দিয়ে গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে পা রাখবার জায়গা করে নেয়। এতে অবশ্য গাছের একটু ক্ষতি হয়। কিন্তু এতেই গাছে উঠতে সুবিধা। বৃক্ষারোহী রসের পূর্ণ পাত্র হাতে নিয়ে মাটিতে অনায়াসে নামতে পারে।

নারকেল গাছ নিকোবরীদের প্রধান অবলম্বন। গাছের প্রতিটি অংশ দরকারী। ঘরের থামের জন্য গুঁড়ি; টুকরোগুলি ঘরের কাঠামো ও ক্ষেতে বেড়া দেওয়ার কাজে লাগে। পাতা দিয়ে সাময়িকভাবে ঘর ছাওয়া হয়, মাদুর, রাত্রে মশাল জ্বালানর কাজ, ডোঙ্গায় ছাওনি দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজে এ পাতা লাগে। তীরে নৌকা রাখার সময় শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে রাখে। কচি নারকেল পাতা নিকোবরীদের উৎসবের চিহ্ন এবং আনন্দোৎসবে নারকেল পাতা দিয়ে ওরা ঘর সাজায়।

নারকেলের ফুল দিয়ে তাড়ি বানায়, শলা দিয়ে ছাঁকনি। ছাঁকনি

দিয়ে তাড়ি ও তেল ছাঁকে। নারকেলের মালায় রাখে জল ও তাড়ি। আবার পোড়ায়ও। নারকেলের ছোবড়া ইত্যাদি পোড়ায় আবার সারের কাজ হবে বলে মাটির নীচে পুঁতে রাখে। নারকেল শুধু খাদ্য ও পানীয় হিসাবেই নয়, এই ফল ওদের শুয়োর, হাঁস-মুরগী এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর আহারও বটে। নারকেলের তেল দিয়ে রান্না করে, গায়ে মাখে, প্রদীপ জ্বালায় এবং ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে। নিকোবরীদের ব্যবসায়ের প্রধান উপকরণ নারকেলের শুকনো শাঁস। নারকেল ওদের দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনীয় বস্তু। কেনাকাটির জন্য নগদ পয়সা আনে এই নারকেলের শাঁসেই। ওরা নারকেল গাছকে বলে মা। এর গুণ ও উপকারীতা বর্ণনা করে ওরা সুন্দর সুন্দর অনেক গান রচনা করেছে।

অর্থকরী দিক দিয়ে নারকেলের পরেই স্থান সুপুরি গাছের। প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু সুন্দর গাছ। নারকেল গাছের মত উজ্জ্বল সবুজ পাতা, তবে আকারে কিছুটা ছোট। নারকেল গাছের চেয়েও চিকন ও লাবণ্যময়। অভ্যন্তর ভাগের জমি আঠালো ও জলা। সেখানেই এ গাছ বেশি ভাল হয়। সাধারণতঃ চারা (আলাদা তৈরী করে রাখা) জমির ঢালের নীচে রোপন করা হয়, কারণ নীচে সঞ্চিত জলের সংস্পর্শে চারা গাছ সহজেই বেড়ে উঠতে পারে। প্রায়ই এ গাছ স্বাভাবিক ভাবেই জন্মায় ; মাটিতে যে বীজ পড়ে তা বৃষ্টির জলে উপযুক্ত জমিতে গিয়ে পড়ে। কিছুকাল পরে তা থেকেই অঙ্কুর বেরোয়।

গাছ লাগাবার ছ'সাত বছর পরে সুপারি গাছে ফল ধরে। বছরে মাত্র এক'বার। জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্য্যন্ত ফল সংগ্রহের সময়। ফলগুলি ডিম্বাকৃতি, বড় জলপাই এর মত। এক থেকে দু'ইঞ্চি ব্যাস, ছড়াতে আটকানো থাকে। সবুজ রঙ পাকলে হয় হলুদ। হলদে রঙ ধরলে ফল পেড়ে ঘরে আনে। অর্দ্ধেক করে কাটে। তারপর মাটিতে ফেলে রোদে শুকাতে দেয়।

ঠিকমত শুকিয়ে গেলে খোসা ছাড়িয়ে আরো শুকাতে হয়। যথেষ্ট না শুকাইয়ে সুপারি খেলে নেশার আমেজ আসে। কাঁচা সুপারির ছোট একটি টুকরো খেলেও ঘুম ঘুম ভাব হয়। শুকানো সুপারি গ্রামের প্রাইমারী কো-অপারেটিভ (প্রাথমিক সমিতি) সোসাইটিতে নিয়ে কিলো প্রতি দু'টাকা বিশ পয়সা করে বিক্রি করা হয়। এটা সরকার নির্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন বিক্রয় মুল্য।

নারকেলের চেয়ে সুপারিতে পয়সা বেশি হলেও ফলন তত বেশি নয়। তাছাড়া সুপারি গাছের আয়ু নারকেলের চেয়ে অনেক কম। গড়ে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বাঁচে। শুকানোর আগে সুপারি কাটা হয় বলে দ্বীপে গোটা সুপারি পাওয়া যায় না। অর্দ্ধেক কাটা সুপারি আস্ত সুপারির চেয়ে কম দামে বিক্রী হয়। কিন্তু সুপারি কাটা ও শুকানোতে পরিশ্রম বেশি। তাই লোকে আস্তর চেয়ে অর্দ্ধেক কাটা সুপারি পছন্দ করে।

নারকেল ও সুপারিতে নগদ পয়সা আনে। দৈনন্দিন খাদ্যের জন্য নিকোবরীরা অন্য ফল ও সব্জিও উৎপন্ন করে। দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগের মাটি ঘন ও উর্ব্বর। এরা সেখানেই ফল ও সব্জি ফলায়। ওরা কচুও খুব লাগায়। গোটা পরিবারের সভ্যরা মিলে কচুর ছোট ছোট টুকরো বীজ লাগায়। দা বা কাঠের বাটালি দিয়ে প্রায় ছ' ইঞ্চি মাটি খুঁড়ে বীজগুলো পুঁতে দেয়। তা থেকে প্রথমে অঙ্কুর, তারপর বড় বড় চওড়া পাতায় সমস্ত ক্ষেত ঢেকে যায়। কচুগুলি বড় হতে সাত আট মাস সময় লাগে। মে মাসে বীজ ছড়ালে ডিসেম্বরে ফল দেয়। সমস্ত পরিবার একত্র হয়ে কচু তোলে। খুরপি দিয়ে মাটি খুঁড়ে কচু বার করে। কচুগুলি ঘরের মাচানের উপরে তুলে রাখে। মাসের পর মাস পড়ে থাকলেও কচুগুলি খারাপ হয় না। লোকেরা খুব খুশি হয়ে খায়। কিছু কচু আছে খেলে মুখ চুলকোয়।

কলা ও পেঁপেও এই ভাবে লাগান হয়। বছর না ঘুরতেই গাছে ফল ধরে। কাঁচা কলা, কাঁচা পেঁপে তরকারীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

একই ভাবে বেড়া লাগিয়ে অন্য ফল ও সব্জিও ক্ষেতে লাগান হয়। প্রায় বছর খানেক বেড়া থাকে তারপর স্বাভাবিক ভাবে গাছ বেড়ে ওঠে। এর মধ্যে অনেক গাছে ফল ধরতে সুরু করে, ক্ষেতের চিহ্নও থাকে না। আগাছা, বুনো গাছপালা চার পাশে জন্মায়। মনে হয় ফলের গাছগুলি বুঝি জঙ্গলে ভরে গেছে।

সম্প্রতি কৃষি বিভাগের চেষ্টায় ওখানে নানারকম নতুন সব্জি ও ফল গেছে। বিশেষ করে পনের একর জমি জুড়ে এক বিরাট ফলের বাগিচা করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক ভাবে সেখানে নয়া সব্জি, ফল ও শস্য উৎপন্ন করা হচ্ছে। দ্বীপপুঞ্জে তরকারী ও ফলের উৎপাদনে বেশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তবে নিকোবরীরা ফল, সব্জি ইত্যাদি উৎপন্ন করতে সরকারী সাহায্য ও পরিচালনার সুযোগ তত গ্রহণ করছে না। নিকোবরীরা অন্য সব্জি ও ফল পছন্দ করে ঠিকই তবে তাদের নিজেদের চিরকালের জিনিস যেমন নারকেল, কচু, কলা ও পেঁপের উপর যতখানি নজর দেয়, এমন আর কিছুতেই নয়। নতুন প্রবর্ত্তিত ফল ও সব্জিগুলি যত্নে বাড়ে। নিকোবরীদের চিরকালের ফসলের মত নিজে নিজে বাড়তে ও ফলতে পারে না। তাই নতুন ফল ও সব্জির অনেক বীজ ও চারা-গাছ লাগানোর পর মরে যায়। তাই লোকে এই নতুন সব্জি ও ফল খুব বেশি খেতে পায় না। বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত খুব কমই থাকে।

এখানে চাল ডাল বড় একটা জন্মায় না। পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে সরকারী বাগিচায় কর নিকোবরে ধান রোপন করা হয়েছিল। ফলও বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু একজন দু'জন নিকোবরী যখন ব্যক্তিগতভাবে ছোট ছোট জমিতে ধান লাগাল, ভাল ফলন হল না। কাচালে আদিবাসিদের সর্দ্দারনী রানী চাঙ্গা বেশ প্রচুর পরিমাণে ধান রোপন করেন, কিন্তু চাষী আসে মূল ভূখণ্ড থেকে। সুতরাং নিকোবরীরা ধান উৎপন্ন করতে শিখেছে একথা বলা যায় না। নিকোবরীদের চিরাচরিত চাষ-আবাদের সহজ পদ্ধতির কাছে ধান

উৎপন্ন করার পদ্ধতি একটু জটিল। অদূর ভবিষ্যতেও তারা ধান লাগাতে পারবে বলে মনে হয় না।

খাদ্যশস্যের মধ্যে ভুট্টা এই সব দ্বীপে খুব সহজে ফলে। ভুট্টা উৎপন্ন করার পক্ষে জমি ও জলবায়ু খুবই অনুকূল; খুব বেশি যত্নেরও প্রয়োজন হয় না। বছরে প্রায় দু'তিন বার ভুট্টা হতে পারে। মাঝে মাঝে ওরা যখন ফসল লাগায় বেশ ভালই হয়। ওরা ভুট্টা খেতে খুব ভালবাসে। শুয়োরদের খাদ্য হিসাবে ভুট্টা খুব ভাল জিনিস। দুর্ভাগ্যবশতঃ সরকারী উৎসাহ সত্ত্বেও লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা উৎপন্ন করতে উৎসাহী নয়, কারণ এর জন্যে যতটা পরিশ্রম করা দরকার, তা তারা করতে অনিচ্ছুক।

নারকেলের শুকনো শাঁস

দুরকম উপায়ে নারকেলের শাঁস শুকনো করা হয়। সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায় ঝুনো নারকেল ছুলে নিয়ে খোসাটা দু'খণ্ড করে। তারপর মাদুরে বিছিয়ে শাঁসসুদ্ধ খণ্ড নারকেল রোদে শুকিয়ে নেয়। শাঁস যথেষ্ট শুকিয়ে গেলে নারকেলের মালা থেকে ছুরি দিয়ে বার করে নেয়। তারপর আট-দশ দিন আরো শুকিয়ে নিলে জিনিষটি সম্পূর্ণ তৈরী। নারকেলের এই শাঁসের রঙ ফ্যাকাশে হলুদ এবং এর মধ্যে উৎকৃষ্ট জাতের তেল খুব বেশি থাকে। সেইজন্য মূল ভূখণ্ডে এর দাম খুব বেশি। এ জিনিষ তৈরী করা খুব কঠিন কারণ পর পর অনেক দিন ধরে এর জন্য রোদ্দুরের আবশ্যক, যা দ্বীপপুঞ্জে শুধু মার্চ্চ ও এপ্রিলে পাওয়া যায়। সেজন্য এ জাতীয় শুকনো শাঁস বেশি করা সম্ভব হয় না। বেশির ভাগ শাঁস শুকনো হয় আগুনে পুড়িয়ে। কাঠের থাম পুঁতে পাঁচ ফুট উঁচু মাচা তৈরী করা হয়, উপরটা থাকে বাঁশ লাঠি ও নারকেলের ডালে ছাওয়া। মাচার উপর শাঁস সমেত নারকেলের মালা পাঁচ-ছয় স্তরে জমা করে। সবচেয়ে নীচের স্তরটিকে নীচের দিকে মুখ করে রাখে, একটি উপর মুখী, অন্যটি নীচের দিকে, এই ভাবে

সাজায়। মাচার নীচে ঢিমে আঁচে চব্বিশ ঘণ্টা আগুন জ্বলে, এতে আস্তে আস্তে নারকেলের শাঁস গরম হয়ে মালার থেকে শিথিল হয়ে যায় ও শুকনো শাঁসে পরিণত হয়। গরম করার সময় আগুনের শিখা যাতে উপরে না ওঠে এবং মাচার নীচের অংশের সংস্পর্শে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। না হলে সমস্ত মাচাসুদ্ধ জ্বলে যেতে পারে অথবা অত্যধিক তাপে নারকেল নষ্ট হতে পারে। এই পদ্ধতিতে নারকেলের শাঁস শুকাতে প্রায় দশ দিন লাগে।

কোন কোন সময়ে কাজ চালানো মত চুল্লিও বানানো হয়। এরকম চুল্লি বানাতে লোহার বা টিনের পাত অথবা জঙ্গলে জাপানীদের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা লোহার টুকরো দিয়ে মাচা তৈরী করা হয়। এই মাচার উপর নারকেল পাতার ছাউনি দিয়ে ঢালু ছাদ তৈরী করে। মাচাটিকে কিনারার দিকে, মাচার নীচের সমতা থেকে ছাদ পর্য্যন্ত, নারকেল পাতার ঘন বুনট মাদুর দিয়ে ঢেকে রাখে। এতে শাঁসগুলি বাতাস ও বর্ষার ঝাপটা থেকে বাঁচে। কখনো-বা মাটি থেকে ছাদ পর্য্যন্ত সমস্ত পাশটাই টিনের পাত দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। চারদিকে নারকেলের টুকরোগুলি এতে সমান উত্তাপ পায়।

এই নারকেলের শাঁস স্বভাবতঃই কালো হয়। এর তৈলাক্ত উপাদান কমে যায়। এই শাঁস থেকে নিষ্কাসিত তেলের রঙ কালো হয় বলে এর দামও কম। এভাবে তৈরী করার একটা সুবিধে আছে। সব ঋতুতে এমনকি বর্ষায়ও নারকেলের শাঁস শুকানো সম্ভব। নারকেলের শাঁসের ধোঁয়ার কালিমা দূর করতে এবং উৎকৃষ্টতর শাঁস তৈরী করার জন্য সরকার উন্নততর পাকা চুল্লীর ব্যবস্থা করছে। পরীক্ষামূলকভাবে দুটি পাকা চুল্লী, মাস ও পার্কা গ্রামে নির্ম্মিত হয়েছে। যদি কাজ ভাল হয় তাহলে লোকেরা নিজেরাই উৎকৃষ্ট নারকেলের শাঁস তৈরীর জন্য এরকম উনুন তৈরী করে নেবে। এতে ওরা দামও বেশি পাবে ও দ্বীপপুঞ্জের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হবে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যে নারকেলের শুকনো শাঁস তৈরী হয় তা খাওয়ার যোগ্য নয়, শুধু রান্নার সীমিত উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার। মূল ভূখণ্ডে সাবান ও অন্য প্রসাধন সামগ্রীর জন্য এর থেকে প্রধাণতঃ তেল বার করা হয়। তৈরী নারকেলের সমস্ত শাঁসই প্রায় মূল ভূখণ্ডে পাঠানো হয়। তৈরী শাঁস, গাড়িতে করে গাঁয়ের প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে নিয়ে কিলো প্রতি পঁচাত্তর পয়সায় বিক্রি করা হয়। এটা সরকার নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনিম্ন দর। গাঁয়ের কো-অপারেটিভ সোসাইটি ট্রেডিং কোম্পানীদের কাছে বিক্রী করে, তারা আবার জাহাজে করে কলকাতার বাজারে পাঠায়।

তৈল নিষ্কাশন

নারকেল তেল নিষ্কাশনের দু'রকম পদ্ধতি। প্রথমটা হল 'ক্লিওল' বলে একরকম কাঁটাওয়ালা পাতার বোঁটার সাহায্যে নারকেল কুরে নেওয়া। তারপর সেই কোরা নারকেল একটি পাত্রে অর্দ্ধেক জল দিয়ে রোদে ফেলে রাখা হয়। কিছুদিন বাদে তেল আলাদা হয়ে জলের মধ্যে ভাসতে থাকে। তারপরে তেলটাকে তুলে নিয়ে ছেঁকে ফেলে। এইভাবে খুব ভাল জাতের বিশুদ্ধ তেল তৈরী হয়। তবে এতে তেলের পরিমাণ অতটা বেশি হয় না যত হয় দ্বিতীয় পদ্ধতিতে। তাছাড়া সময়ও বেশি লাগে। ওষুধের উদ্দেশ্যে বা বাইরের কেউ চাইলে এই পদ্ধতিতে তেল বার করা হয়। প্রতি দিনের রান্না-বান্নায়, গৃহের দীপ জ্বালাতে গায়ে ও চুলে মাখতে লাগে দ্বিতীয় পদ্ধতির নিকৃষ্ট তেল। এই পদ্ধতিতে নারকেল কুরে নিয়ে নরম করার জন্য আগুনে রেখে গরম করা হয়। একটি উপযুক্ত গাছ বেছে নিয়ে তলায় গুঁড়িতে গর্ত্ত করে নিয়ে তাতে বেশ মজবুত একটি কাঠের তক্তা লাগিয়ে দেয়। তক্তার নীচে বাইরের দিকে সরু সরু খাঁজ কাটা একটি মোটা কাঠের থালা চ্যাপটা একটি ভারি পাথরের ওপর রাখা থাকে, থালায় তেল বার হবার জায়গা থাকে। তৈল নিষ্কাসনের সময় গরম কোরা নারকেল কাঠের থালার মধ্যে

রাখে এবং উপরের কাঠের তক্তা দিয়ে চাপা হয়। দু'তিন জন তক্তার উপর বসে চাপ দেয়। চাপের ফলে কোরা নারকেল থেকে তেল বার হয়ে কাঠের থালার খাঁজের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। তেল বেরিয়ে যাবার জায়গা থেকে সেই তেল তুলে নিয়ে একটি পাত্রে রাখা হয়। তেল বিশুদ্ধ করার জন্য একটি নারকেল পাতার ছাকনি তেল বেরুবার মুখেই লাগিয়ে রাখা হয়। এই ভাবে চাপ দিয়ে তেল নিষ্কাশন করতে খুব কম সময় লাগে। পনের থেকে ত্রিশ মিনিটে হয়ে যায়। সাধারণতঃ মেয়েরাই তেল বার করে। প্রায়ই দেখা যায়, দুতিন জন নারী কাঠের তক্তার উপর বসে, ফুর্ত্তির সঙ্গে গল্পগুজব করছে, আর ওদিকে তেল চুঁইয়ে পড়ছে।

পশু-সম্পদ ও গৃহপালিত জন্তু

নিকোবরীদের সবচেয়ে প্রধান গৃহপালিত পশু শূয়োর। দ্বীপপুঞ্জের শূয়োরদের মধ্যে নানা জাতের সংমিশ্রণ ঘটেছে। নিকোবরী শূয়োরদের সাধারণত ধূসর রঙ, গায়ে লোম। পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত একটি শূয়োর দু'ফুট উঁচু। ওজন একশ-কুড়ি পাউণ্ড।

প্রত্যেক পরিবারে বহু শূয়োর আছে। বলতে গেলে এক পরিবারের যত লোক তার প্রায় দেড় গুণ শূয়োর। কখনো এক পরিবারে শূয়োরের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে, প্রতিটি জন্তুর যত্ন নেওয়া সম্ভব হয় না। সেজন্য অনেক শূয়োরের গায়ে চিহ্ন দিয়ে চরে খাবার জন্য অভ্যন্তর ভাগের বনাঞ্চলে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরিবারের কয়েকজন লোক শুধু ক্ষেত-খামার আর শূয়োরগুলিকে দেখাশোনা করার জন্য অভ্যন্তর ভাগেই থাকে।

বনাঞ্চলে যে সব শূয়োর ছেড়ে দেওয়া হয় তারা বুনো হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মালিক ও অন্যরা ওদের শিকার করে। তাছাড়া বড় বড় ভোজের সময় ওদের জঙ্গল থেকে ধরে এনে লড়াই করানো হয়। পরে আহারের জন্য বধ করা হয়।

শূয়োরের জন্য আলাদা কোন খোঁয়াড় তৈরী করা হয় না।

গ্রামের ভিতর ক্ষেত-খামারে ওরা চরে বেড়ায়, রাত্রে বাড়ী ও ঘরের মেঝের নীচে আশ্রয় খোঁজে। গাঁয়ে যে সব শূকর থাকে তাদের নিয়মিত নারকেল খাওয়ান হয়। একটি শূয়োর রোজ প্রায় চার-ছ'টা নারকেল খেয়ে ফেলে। গ্রামের শূকরদের খাবার জন্য থাকে নির্দ্দিষ্ট একটি জায়গা, সাধারণত গাঁয়ের কাছেই, তবে ঘরবাড়ি থেকে একটু দূরে। শূকরদের খাওয়ার জন্য তিন ফুট উঁচু কাঠের মাচা তৈরী করা হয়, জলের জন্য থাকে বিশাল কোন সামুদ্রিক জন্তুর খোলা বা পুরানো কাঠের ঢাকনি শূন্য সরু মুখের কোন পাত্র। দিনে একবার সন্ধ্যার সময়, শূকরদের খেতে ডাকতে তাদের মালিক, জিভ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করে। এই বিচিত্র আওয়াজ বাইরের লোকের কাছে অদ্ভুত লাগে, মনে হয়, সুদূর অতীতের ডাকিনীদের যাত্নবিদ্যার মত এই ডাক ছাড়ার রেওয়াজ। প্রকৃতপক্ষে এটা পালিত পশুর প্রতি মালিকের আদরের ডাক। এ ডাক শুনে তারা ছুটে চলে আসে নির্দ্দিষ্ট স্থানে।

শূকরদের জন্য নিকোবরীদের অদ্ভুত ভালবাসা। কখনো যদি কোন শূকর ছানা স্বাভাবিক ভাবে না বাড়ে তাহলে যে-নারীর স্তনে প্রচুর ত্নধ, সে তার নিজের বুকের ত্নধ খাইয়ে তাকে বড় করে। অবশ্য এ প্রথা এখন বিলুপ্তপ্রায় কারণ নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে লোকে এখন এতে একটু বিব্রত বোধ করতে শিখেছে। স্থানান্তরে নিয়ে যাবার সময় শূকরের চারটি পা ওরা ত্নটি মজবুত কাঠের খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে নেয়। তার মুখ থাকে উপরের দিকে, পিঠের নীচে বিছিয়ে দেওয়া হয় কিছু নারকেল পাতা। চার কিম্বা ছ'জন লোক শূকরসহ ওই কাষ্ঠখণ্ড বহন করে নিয়ে যায়। এভাবে বয়ে নিয়ে যেতে বেচারী জন্তুটার জন্য কষ্ট হয়, আসলে কিন্তু বেশ আরামেই থাকে। তাছাড়া এমন অসভ্য জানোয়ারকে আর কি ভাবেই বা নিয়ে যাওয়া সম্ভব!

চর্ব্বী বাড়াবার জন্য পুরুষ শূকরদের বড় ক্রূর উপায় খাসী করে দেওয়া হয়। প্রতি বছর একটি শূকরী প্রায় দশটি বাচ্চা প্রসব

করে। প্রায় এক মাস পরে অধিকাংশ ছানা সে একে একে খেয়ে ফেলে, দুতিনটি শুধু পুরো আকারে বড় হতে দেওয়া হয়, কারণ যদি সব ছানাগুলো বড় হয়ে উঠে তবে মানুষের খাবারের জন্য একটাও যে নারকেল থাকবে না।

বস্তুতঃ নিকোবরীদের শূকর পালনের পদ্ধতিটিই ত্রুটিপূর্ণ। অনেক সময় শূকর পুরোপুরি না বাড়ার আগে তাকে খেয়ে ফেলা হয়; আবার কখনও পুরোপুরি বাড়ার পর। আর যখন তার ওজন বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা নেই, তখনও তাকে অনেক বছর পর্য্যন্ত রেখে দেওয়া হয়। কারণ বড় ভোজ উপলক্ষেই তাকে হত্যা করার প্রশ্ন উঠে। শুধু উৎসব, বাইচ খেলা প্রভৃতি বিশেষ উপলক্ষ্য ছাড়া শূকরের মাংস খাওয়ার রীতি নেই। তাই শূকরগুলি সুপুষ্ট হবার পরও বছরের পর বছর ওদের খাদ্যের রসদ জোগাতে এই নিছক অপব্যয়।

তাছাড়া শূকরগুলি ওদের অর্থ ব্যবস্থা বিপর্যয়ের একটা বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা পূর্ণকায় শূকর দিনে চারটে থেকে ছয়টা নারকেল খায়। এদের খাওয়াতে দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত নারকেলের প্রায় এক তৃতীয়াংশ দরকার। এই অর্থকরী মূল্যবান শস্য যদি শুকনো শাঁস তৈরীর কাজে পাওয়া যেত তাহলে ব্যবসাতে লোকের প্রায় দ্বিগুণ আয় হ'ত। এটা ভাগ্যেরই পরিহাস। লোকেরা যদি আর একটু প্রয়াস করতো তাহলে দ্বীপগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ভুট্টা উৎপন্ন করতে পারত। এতে শূকরের উৎকৃষ্ট খাদ্যও হত এবং শূকরের পেছনে অযথা নারকেলের অপব্যয় হত না। ভুট্টা চাষ জনপ্রিয় করবার জন্য সুপরিকল্পিত সরকারী চেষ্টা সত্ত্বেও লোকেরা প্রচুর পরিমাণে ভুট্টার চাষ করতে চায় না কারণ এতে খুব পরিশ্রম। বিশেষ করে বেড়া দেবার ভাল ব্যবস্থা আগে চাই, যা ওরা মোটেই চায় না। বস্তুতঃ এ যেন একটি চক্র-আবর্তে আটকে পড়ার মত। শূকরের জন্য ভুট্টার চাষ বাঞ্ছনীয় কিন্তু ভাল বেড়া না হলে ভুট্টা জন্মানো শক্ত। এই চক্র-আবর্ত তখনই ভাঙ্গবে যখন লোকেরা

আরো এগিয়ে যাবে, আর্থিক তাগিদে আয় বৃদ্ধির নতুন রাস্তা খুঁজবে এবং ভুট্টা চাষের জন্য আরও পরিশ্রম করতে চাইবে।

বর্তমানে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শূকর পালন, পোষণ এবং শূকরের মাংসের ওপর ভিত্তি করে খাদ্য শিল্প প্রসারের (হ্যাম, বেকন অর্থাৎ শুকরের লবণাক্ত উরু পিঠের দিকের লবণাক্ত মাংস টিনজাত ক'রে বিক্রী করা) যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কিন্তু নিকোবরীরা যতদিন শূকরের জন্য বিকল্প খাদ্যের ব্যবস্থা করছে এবং শূকর পুরোপুরি পরিপুষ্ট হয়ে উঠলে তাকে বধ করে খেতে শিখছে (তার আগে বা পরে হত্যা বন্ধ করতে হবে) ততদিন পর্যন্ত উন্নতর শূকর পালনের প্রচেষ্টা বা আনুষঙ্গিক শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ ব্যয় নেহাৎ পণ্ডশ্রম।

নিকোবরীরা অল্পেতে সন্তুষ্ট। কিন্তু ওদের শূকরগুলির প্রকৃতি একেবারে বিপরীত। নারকেলের মত এত সুস্বাদু খাদ্য পেয়েও ওরা সন্তুষ্ট নয়। সব সময় এরা আহারের সন্ধানে থাকে। চারা-গাছ পেলে নষ্ট করে। খুব শক্ত বেড়া না হলে এদের হাত থেকে গাছপালা রক্ষা করা দায়। এরা কৃষিজাত উৎপন্ন দ্রব্যের সব চেয়ে বড় শত্রু। ওদিকে আবার সর্ব্বভুক। হাঁস, মুরগী ইত্যাদি বাচ্চা যদি একবার শূকরের মুখের সামনে এসে পড়ে তাহলে আর রক্ষা নেই, অমনি খেয়ে ফেলবে। তবে শূকররা ময়লা সাফ করার মত দরকারী কাজও করে। ওরা শামুক-গেঁড়ি খায়, ফলে শামুক-গেঁড়ি বেশি বাড়তে পারে না।

নিকোবরীদের অন্তরে শূকরের খুব বড় স্থান। এর কারণ বলা শক্ত। তবে মনে হয়, শূকরের মাংসের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি এবং অন্য জন্তু-জানোয়ারের অভাবের জন্যই বোধ হয় শূকররা ওদের এত স্নেহের পাত্র। ওরা শূকরদের কম ভালবাসে না। কোন শূকরের একটু আঘাত লাগলেই ওরা বিচলিত হয়ে পড়ে। বোধ হয় এই মমতাবশতঃই ওরা শূকরদের বধ করার সময় যন্ত্রণা কম হবে বলেই অতি তীক্ষ্ণ ছুরি ওদের বুকে বসিয়ে দেয়।

উৎসব উপলক্ষে শূকরের মাংস খেতেই হবে। অতিথিদের শূকর উপহার দেওয়া রেওয়াজ। উৎসবে বধ করা শূকরের চোয়াল আনন্দ ভোজের স্মরণীয় ঘটনা হিসাবে লোকেরা সগর্বে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। নিকোবরীদের কাছে শূকর ধন ঐশ্বর্য্য ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীকস্বরূপ। যার যত বেশি শূকর, লোকের কাছে সে তত ঈর্ষার পাত্র। গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিল, ছোটখাট অপরাধ ও বিবাদ নিষ্পত্তির সময়ে শূকরই জরিমানা হিসেবে দিতে বলে। শূকরের স্তুতি করে কত গান যে রচিত হয়েছে বা হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ছাগল অবশ্য শুধু মাংসের জন্যই পালে। তবে আজকাল লোকেরা চায়ের জন্য ছাগলের দুধ রাখতে সুরু করেছে। মনোযোগ দেবার অত দরকার হয় না বলে ছাগলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এখানে সেখানে চরে-বেড়িয়ে ঘাস পাতা খেয়েই ওরা বেঁচে থাকে। সাধারণতঃ ওদের দেখাশোনার জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লাগান হয়। তবে এ মাংসের চাহিদা অনুসারে ওদের সংখ্যা বাড়ছে না বলে এখনো ছাগমাংসের বেশ অভাব।

হাঁস-মুরগী এবং অন্যান্য পাখীও পালন করা হয়। অধিকাংশই স্থানীয় পাখী। ছোট ছোট পাখী। পাখীগুলি বেশ শক্ত সামর্থ আর ভাল ডিমও পাড়ে। অনুন্নত জাতি কল্যাণ সাধন পরিকল্পনা কার্যসূচী অনুসারে রোও আটল্যাণ্ট রেও, হোয়াইট লেগহর্ণের মত উন্নত জাতের পাখী কোন কোন পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু খুব বেশী সুবিধা হয়নি। আজকাল এজাতের সামান্য কয়েকটি পাখী দেখতে পাওয়া যায়।

নিকোবরীদের হাঁস-মুরগী পালন পদ্ধতিটা একেবারে আদিম রয়ে গেছে। দিনে দু-একবার নারকেলের টুকরো দেওয়া ছাড়া ওদের প্রতি আর কোন বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় না। ওদের বাসস্থান বলে কিছু নেই। পাখীগুলি এখানে সেখানে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। এতে অবশ্য ওরা পোকামাকড় ও অন্য বুনো খাবার খুঁটে খেতে

পারে। এতে ওদের আহারের ঘাটতিও কিছুটা পূরণ হয়। রাতে ঝড় জল হিম শীতল প্রাকৃতিক অবস্থার মধ্যেই এরা গাছের উপরে ঘুমিয়ে থাকে। পশু বিভাগ থেকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত খাদ্য ও যত্নের অভাবে অনেক পাখী রোগের কবলে পড়ে। বস্তুতঃ লোকেরা হাঁস-মুরগী ও পাখী ইত্যাদি পালনে কোন রকম প্রয়াস করতে চায় না বলে পাখী পালনের কর্মসূচীরই কোন অগ্রগতি করা সম্ভব হয়নি।

যেসব পাখী জঙ্গলে ডিম পাড়ে লোকেরা তাদের ডিম পায় না। কারণ বেশির ভাগই শূকর খেয়ে ফেলে। কোন নিকোবরী মুরগী খেতে চাইলে রাত্রিবেলা যখন সে তার নির্দিষ্ট গাছে ঘুমাতে আসে তখন তাকে ধরতে হয়। দিনেরবেলা মুরগীর প্রয়োজন হলে, তার পেছন পেছন দৌড়ে ধরতে হয় অথবা তীর ছুঁড়ে মারতে হয়। মুরগীগুলো এত দ্রুত পালাতে পারে যে; প্রায়ই নাগালের বাইরেই থাকে। ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত সময়ের জন্য মালিককে তার মুরগীর ভোজ স্থগিত রাখতে হয়।

অতীতের মিশনারী ও ব্যবসায়ীদের পরিত্যক্ত কিছু গরুর বংশধর এখানে রয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকগুলিই বেশ ভাল জাতের গরু। কিন্তু এদের কোন যত্ন নেওয়া হয় না। যেন পুষবার জন্যই রাখা, দুধের জন্য নয়। ধর্মের ষাঁড় হয়ে তারা ঘুরে বেড়ায়। কোন উপযুক্ত খাদ্যও দেওয়া হয় না। নিয়মিত দোয়ান হয় না বলে দুধও শুকিয়ে যায়। গৃহপালিত গরু রাখার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে কারণ তার জন্য যে পরিশ্রম করতে হয় তা করতে এরা রাজী নয়। পশু খাদ্যের অভাবে দুগ্ধশালা গড়ে তোলার অনেক বাধা। সরকার এখন ভাল ঘাস জন্মাবার চেষ্টা করছে। এতে সফল হলেই গরু-মোষ পালন ও তাদের উন্নতি সম্ভব হবে।

বিড়াল কুকুরও পোষা হয়। অতীতে নাবিকরাই বোধ হয় বিড়াল নিয়ে এসেছিল। ইঁদুর মারার জন্যই এদের রাখা। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অনেকদিন ধরেই বোধ হয় কুকুর আছে। মূল

ভূখণ্ডের রাস্তার কুকুরের মতই এখানকার কুকুর। এই কুকুরগুলির গুরুত্ব কম নয়, কারণ একটা কিম্বদন্তি অনুসারে নিকোবরীরা এক কুকুরীর গর্ভ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। গল্প আছে যে একবার মহাপ্রলয়ে সমস্ত চরাচর জলে ডুবে গিয়েছিল, শুধু একজন মানুষ একটি বিশাল চূড়ায় আরোহণ করে আত্মরক্ষা করেছিল। জল কমলে লোকটি নীচে নেমে এসে দেখলো একটি কুকুরী ছাড়া আর কোন প্রাণী জীবিত নেই। কুকুরী একটি কাঁটাভরা গাছের ডালে আটকা পড়েছিল। লোকটি গাছের ডাল ভেঙ্গে কুকুরীকে ছাড়িয়ে দিল। আর কোন সঙ্গী না পেয়ে লোকটি কুকুরীকেই স্ত্রী বলে গ্রহণ করল। তাদের মিলনের ফলে জাত শিশুরাই প্রথম নিকোবরী। এর ওপর জোর দেবার জন্যই নিকোবরী পুরুষেরা অতীতে যে হ্রস্ব কৌপীনখণ্ড পরতো তার একটা প্রান্ত পেছন দিকে লেজের মত ঝুলিয়ে দিত। সুসজ্জিত টুপির কোণাও কুকুরের কাণের মত খাড়া থাকত। এটা ছাড়া এরা পূর্বপুরুষের গল্প কথায় আর বিশেষ কোন মূল্য দেয় না। নিকোবরী কুকুরদের একেবারে অস্থিচর্ম্মাসার করুণ চেহারা। এদেরও নারকেল খাওয়ান হয়, নারকেল খেয়ে শূকররা মোটা হতে পারে কিন্তু কুকুরদের পক্ষে বড় সামান্য আহার। নিকোবরীরা মাংস এত কম খায় বলেই কুকুরেরা ওদের প্রিয় খাদ্য হাড়-মাংস বড় একটা খেতে পায় না। পশুদের ওপর জলবায়ুর প্রভাব পড়ে। নিকোবরী কুকুররা ওদের প্রভুদের মতই অলস মন্থর স্বভাবের। নিকোবরী কুকুরকে কখনো শূকর বা গরুর পিছনে তাড়া করতে দেখা যায় না। স্বজাতি দেখলেই তার যা একটু মেজাজ। তখন যেমন ঝগড়া, আবার তেমনি আদর।

সামান্য কয়েকটি কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে। শুধু সেই কুকুরগুলিরই কুকুরের মত। যতটা সম্ভব তাদের মাংস খাওয়ান হয়। হিংস্র বলে শিকলে বেঁধে রাখা হয়। লোকেরা শূকর শিকারের জন্য দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে বনের মধ্যে শিকারী কুকুরদের নিয়ে যায়।

মাছ ধরা

নিকোবরীরা মৎস্য প্রিয়। সুযোগ মত ওরা সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সমুদ্র শান্ত। তখন পুরুষেরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। নাগাড়ে দু'তিন দিন ডোঙ্গায় চেপে তীর ভূমি থেকে অনেক মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। এছাড়া প্রায়ই নিকোবরীরা সারা রাত জেগে মাছ ধরে।

প্রত্যেক পরিবারের মাছ ধরার নিজস্ব ডোঙ্গা আছে। ওখানকারই তৈরী। সমুদ্রে মাছ ধরার সময় ওরা নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রশির সঙ্গে ওজনদার কিছু বেঁধে একটা নোঙ্গর বানিয়ে নেয়। সমুদ্রে কিছু দূর পর্যন্ত ওটা নামিয়ে দেয়। এতে ডোঙ্গা অতটা হেলতে-দুলতে পারে না এবং সমুদ্রে মাছ ধরা অনেক সহজ হয়ে যায়।

মাছ ধরার সাধারণ উপায় পুরানো হুক ও বড়শি। এর জন্যে ৪৮০ থেকে ৬০০ ফুট লম্বা প্লাষ্টিকের তার কাঠের ফাতনায় পেচিয়ে তা ব্যবহার করা হয়। তারের খোলা দিকের প্রান্তটি একটি আংটায় লাগিয়ে ষ্টীলের তার দিয়ে হুকের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়। চারজন ছয়জন করে জেলেরা ডোঙ্গা বেয়ে তীরভূমি থেকে দু'চার মাইল দূরে চলে যায়। হুকের সঙ্গে কেঁচো, ছোট মাছ, কাঁকড়া ইত্যাদি গেঁথে তারটি সমুদ্রের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে একটা দিক শক্ত হাতে চেপে ধরে থাকে। মাছ বড়শিতে ধরা পড়লে ফাতনা নড়ে ওঠে। তখন মাছ ধরে ডিঙ্গিতে তোলা হয়, মাছটা ততক্ষণে লাফানি-ঝাপানি ছেড়ে মরে যায়। কখনো কখনো তার দিয়ে তীর থেকেও মাছ ধরে। তখন অপেক্ষাকৃত একটি পাতলা তারের সঙ্গে ছোট হুক লাগিয়ে দেয়। তারটাকে গোল করে ঘুরিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে। তবে ওরা তীর থেকে এভাবে মাছ ধরা পছন্দ করে না কারণ সমুদ্র তীরে বসার স্থানের অভাব। তবে কর নিকোবরে মালাক্কার সমুদ্রে একশ গজ প্রসারিত পাকা জেটি নির্ম্মিত হওয়াতে লোকের বসার খুব সুবিধে হয়েছে এবং অনেক লোককে এখন সারা রাত সমুদ্রে মাছ ধরতে দেখা যায়।

তার এবং হুক দিয়ে মাছ ধরার আর একটি রীতি আছে। জোয়ার আসার সময় তীরের কাছে লোকে চার থেকে আট ফুট লম্বা প্লাষ্টিকের তারের সঙ্গে হুঁক বেঁধে কাঠের ফাতনায় লাগিয়ে সমুদ্রে ফেলে রাখে। যখন মাছ হুঁকে বিদ্ধ হয় কাঠের ফাতনা উপরে নীচে নড়তে থাকে। জেলেরা তড়িৎ-গতিতে তার টেনে মাছ তুলে নেয়।

মাঝে মঝে জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়। এই জন্য তুলো বা নাইলনের সূতোয় তৈরী প্রায় সাত ফুট লম্বা মোচাকৃতি এই জালের মাথায় দড়ি বাঁধা থাকে। অল্প জলে মাছ ধরতে এমন জালের দরকার। এরা জলের উপর নজর রাখে। যখন বোঝে মাছ নিকটেই আছে, তখন ঘুরিয়ে জাল ফেলে। জলের মধ্যে গোলাকৃতি একটি বন্ধনীর সৃষ্টি হয়। বন্ধ জলের মধ্যে মাছগুলি জালে ধরা পড়ে। তখন দড়ি টেনে জাল গুটিয়ে নেয়।

কম জলে বেড়া জাল টানার একটা মজার রীতি আছে। এতে ছয় থেকে আট জন লোক চল্লিশ থেকে ষাট ফুট লম্বা এবং তিন চার ফুট চওড়া জাল জলের মধ্যে বিছিয়ে দেয়। ডুবে যাতে না যায় সেই-জন্য জালটির মাথায় দড়িতে বড় বড় সোলার টুকরো লটকানো থাকে আর নীচের দিকে থাকে লোহার কড়ি ঝোলান।

জাল পাতার জন্য একটি লোক জালের এক প্রান্ত একটা নির্দিষ্ট স্থানে ধরে থাকে আর একজন জাল বয়ে নিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে বিছিয়ে দেয়। সোলার টুকরোগুলোকে মাথায় করে জালটা খাড়া হয়ে ঝুলতে থাকে। জালের দুই প্রান্ত দু'একজন করে লোক ধরে থাকে। অন্যরা জালের মাঝখানটায় নানা জায়গায় ধরে। যারা জালের প্রান্ত দুটি ধরে থাকে তারা অন্য প্রান্তের দিকে এগিয়ে জাল গুটিয়ে আনে। জালের মাথার দিকের ও নীচের দিকের দড়ি টেনে একটা বেড়ার মত তৈরী করা হয়। দু'তিনজন লোক মাছগুলিকে অর্দ্ধবৃত্তাকার বেড় জালের মুখ থেকে জালের ভেতরে গুটিয়ে আনে। জালের বেড়া চারদিক থেকে বন্ধ করে মাছগুলিকে ডাঙ্গায় তোলে।

এটা সবচেয়ে ফলপ্রদ প্রদ্ধতি হলেও এরকম জাল খুব কমই আছে।

ওরা মাছ ধরার ফাঁদ পাততেও শিখেছে। ফাঁদ সাধারণতঃ ফাঁড়া বাঁশের কঞ্চি এবং নারকেল পাতা দিয়ে তৈরী হয়। আকার মোচা অথবা ঝুড়ির মত। ভাঁটার সময় এ জিনিষ ব্যবহৃত হয়। জল টেনে গেলে সমুদ্রতলের প্রবাল প্রাচীরের অনেক গর্ত্তের মধ্যে কিছু কিছু জল ও ছোট মাছ থেকে যায়। জলের টানে তারা সমুদ্রের দিকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যেতে থাকে। লোকেরা সমুদ্রতলে জোয়ারের এলাকায় বালু, পাথর ও পাতা দিয়ে একটি দেয়ালের মত তৈরী করে। তার মধ্যে প্রবাল প্রাচীরের গর্তের গায়ে ফাঁদ পেতে দেয়। ফাঁদটির মুখ থাকে তীরের দিকে। জল ও মাছ যখন সমুদ্রের দিকে চলতে সুরু করে, জল বেরিয়ে যায় কিন্তু মাছগুলি ফাঁদে আটকে যায়। ভাঁটার সময় আস্তে ফাঁদ তুলে মাছ ধরে, কিন্তু খুব একটা সুবিধে হয় না বলে এরকমভাবে খুব কমই মাছ ধরা হয়।

আর এরকম মজার মাছ ধরার রীতি আছে হার্পুন দিয়ে, অর্থাৎ লোহার কাঠের বা বাঁশের ডগায় ফলা লাগানো বল্লমের সাহায্যে। বল্লমটা প্রায় আট দশ ফুট লম্বা, এর অন্য দিকটায় এক টুকরো রবারের গোল রিঙ লাগানো। জোয়ারের সময় জেলে সমুদ্রে ডুব দেয়, চোখে তার ঠুলি আঁটা। কাঁচ লাগানো থাকে যাতে সে জলের ভেতর দেখতে পায়। হার্পুনটা ঝোলে ঐ রবারের রিঙের মধ্যে দিয়ে গলানো হাতে। তার মুখ সমুদ্রের দিকে, শ্যেনদৃষ্টি জলের তলদেশে নিবদ্ধ। যে সব মাছ জোয়ারের জলে তীরের মত ছুটে চলে যায় সেই দিকে তার নজর। কাছাকাছি মাছ দেখলে, জেলে রবারের রিঙে একটা হ্যাঁচকা টান দেয়। গুলতির মত বল্লমটা ছুটে গিয়ে মাছটাকে আঘাত করে। এরকম মাছ ধরায় যথেষ্ট দক্ষতার দরকার কারণ লক্ষ্য নির্ভুল হওয়া চাই এবং বল্লমধারীর এক হাতে বল্লমটা ছুঁড়তে পারা চাই। মনে হয় এরকম মাছ ধরার

রীতি ওরা জাপানীদের কাছে শিখেছে। সমস্ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এটি এখন খুবই জনপ্রিয়।

ভাঁটার সময় জল কমে গেলে প্রবাল প্রাচীরের গর্তে গোঁড়ালি পর্য্যন্ত জল থাকে। ছোট মাছ তখনো জোয়ারের এলাকায় বন্ধ থাকে এবং বড় বড় সরু ছুরি দিয়ে তাদের মারা হয়। স্ত্রীলোকেরাও প্রবাল প্রাচীরে সংলগ্ন ঝিনুকের মত খোলওয়ালা ছোট ছোট সামুদ্রিক জন্তু ধরে। মাছ ধরার জায়গাতেই খোলস ছাড়িয়ে মাছের মত নরম অংশটাই ঘরে নিয়ে যায়। ক্বচিৎ কখনো কাঁটা দিয়ে মাছ ধরা হয়। লোহার পাঁচ-শলা যুক্ত কাঁটা হুঁকে আটকানো থাকে, প্রায় আট ফুট লম্বা একটি লাঠির সঙ্গে সেটা থাকে সংলগ্ন, এবং দড়ি দিয়ে বাঁধা। লাঠিটাকে জলে ছুড়ে দেওয়া হয় কিন্তু রশির প্রান্ত ধরে রাখা হয়। কাঁটা কোন মাছকে আঘাত করলে সেটা শলায় আটকে যায় এবং তাকে তোলা হয়। এই রীতিটি অতটা সুবিধের নয় বলে মোটেই জনপ্রিয় হয়নি।

সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ মাছ ধরা হয় রাত্রে মশালের আলোয়। শুকনো নারকেল পাতার মশাল অনেকক্ষণ ধরে জ্বলে। ভাঁটার সময়ে যখন প্রবাল প্রাচীরের খুব বড় একটা অংশ সমুদ্রতল থেকে জেগে ওঠে অথবা দু'এক ফুট মাত্র জল থাকে এবং ছোট মাছ প্রাচীরের গর্তে আটকে পড়ে তখন এই মশাল জ্বেলে মাছ ধরা হয়। পুরো পরিবারই এই মাছ ধরায় যোগ দেয়।

নারী ও শিশুরাও কম বড় ভূমিকা নেয় না। সাধারণতঃ কর্ত্তা বা স্বামীর এক হাতে জ্বলন্ত মশাল, অন্য হাতে বর্শা বা সরু ছুরি। মশাল হাতে আস্তে আস্তে জলের মধ্যে সে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলে আর আলোতে আকৃষ্ট হয়ে মাছেরা ছুটে আসে। মাছ কাছে এলে সে বর্শা বিদ্ধ করে মাছ ওঠায়। তার ঠিক পেছনে থাকে একজন স্ত্রীলোক, তাঁর কাঁধের উপর আর একটি বাড়তি মশাল। আলো নিভে গেলেতো চলবে না, তাই জ্বলে-যাওয়া মশাল সে বদলে বদলে দেয়। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে শিশুরা, তাদের হাতে থাকে

ঝুড়ি বা থলি। তারা তাতে মাছগুলি ভরে। কখনো-বা বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষে, সারা রাত ধরে এমনি মাছ ধরা চলে। জাঁকজমক ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য। জোয়ার এলাকা ও সংলগ্ন তীরভূমি নানা রকম মশালের আভায় রঞ্জিত, সেখানে ছোট ছোট দলে নিকোবরীরা কালো কালো ছায়ামূর্তির মত দাঁড়িয়ে যেন মিশে যায় বিস্তৃত আঁধারের সঙ্গে। ভয়াল কালো জল মশালের তীক্ষ্ণ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেন জীবন্ত হয়ে এগিয়ে আসে।

মাছ ধরার আগে মাঝে মাঝে কিনায়া গাছের বীজ ফেলা হয়। ছড়িয়ে দেওয়া চূর্ণ বীজ খেলে মাছেদের মধ্যে মাদকতার ভাব আসে। তারা তখন সহজেই ফাঁদে বা জালে ধরা পড়ে।

নিকোবরীদের সমস্ত মাছ ধরার পদ্ধতিই আদিম। ফলে মাছও খুব কম ধরা পড়ে। লোকেরা বিশেষ করে, কর নিকোবরের লোকেরা নিজেদের জন্যই খুব বেশী মাছ পায় না। যখন কেউ একটু বেশি মাছ ধরতে পারে, তার পরিবার ছু'একদিন খেয়েও যদি কিছু বেঁচে যায়, সে বাড়তি মাছ বিক্রী না করে আগুনের কম আঁচে তারা শুকিয়ে নেয়। ছু-এক সপ্তাহ সঞ্চয় করে রাখে, কারণ টাটকা মাছ পরিবারের কেউ যদি ধরতে না পারে তবে তারা এই শুঁটকি মাছ খায়। তাই মূল ভূখণ্ড থেকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এসে মাছ ধরতে পারবে বলে যারা আশা করে তারা ভয়ানক নিরাশ হয়। অনেক পয়সা দিলেও নিকোবরীরা তাদের মাছ কিছুতেই ছাড়তে চায় না।

নিকোবরীরা মাছ যে কত ভালবাসে এবং মাছের অভাব যে কত বেশি তা বেশ বোঝা যায় যখন তারা মাঝে মাঝে ট্রেডিং কোম্পানির দোকান থেকে টিনের মাছ কেনে।

নিকোবরী এবং অন্যদের জন্য প্রচুর পরিমাণে মাছ না পাবার ব্যাপারটা খুবই ছুর্ভাগ্যজনক কারণ নিকোবরের জলে ভরা মাছ। আর একথাটাও ঠিক যে, মাছ ধরার জুতসই পদ্ধতি হলে লোকে প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরতে পারে। বস্তুতঃ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল

পর্য্যন্ত মাছ ধরার অনুকুল মরশুমে নিকোবরের জলে মাছের প্রাচুর্য বিদেশী মৎস্য শিকারীদের আকর্ষণ করে।

মাঝে মাঝে এদের ডিঙ্গি আমাদের দেশের জলের এলাকার মধ্যে এসে যায় ও ধরা পড়ে। অধিকাংশ ধৃত নৌকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এতে আরো বেশি করে বোঝা যায় যে, মাছ ধরার উৎকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করলে নিকোবরীদের মাছের কোন অভাব হবে না। সেইজন্য সরকার নিকোবরীদের মাছ ধরার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি শিক্ষা দেবার এবং নিকোবরের সমুদ্রে গভীর জলে মাছ ধরার জন্য যন্ত্রচালিত নৌকা প্রচলনের পরিকল্পনা করেছেন। আশা করা যায়; কয়েক বছরের মধ্যে শুধু যে নিকোবরীরাই প্রচুর মাছ নিজেদের জন্য পাবে তাই নয়, মাছের একটা বড় অংশ মূল ভূখণ্ডে অনেক ক্ষুধার্ত মুখের জন্য পাঠানোও সম্ভবপর হবে।

অষ্টম অধ্যায়

অর্থনীতি

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। নারকেল বাগানের ও অন্য বাগানের চাষ, বন এবং পশুসম্পদ, মাছ ধরার উপর লোকেরা সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শ্রমশিল্প বলতে কিছু নেই। হাতের কাজের কয়েকটি নমুনাকে সুসংহত কুটির শিল্প বলে তো ধরা যায় না।

আদিবাসীদের আয় সম্পর্কে কোন ধারণা করা শক্ত, কারণ নিকোবরীদের প্রয়োজনীয় জিনিষের অধিকাংশই তারা নিজেদের ক্ষেতে ফলায় অথবা বনাঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে। এই সব বস্তুর মূল্যায়ন ঠিক টাকার হিসাবে করা চলে না। দৈনন্দিন জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বাইরে থেকে নিতে হয়, তার জন্য তারা নারকেলের শুকনো শাঁস এবং সুপারী সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে প্রাইমারি কো-অপারেটিভ কোম্পানিতে বিক্রি করে। তাতে যা পায় তাই দিয়ে তারা নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র খরিদ করে। তবে একটি পরিবারের নগদ আয় দিয়ে তাদের সমগ্র পরিবারের আয়ের নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব নয়। কারণ নিজেদের উৎপাদিত নানা দ্রব্য ব্যবহার করার ফলে ওরা আয় করার অনেক বেশি সুখ-সুবিধা ভোগ করে। নিকোবরীদের আয়ের পরিমাপ করার কোন সঠিক উপায় নেই। এই সম্পর্কে কোন হিসাব নিতে হলে ওদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত সব দ্রব্যের মূল্যও সেই হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে।

ওরা সম্বৎসরে যেসব নারকেল নিজেরা খেয়ে, শূকরদের ও অন্য পশুদের খাইয়ে সাবাড় করে দেয় তার একটা আন্দাজ যদি করা সম্ভব হত, তাহলে ওদের প্রকৃত আয়ের কিছুটা ধারণা করা যেত। যদি ওগুলো সব এভাবে খরচ না হত, তবে শুকনো শাঁস তৈরী করে

ওরা বিক্রী করতে পারতো। মোটামুটিভাবে ওখানে উৎপন্ন প্রতি তিনটি নারকেলের মধ্যে একটি ওরা নিজেরা খায়, একটি পশুকে দেয়, অবশিষ্ট একটি থাকে শুকনো শাঁস তৈরীর জন্য।

দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে প্রতি বছর শুকনো শাঁসের উৎপাদন আলাদা হয়। অবশ্য যদি সমস্ত নারকেলের শুকনো শাঁস তৈরী করত তাহলে শাঁস বিক্রী থেকে ওরা বর্ত্তমান আয়ের তিনগুণ বেশি রোজগার করতে পারত। এইভাবে হিসাব করলে কর নিকোবরে নারকেল সুপারি থেকে গড়ে মাথা পিছু বাৎসরিক আয় তিনশত টাকা হয়। এর সঙ্গে মোটামুটিভাবে আরো তিন শ' টাকা যোগ করা যায়, কারণ ওদের ক্ষেত-খামারে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টি আলু, কলা, পেঁপে, পাঞ্চনাস এবং অন্যান্য ফল সব্জি উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের মাছ, শূকর ও অন্যান্য পশু, যা ওরা এক একজন খায়—সেই সবের দামও তো হিসেবের মধ্যে ধরা উচিত। গৃহস্থালীর নানা উপকরণ, যা এখন সে যৌথ পরিবারে এমনিতেই পেয়ে যাচ্ছে, তা যদি ক্রয় করতে হত তাহলে ব্যক্তিগতভাবে পয়সা খরচ করতে হত। এই হিসাব কতদূর সত্য সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার উপায় নেই, তবে এটা বলা বোধ হয় ভুল নয় যে, ভারতের মূল ভূখণ্ডের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে কর নিকোবরের মাথা পিছু বাৎসরিক আয় গড়ে ছশো টাকার মত। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপে পড়পড়তা বার্ষিক আয় বেশ কিছুটা কম। চাওড়ার লোকেদের খুব অল্প জমি কর নিকোবরের চেয়ে এখানে ঘন বসতি। শুকনো শাঁস তৈরীর জন্য ওদের উদ্বৃত্ত নারকেল থাকে না। অল্প দিনের জন্য তারা অন্য দ্বীপে গিয়ে মজুরি খাটে এবং ডোঙ্গা ও মাটির বাসন বিক্রী করে জীবিকা অর্জ্জন করে। তাদের বার্ষিক আয় গড়ে হয়ত চারশো টাকার মত। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বাকি দ্বীপের জনসংখ্যা স্বল্প এবং জমি প্রচুর। কর নিকোবরের লোকেদের চেয়ে এখানকার লোকেদের স্বচ্ছল অবস্থা। তাদের গড়পড়তা বার্ষিক আয় প্রায় সাতশো পঞ্চাশ টাকার মত।

লোকের খরচও আয়ের প্রায় সমান সমান বলা চলে। এমনিতেই লোকে যে সব স্থানীয় জিনিস ব্যবহার করে তাদের দামও উপরক্ত আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। তাছাড়া নারকেলের শাঁস আর সুপারি বেচে লোকেরা যে পয়সা পায়, তা চাল, টিনের খাবার, সিগ্রেট, চা, চিনি, কাপড়, ছুরি, বাসন, পায়ের জুতো, প্রসাধন দ্রব্য এই সব জিনিস কিনতেই খরচ হয়ে যায়। লোকেরা আগে ঠিক করে নেয় তারা কি কি প্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে। যতটা সুপারি ও নারকেলের শুকনো শাঁস তৈরী করলে ও সব জিনিস কেনার মত যথেষ্ট পয়সা আসবে ততটাই ওরা উৎপাদন করে।

নিকোবরীদের একেবারেই সঞ্চয়ের অভ্যেস নেই। এমনকি ওদের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী লোকেদের হাতেও নগদ পয়সা বড় একটা নেই। অন্যদিকে (অতীতে ব্যবসায়ীদের শোষণ নীতির ফলে ওরা সর্বদা গুরুতর ঋণ ভারে ভারাক্রান্ত থাকতো এবং সেই তিক্ত স্মৃতির জন্যই বোধ হয়) নিকোবরীরা ঋণ গ্রহণ করতে চায় না।

ওদের কাছ থেকে কো-অপারেটিভ সোসাইটি যখন নারকেলের শাঁস আর সুপারি কেনে, তখন বাধ্যতামূলক ভাবে ওদের আয়ের কিছুটা কেটে জমা করে রাখা হয়। এছাড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং ট্রেডিং কোম্পানির লভ্যাংশ যা রিজার্ভ ফাণ্ড, ওয়েল-ফেয়ার ফাণ্ড, ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদিতে জমা করে রাখা হয়—সেটাই হলো নিকোবরীদের একমাত্র সঞ্চয়। এ টাকা অবশ্য খুবই সামান্য। সাধারণতঃ ট্রেডিং কোম্পানিগুলিতে এ টাকা আবার জমা হয়ে যায়। অনেক বছরে অবশ্য রিজার্ভ, ডেভেলপমেণ্ট এবং ওয়েল ফেয়ার ফাণ্ডে কয়েক লাখ টাকা জমা হয়েছে। কিন্তু গাঁয়ের মোড়লদের সভায় এ বিষয় এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সমস্ত সমাজের কল্যাণের স্বার্থে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া লোকেরা টাকা তোলে না।

এটাও লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মাথা পিছু বার্ষিক

আয় সমস্ত দেশের বার্ষিক গড়পড়তা আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৬৪-৬৫ তে প্রায় ৪২১ টাকা ছিল। বস্তুতঃ ভারতের মূল ভূখণ্ডের লোকের চেয়ে প্রত্যেক নিকোবরীর অনেক বেশি স্বচ্ছল অবস্থা। তারা প্রচুর খাদ্য পায়, মোটামুটি বেশ ভাল ঘরে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের সামান্য কয়েকটি জিনিস এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য যা তাদের প্রয়োজন তাও সব পেয়ে যায়। সৌভাগ্যবশতঃ নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অনাহার, চরম দারিদ্র এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যাধি নেই বললেই চলে।

অন্য সব সমাজের মতই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কিছু লোকের অবস্থা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশী সচ্ছল। তবু ধনী ও দারিদ্রের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান নেই। খাদ্যবস্ত্র সবার প্রায় একই। সামাজিক জীবনেও গরীব ও বড়লোকের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। পল্লী অনুষ্ঠানে সবার অংশ নেবার সমান অধিকার। নারকেল ও অন্যান্য ফলের বাগিচা যার বেশি, যে অধিক সংখ্যক শূকরের মালিক, যার উত্তম বাসগৃহ এবং বাইচের নৌকা থাকে, সে ধনী বলে পরিচিত। আগেই বলা হয়েছে অনেক শূকরের মালিক হওয়াই সম্পদের সবচেয়ে বড় চিহ্ন। সব কিছুর ওপরে যদি কারুর অনেক শূকর থাকে তাহলে তাকে বিত্তশালী বলে। তবে উৎকৃষ্ট গৃহ, অধিক সংখ্যক নৌকা ও শূকরের মালিকানা, সামাজিক মর্য্যাদা—ওদের সমাজে এ সবের ওপর খুব বেশি নজর দেওয়া হয় না। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তথাকথিত ধনী ব্যক্তিরা গরীব লোকেদের চেয়ে বিশেষ কোন সুবিধা ভোগ করে না।

তাছাড়া কয়েক বছরের মধ্যেই গরীবদেরও বড়লোক হবার সুযোগ আছে। জন্মালগ্নে অসম আয় নিয়ে কারুর জীবন সুরু করলেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। নতুন ক্ষেত-আবাদ করার জমি সহজলভ্য। কোন ব্যক্তি যদি তার পরিবারের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করে, যদি ক্ষেত-আবাদ মন দিয়ে করে, উৎকৃষ্ট নারকেলের শুকনো শাঁস তৈরী করে এবং মিতব্যয়ী হয়ে চলে তাহলে সে

সহজেই ধনী হয়ে উঠতে পারে। বস্তুত অন্য জায়গার মত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ব্যবধানটা অতটা উল্লেখযোগ্য নয়, কারণ তাদের মধ্যে বৈষম্য নেই বললেই চলে, আর সবচেয়ে বড় কথা এ ব্যবধান চাইলেই দূর করা যায়। সেখানে চিরকাল কেউ যেমন সুখ ভোগ করতে পারে না, তেমনি কাউকে চিরকাল অসুবিধা ভোগ করতে হয় না।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য দুটোই বহুদিন ধরে চালু আছে। অবশ্য নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে চিরাচরিত দ্রব্য বিনিময়েই আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সীমাবদ্ধ। ডোঙ্গা ও মাটির বাসন চাওড়া থেকে কেনা হয়, নৌকা কেনা হয় কোন্দুল থেকে। বিনিময়ে পাওয়া যায় চা, ভাল কাপড়, ছুরি, তামাক, শূকর ইত্যাদি।

দ্বীপগুলির নিজেদের মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের রেওয়াজ নেই কারণ জিনিসপত্র উৎপন্ন করার ব্যাপারে প্রত্যেকটি গ্রামই স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এরকম কোনও বাজারও নেই যেখানে তাজা জিনিসপত্র যেমন সব্জি, মাছ ইত্যাদি বিক্রী হয়। স্থানীয় বাজারের অভাবে নিকোবরীদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু সরকারী কর্মচারী এবং অন্য বহিরাগতদের খুবই অসুবিধা হয়। তাদের স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে তাজা জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে প্রচুর বাক্যব্যয় ও যথেষ্ট চেষ্টা-চরিত্র করতে হয়। নিকোবরীদের টাকার হিসেবে জিনিস-পত্রের দামদস্তুর করার ব্যাপারে কোন ধারণা না থাকায় তারা দামও উল্টোপাল্টা চেয়ে বসে। মূল ভূখণ্ডের শ্রমিক ও যাদের সঙ্গে ওদের নিকট সম্পর্ক আছে তারা খুব সস্তা দামে টাটকা জিনিসপত্র পেয়ে যেতে পারে (এক বাণ্ডিল বিড়ি বা কোন সুলভ সৌখিন জিনিসের বিনিময়ে) অথচ অন্যদের হয়ত ওই জিনিসের জন্য মূল ভূখণ্ডের তুলনায় তিন গুণ বেশী দাম দিতে হয়।

কর নিকোবরে শুধু নির্দিষ্ট গীর্জ্জার দিনে স্থানীয় জিনিসপত্র কেনা বেচার জন্য বাজার বসে। তখন নানা জিনিস কেনার জন্য ভীড়

জমে ওঠে, হুড়োহুড়ি পড়ে যায়, প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চার্চ্চের ফাণ্ডে মোটা পয়সা জমা হয়।

তাছাড়া এখন কর নিকোবরে কো-অপারেটিভ ক্যান্টিনে এবং বড় লাপাটি গ্রামে প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক বাজারে লোকেদের স্থানীয় জিনিসপত্র বিক্রী করতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। সরকারী কর্মচারী এবং মূল ভূখণ্ডের অন্যান্য লোকের টাটকা জিনিসপত্র পাবার যে অসুবিধা ছিল এইসব উপায়ে তা কতকটা দূর হলেও সমস্যাটার পুরোপুরি সমাধান হয়নি। তার একটা কারণ এই যে, চাহিদা অনুপাতে বাজারে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ কম। অন্য কারণ নিকোবরীদের আয়লিপ্সা নেই বলে ক্যান্টিনে ও সাপ্তাহিক বাজারে তারা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে যেতে ততটা উৎসাহী নয়।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ তুলনামূলক বিচারে অনেক বেশি। মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের বাণিজ্যের লেনদেনের পথে এই দ্বীপগুলি অবস্থিত বলে সুপ্রাচীন কাল থেকেই জাহাজগুলি এখানে এসে ভিড়তো। ব্যাপারীরা ভোগ্যপণ্যের বিনিময়ে নারকেল সুপারি নিতে আসতো।

বৃটিশের শাসনকালে বাণিজ্যিক লেনদেন বৃদ্ধি পায়। সে সময় এখানে ভারতের মূল ভূখণ্ড এবং বর্মা থেকে অনেক ব্যবসায়ী এসে দোকান খুলে বসে। এই ব্যাপারীরা নারকেলের শুকনো শাঁস ও সুপারি সোজাসুজি নিকোবরী পরিবার থেকে কিনে নিয়ে বিনিময়ে তাদের নানা পণ্যদ্রব্য দিত। পণ্য বিনিময় ব্যবস্থাই এই বাণিজ্যের ভিত্তি ছিল। কোন নিকোবরীর কিছু জিনিসপত্র ক্রয় করার প্রয়োজন হলে সে ব্যবসায়ীর কাছে চলে যেত এবং নারকেল ও সুপারি দেবার প্রতিশ্রুতি দিত। ব্যবসায়ী লেনদেনের তাৎপর্য বোঝাতে তাকে একটি দাগ-দেওয়া লাঠি দিত। প্রত্যেক দাগের অর্থ এক হাজার সুপারি। ব্যবসায়ী তখন নিজের লোক দিয়ে গাছ থেকে সুপারি পাড়িয়ে নিত। লাঠির দাগ হয় মুছে ফেলত, না হয়,

নারকেল সুপারি যতটা পাওয়া গেল সেই অনুসারে লাঠিটার দাগ দেওয়া অংশ কেটে ফেলা হত। কিন্তু এই সব লেনদেনে নিকোবরীদের কখনো লাভ হত না। বাইরে থেকে আনা জিনিসপত্রের দাম সম্পর্কে ওদের কোন ধারণা ছিল না বলে অনেক সময় ব্যবসায়ীরা বিক্রীত দ্রব্যের দামের চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেশি নারকেল নিয়ে নিত। তাছাড়া নিকোবরীরা নিজেরা বড় একটা নারকেল পাড়ত না। ব্যবসায়ীরা অতিরিক্ত নারকেল নিয়ে নিচ্ছে কিনা তা বোঝার কোন উপায় ছিল না। নিকোবরীদের কাছে লেনদেনের সংজ্ঞাসূচক লাঠি ছাড়া আর কোন দলিলপত্র থাকতো না। যদিও কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নারকেল দিতে অস্বীকার করায় কোন বাধা ছিল না, কিন্তু তারা এত সৎ ছিল যে, তারা কখনও তা করত না ; বরং ব্যবসায়ীদের অসাধুতার জন্য একই ঋণ দু'বার করে শোধ দিত। এইভাবে ব্যবসায়ীরা প্রচুর লাভ করেছে আর নিকোবরীরা সর্বদা ঋণভারে ভারাক্রান্ত থেকেছে। ওরা এত গরীব ছিল যে ওদের মধ্যে অনেকে হয়ত নিজেদের সামান্য পরার কাপড়টুকু পর্য্যন্ত কিনতে পারত না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার আগে পর্য্যন্ত বৃটিশ সরকার নিকোবরীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন নীতিই অবলম্বন করে নি। মহাযুদ্ধ সুরু হবার আগে মহাজনদের কাছে ওদের ঋণ সরকারীভাবে মকুব করা হয়। জাপানী অধিকারের সময়ে অনেক মহাজন দ্বীপপুঞ্জ থেকে পালিয়ে যায়। যারা থেকে যায়, তারা নিজেদের ষড়যন্ত্র আর শয়তানীর জন্য জাপানীদের হাতে নিহত হয়।

স্বাধীনতার পর মহাজনরা যাতে নিকোবরীদের ওপর আর শোষণ নীতি চালাতে না পারে সে ব্যাপারে সরকার সতর্ক দৃষ্টি দিলেন। এই জন্য এই সব দ্বীপে বাণিজ্যের অনুমতি শুধু একটি ফার্মকেই দেওয়া হল। নিকোবরীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কিন্তু এই চুক্তিতে কিছু কিছু সর্ত রাখা হল।

সরকার সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

যুদ্ধের পর প্রধানতঃ বিশপ রিচার্ডসনের চেষ্টার জন্যই সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৪৮ সালের পর থেকে নিকোবর দ্বীপ-পুঞ্জের চোদ্দটি গ্রামে 'পানম হিনেনগোজ' বলে প্রাথমিক সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি বা প্রাথমিক সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হয়। পণ্য বিনিময় ব্যবস্থা উঠিয়ে দেওয়া হল। সরাসরি লোকের কাছ থেকে নারকেল, সুপরি কিনতে ট্রেডিং কোম্পানিগুলিকে নিষেধ করা হল। সমবায় সমিতি থেকে তাদের একটা নির্দিষ্ট মূল্যে কিনতে হত। কর নিকোবরের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপের প্রধান প্রধান গ্রামেও প্রাথমিক সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি স্থাপিত হল। ১৯৫১ সালে এই সমিতি স্থাপনার কাজ শেষ হল।

১৯৫৬ সালে আন্দামান নিকোবর আইল্যাণ্ড রেগুলেশন্স (আদিবাসি সংরক্ষণ আইন) পাশ হল। এই আইন অনুসারে এই সব দ্বীপে নিকোবরী ছাড়া অন্য লোকের ব্যবসা করার ব্যাপারে আরো কঠোর নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা চালু করা হল। এখন চীফ কমিশনারের অনুমতি না নিয়ে এবং অনুমতি পত্রের চুক্তি পালন না করে কোন বহিরাগত এখানে এসে ব্যবসা করতে পারে না।

১৯৫৬ সালের ১লা জানুয়ারী পুরাতন ফার্ম 'আর আখুজি জাতবেট' কোম্পানির বাণিজ্যিক অধিকার রদ করে দেবার পর সমবায় আন্দোলন আরো এগিয়ে গেল। কর নিকোবরে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নিকোবরী এবং কোম্পানির মালিক, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে 'কর নিকোবর টেডিং কোম্পানি' নামে একটি নতুন কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হল। এই কোম্পানির সাত লাখ টাকার শেয়ারের মূলধন ছিল; তার মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ছিল পুরাতন ট্রেডিং ফার্ম 'আর আখুজি জাতবেট' কোম্পানির মালিক আখুজিদের। বাকি পঞ্চাশ ভাগ রইলো নিকোবরীদের হাতে, তাদের তরফ থেকে শেয়ার কিনলো—গাঁয়ের প্রাথমিক মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি। ১৯৫৮ সালে অন্যান্য দ্বীপেও

নান কাউরি ট্রেডিং কোম্পানি নামে এই রকম নতুন কোম্পানি স্থাপিত হল। তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অংশ আখুজিদের, বাকি পঞ্চাশ ভাগ অংশ নিকোবরীদের কো-অপারেটিভ সোসাইটির হাতে।

নিকোবরে এই রকম বাণিজ্য রীতি এখনো চালু আছে। এই দুটি ট্রেডিং কোম্পানি একটি বোর্ড অথবা ডিরেক্টরদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই বোর্ডে নিকোবরীরাও সংযুক্ত আছে। কর নিকোবরের ট্রেডিং কোম্পানির একজন পরিচালক হলেন বিশপ রিচার্ডসন ; নান কাউরির সর্দ্দারনী রাণী লক্ষ্মী, নান কাউরি ট্রেডিং কোম্পানির একজন পরিচালিকা। কেবল এই দুইটি কোম্পানিই নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। সরকারের নির্দ্ধারিত দামে তারা গ্রামের সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি থেকে নারকেলের শাঁস ও সুপারি কেনে। তাদের এজেন্সির মারফৎ জাহাজে করে বাজারে বিক্রির জন্য ভারতের মূল ভূখণ্ডে পাঠিয়ে দেয়। তাছাড়া তারা মূল ভূখণ্ড ও পোর্টব্লেয়ার থেকে নানা পণ্য দ্রব্য কেনে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তাদের শাখা দোকানের মাধ্যমে বিক্রি করে।

চুকচুকিয়া গ্রামে কর নিকোবর ট্রেডিং কোম্পানির হেড কোয়ার্টার। মালাক্কা, চুকচুকিয়া কাকানা, আরঙ, সাবাই এবং কিনমাই গ্রামে। এদের ছয়টি শাখা দোকান আছে। নান কাউরি ট্রেডিং কোম্পানির হেড কোয়ার্টার নান কাউরি দ্বীপে চাম্পিন গ্রামে অবস্থিত। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য গ্রামে এই কোম্পানির সতেরটি শাখা দোকান আছে। নারকেলের শাঁস ও সুপারি পাওয়া যায় কিনা এবং অন্যান্য পণ্য দ্রব্যের চাহিদা কি রকম, তা দেখেই এগুলি সেখানে স্থাপিত হয়েছে। কাচালে ও টেরাসায় পাঁচটা, কামোরটাতে চারটে, নান কাউরি, পুল্লোমিল্লো এবং কোন্দুলে একটা করে দোকান আছে। সমস্ত শাখা দোকান নানা পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। নানা দরকারী ও দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রই শুধু নয়, নানা রকম সৌখীন দ্রব্যও এইসব দোকানে পাওয়া

যায়। ভোগ্যপণ্যের দাম বেঁধে দেন আন্দামান ও নিকোবর সরকার। মূল ভূখণ্ড থেকে আনা ভোগ্যপণ্যের পাইকারী দামের উপরে শতকরা পঁচিশ ভাগ মুনাফা করার অনুমতি দেওয়া হয়। পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদি যেসব জিনিস সহজে নষ্ট হয়ে যায়, তার উপর শতকরা চল্লিশ ভাগ মুনাফা করা চলে। পোর্টব্লেয়ার থেকে জিনিসপত্র কিনে কর নিকোবরে বিক্রী করলে শতকরা ৯৳ ভাগ লাভ করা যায়। গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত এই দাম খুবই ন্যায়সঙ্গত। জাহাজের খরচ, মাল খালাস করে নিয়ে আসার খরচ সব হিসাবের মধ্যে ধরে এই দাম নির্দ্ধারিত হয়েছে। এখন দ্বীপবাসীরা ভোগ্য-পণ্য যে দামে কিনতে পারে, তা ওদের ক্ষমতার বাইরে নয়।

বাৎসরিক লাইসেন্স ফী ছাড়াও আন্দামান ও নিকোবর আয়ল্যাণ্ড রেগুলেশন্স (আদিবাসী সংরক্ষণ আইন) অনুযায়ী ট্রেডিং কোম্পানিগুলিকে নারকেল ও সুপারি রপ্তানি করার জন্য রয়ালটি দিতে হয়। এক কিলোগ্রাম নারকেলের শুকনো শাঁসের জন্য ০·১৫ পয়সা এবং এক কিলোগ্রাম সুপারির জন্য ০·৩৮ পয়সা শুল্ক দিতে হয়। ১৯৬১ সালে এই সব দ্বীপ থেকে মোট যে শুল্ক আদায় করা হয়েছিলো, তার পরিমাণ হলো ৩,৪৯,৬৮০ টাকা। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কারুর জমির জন্য খাজনা, অন্য কোন কর বা আয়কর দিতে হয় না। এই সব দ্বীপে শুধু এই রয়ালটি থেকেই সরকারের যা আয় হয়। শাসন, উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম এবং আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য সরকারের যা খরচপত্র হয়, সে তুলনায় এই আয়ের পরিমাণ খুবই কম।

নিকোবরে ব্যবসা-বাণিজ্য এখন বেশ সুষ্ঠুভাবে চলছে। নিকোবরের বাণিজ্য থেকে যা মুনাফা হয়, তা যাতে নিকোবরীদেরই হাতে থাকে সে বিষয়ে সরকার খুবই সচেষ্ট। সেইজন্য সরকার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে বাণিজ্য নেবার জন্য লোকেদের উৎসাহ দিচ্ছেন। নিকোবরী বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ রূপ কি রকম দাঁড়াবে, তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে না, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে

বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ধারা বেশ জটিল। ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে তুলতে যে বুদ্ধির দরকার লাগে, যে পরিচালন ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তা যদি নিকোবরীরা আয়ত্ত করতে পারে, প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক পদগুলি পূর্ণ করার জন্য যদি যথেষ্ট সংখ্যক সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত যুবক পাওয়া যায়, মালপত্র আমদানি-রপ্তানির জন্য তাদের নিজেদের হাতে জাহাজের সুবিধা থাকে, তবে তারা বেশ সুষ্ঠুভাবে নিজেরাই ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারবে। ট্রেডিং কোম্পানির হাত থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব নিয়ে নেবার জন্য কর নিকোবরে নিকোবরীরাই একটা কোম্পানি গঠন করেছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে নিকোবরীরা নিজেদের হাতে বাণিজ্যের দায়িত্ব নিতে পারবে এবং তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণতা লাভ করবে, এটা ন্যায়সঙ্গতভাবেই আশা করা যায়।

বাণিজ্যিক সংস্থার সুষ্ঠু কার্য্যকলাপের ওপরে নির্ভর করছে নিকোবরীদের বাণিজ্য স্বার্থ। একটার সঙ্গে অন্যটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাছাড়া গ্রামের সমবায় ক্রয়-বিক্রয় সমিতিগুলির যথাযথ পরিচালনার ওপরেও অনেক কিছু নির্ভর করছে। এখনও পর্য্যন্ত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সব সমিতিগুলির কাজকর্ম বেশ ভালভাবে চলেছে। গাঁয়ের সব পরিবারের কর্ত্তারাই সমবায় সমিতির সভ্য এবং এরা সবাই এর শেয়ারের অংশীদার। গাঁয়ের মোড়ল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। আভ্যন্তরীণ পরিচালনার জন্য একটি ম্যানেজিং কমিটি তাকে সাহায্য করে। প্রত্যেক সোসাইটির কাজকর্ম দেখা এবং প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র রাখার জন্য বেতনভুক সেলস্ম্যান আছে।

নিকোবরী ব্যতীত অন্য লোকের কাছ থেকে নারকেলের শাঁস ও সুপুরি কেনার সময় প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি সরকার নির্দ্ধারিত দামের চেয়ে নারকেলের শাঁস প্রতি কিলোগ্রামে পাঁচ পয়সা ও সুপারিতে প্রতি কিলোগ্রামে দশ পয়সা কম দাম দেয়। তারা ট্রেডিং কোম্পানিকে সরকার নির্দ্ধারিত সর্বনিম্ন দরে অর্থাৎ

নারকেল কিলো-প্রতি ৭০ পয়সা এবং সুপারি ২ টাকা ২০ পয়সা দরে বিক্রী করে। সোসাইটিগুলি এই হিসেব অনুসারে নারকেলের দামে প্রতি কিলোতে পাঁচ পয়সা, সুপারিতে প্রতি কিলোতে দশ পয়সা লাভ করে। এই মুনাফা থেকেই কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি কর নিকোবর ও নান কাউরি ট্রেডিং কোম্পানি স্থাপনার সময়ে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শেয়ার ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছিল।

কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি ছাড়া নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ, কর নিকোবরে কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন এবং সাবান তৈরীর সোসাইটি স্থাপন।

নিকোবরীরা নিজেরা পরিশ্রম করে এবং নিজেদের মধ্য থেকে ১৫,০০০ টাকা তুলে দ্বীপের হেড কোয়ার্টার এলাকায় কো-অপারেটিভ ক্যান্টিনের জন্য একটি সুন্দর পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছে। ১৯৬৫ সালে স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাজ্য মন্ত্রী জয় সুখলাল হাতী এই ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেন। চা, জল-খাবার, এটা-ওটা জিনিস এবং যদি পাওয়া যায় তাহলে তাজা সব্জি, ফল, মাংস, মুরগী, ডিম, নারকেল তেল ইত্যাদি ন্যায্য দামে বিক্রী হয়। একটি বেকারিও স্থাপিত হয়েছে। খুব ভাল রুটি, বিস্কুট ইত্যাদিও এতে তৈরী হয়। নিকোবরী ও সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এগুলি খুব জনপ্রিয়।

নারকেল তেল সর্ব্বদা সুলভ বলে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সাবান তৈরীর যথেষ্ট সুযোগ। তাই কর নিকোবরের গ্রাম কিনিয়ুকা গ্রামে একটি কো-অপারেটিভ সোপ-মেকিং সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। এই সোসাইটি প্রধানতঃ কাপড় কাচার সাবান তৈরী করে। এই সাবান প্রাথমিক সমবায় মার্কেটিং সোসাইটির মারফৎ গ্রামে গ্রামে বিক্রী করা হয়। খুব উৎকৃষ্ট সাবান, বাইরের সাবানের চেয়ে অনেক সস্তা; তাই এই সাবানের খুব চাহিদা। এসব দেখে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এখানে খুব বেশি পরিমাণে সাবান তৈরী হবে।

কর নিকোবরের তিনটি গাঁয়ে লোকের রুচি অনুযায়ী সস্তায়

পোষাক তৈরীর উদ্দেশ্যে কো-অপারেটিভ সেলাই ও পোষাক তৈরীর সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সমবায় আন্দোলন খুব জোরালো হয়ে উঠেছে এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে। নিকোবরীদের সামাজিক পটভূমিকায় যেখানে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা সেখানে সমবায় সংস্থাগুলি খুব ভাল চলতে বাধ্য। বস্তুতঃ নিকোবরীদের উপজাতীয় সঙ্ঘবদ্ধ জীবনধারণ সমবায় আন্দোলনের মূল ভিত্তি। তাই ব্যক্তিগত কোন কাজের চেয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার কোন প্রস্তাবে তারা অনেক বেশী সাড়া দেয়।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে, লোকেদের অদ্ভুত চরিত্র ও জীবন ধারার জন্য সমবায় সংস্থাগুলি শুধু যে ভাল চলছে তাই নয়, সমবায় আন্দোলনের প্রসার লোকের জীবনযাত্রাকে নানা দিক দিয়ে প্রভাবিত করছে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলছে।

নিকোবরীরা বোঝে ও নিজেরাই বলে যে সমবায় ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হবার আগে বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে প্রতিযোগীতার মনোভাব খুব বেশী ছিল ; জমি নিয়ে অনেক বেশী ঝগড়া-বিবাদ হত। আগে সব জরুরী বিষয়ে গাঁয়ের সব লোকের সম্মতি নেওয়া হত না বা অজ্ঞাতসারে করা হত। সমবায় সংস্থাগুলি গঠনের ফলে গ্রামের সমস্ত ক্ষমতা ও অর্থ এক অভিন্ন ভাণ্ডারে সঞ্চিত হওয়ায় গ্রামের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে ঐক্য বন্ধন আরো সুদৃঢ় হয়েছে এবং বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা পরস্পরের আরো কাছে এসেছে। বিভিন্ন পরিবার ও ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। জরুরি বিষয়ে গ্রামের সব পরিবারের সম্মতি এবং কখনো বা অন্য পল্লীর লোকের মতামতও নেওয়া হয়। যদি এই মনোভাব অব্যাহত থাকে তবে এই সব দ্বীপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসবে। প্রায় সব সমাজেই আর্থিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি পায় ; সমাজের আদিম অবস্থায় যে একতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস থাকে সেটা আস্তে আস্তে লোপ পেয়ে যায়।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অবশ্য আশা আছে যে, ব্যক্তিগত জীবনের চরম স্বাতন্ত্র্য আসবে না। ,এমনকি বর্ত্তমানের এই উপজাতীয় সমষ্টিগত জীবন যদি ভবিষ্যতে শেষও হয়ে যায়, এর জায়গায় অন্য একটা সামাজিক অবস্থা আসবে। সে সমাজে থাকবে সহযোগীতামূলক ভাবধারার প্রাধান্য এবং বহু জনহিতকর নীতির গুরুত্ব। আর সেখানে আগেরই মতই থাকবে ব্যক্তিগত জীবনের ইচ্ছা ও অনুভূতি সমষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত করার প্রবণতা ।

নবম অধ্যায়

হস্তশিল্প ও কারিগরী বিদ্যা

নিকোবরীদের হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নৈপুণ্য ও উদ্ভাবনীশক্তি আছে কিন্তু তাদের হস্তজাত শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার নমুনা দেখতে চাইলে দু'চারটের বেশী চোখে পড়ে না। প্রত্যেক সমাজে হস্তজাত শিল্পেব সঙ্গে লোকেদের জীবনধাবার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সেখানকার হস্তশিল্পের সীমিত বিকাশের এটা যেমন একটা কারণ, অন্য কারণ নিকোবরীদের সবল ও নিরলঙ্কার জীবন যাপনের ধারা। বাস্তব প্রয়োজনের জিনিস খুবই সীমিত বলেই তাদের হস্তজাত ও কারগরী শিল্প বিকাশের সুযোগও কম। তাছাড়া নিকোবরীদের মধ্যে পেশাদারী কারুশিল্পী বা কারিগর বলে কিছু নেই। সব লোকেরই একই বৃত্তি। দৈনন্দিন জীবনের প্রযোজনানুযায়ী সাধারণ মিস্ত্রী ও কারিগরের কাজ অধিকাংশ লোকই জানে। কিছু লোকের নৈপুণ্য নিঃসন্দেহে অন্যদের চেযে বেশী, প্রযোজনবোধে অন্যরা তাদের এ নৈপুণ্যের সুযোগও নেয। কিন্তু সুদক্ষ ব্যক্তিরা অপরের জন্য কাজ করে খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অতিরিক্ত কিছু পায না। বস্তুতঃ নিকোবরীদের অদ্ভুত সমাজ ব্যবস্থায প্রতিভাধর ও কর্ম-নিপুণ ব্যক্তির পক্ষে কারু ও হস্তশিল্পে সময় ও শক্তি প্রযোগ করার জন্য কোন রকম উৎসাহ দেওযা হয় না।

এদের মিস্ত্রির, কাজে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিপুণতা। এদের সমাজে যুবকেরা সবাই মোটামুটি মিস্ত্রির কাজ জানে। ছোটবেলার থেকে দেখে দেখে এবং বড়দের কাজে সাহায্য করে অল্প বয়সেই এরা একাজ শিখে নেয়। গৃহ নির্মাণে এবং ক্ষেত খামারে বেড়া দেওয়া ছাড়া নৌকো তৈরীর কাজে সুদক্ষ মিস্ত্রির নৈপুণ্য সবচেয়ে দরকার হয়।

নানা রকমের নৌকো। ডোঙ্গা খুব ছোট, তাতে দু'তিনজন

মাত্র লোক ধরে, অন্যগুলি আবার এত বড় যে তাতে চল্লিশ জনের মত লোক যেতে পারে। বড় নৌকো শুধু চাওড়া ও কোন্দুলে তৈরী হয়। মাছ ধরার এবং কাছাকাছি এলাকায় যাতায়াতের জন্য বিশ থেকে ত্রিশ ফুট লম্বা ছোট ছোট ডোঙ্গা অন্যান্য দ্বীপেও তৈরী হয়।

নৌকো তৈরী করার আগে, চার পাঁচজন লোক আভ্যন্তরীণ এলাকার জঙ্গলে গিয়ে গাছ পছন্দ করে। কুড়ুল দিয়ে গাছের গুড়ি কেটে গুড়িটাকে একটু ফাঁপা করে গাঁয়ের ভেতরে নিয়ে যায়। গ্রামের মধ্যে ধিকিধিকি আগুনে পুড়িয়ে গুড়িটাকে সম্পুর্ণ ফাঁপা করে নেয়; আগুনে গুঁড়ির ভেতরকার সব কিছু পুড়ে যায়। কুড়াল ও বাটালির সাহায্যে ফাঁপা গুঁড়িটাকে এবার নৌকোর গড়ন দেয়, তরতর ক'রে জল কাটার সুবিধের জন্য দুটি প্রান্ত একটু বাঁকা ও সরু করে নেয়। তারপর নৌকাটাকে উল্টে ফেলে তার তলাটাকে জাহাজের মত জলে ভাসার আকার দেয়।

নৌকোর বাইরের গড়ন হয়ে গেলে, বসবার জায়গা, জিনিসপত্র রাখা ও নৌকোটাকে মজবুত করতে নৌকোর মধ্যে অনেকগুলি তক্তা শক্ত ক'রে আটকে দেয়। তক্তাগুলির প্রান্তে নৌকোর কিনারার উপরের দিকে লম্বা লম্বা কাঠের ফালি বেত দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়; এতে জিনিসপত্র সহজে জলে পড়ে যাবার ভয় থাকে না।

নৌকাগুলি বেশ গভীর, মূল গুঁড়ির যা পরিধি তার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই এর মধ্যে থাকে। এই জন্য এবং প্রস্থ অনুযায়ী দৈর্ঘ্য বেশী হবার কারণে প্রত্যেক নৌকোর সঙ্গে প্রায় দশ ফুট লম্বা ও আট ইঞ্চি চওড়া একটি কাঠের কুঁদো থাকে। নৌকোর ভার-সাম্যের দিকে লক্ষ্য রেখে এই কুঁদো বেছে নেওয়া হয়। নৌকো থেকে প্রায় আট ফুট দূরে নৌকোর সমান্তরালভাবে খুব সন্তর্পণে বাঁশ দিয়ে এটাকে বেঁধে দেওয়া হয়।

কাঠের কুঁদোটা জুড়তে পেরেক ব্যবহৃত হয় না। বস্তুতঃ নৌকোয় কখনই পেরেক লাগানো হয় না। এই কুঁদো বাঁধতে এবং নৌকোর ভিতরে অন্য কোন কিছু জোড়ার কাজে লাগে গাছের

ছাল। সমুদ্রে দীর্ঘদিনের জন্য ভ্রমণে বেরুবার আগে নৌকো সংলগ্ন এই কুঁদো, বাঁশ, তক্তা ইত্যাদি সব সময় পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। যাত্রাকালে হঠাৎ প্রয়োজন দেখা দিলে যাতে সংকটে পড়তে না হয়, সেইজন্যে বাড়তি তক্তা, বেত, গাছের ছাল ইত্যাদি নৌকোর মধ্যে সব সময় মজুত করে রাখা হয়।

সাধারণতঃ নৌকো বা ডোঙ্গার বেশ ভারসাম্য থাকে এবং এটি মোটামুটি নিরাপদ যান। সমুদ্র যখন শান্ত থাকে লোকে চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল দূরে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে যায়। যতটা বিপদে ও অসুবিধার ঝুকি নিয়ে ওরা সমুদ্র পাড়ি দেয় সেই তুলনায় দুর্ঘটনা খুবই কম হয়। দুর্ঘটনা হলেও ডোঙ্গা ডোবে না। নিমজ্জমান ব্যক্তিদের উদ্ধার করে আনার আগে পর্য্যন্ত নৌকো ধরেই তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ভেসে থাকে। অনেক সময় নৌকোর পার্শ্ববর্তী কাঠের কুঁদোটি ভেঙ্গে যায় অথবা নৌকো উল্টে যায় বলেই প্রধানতঃ দুর্ঘটনা হয়। নৌকোর বাইরের দিকে, অর্থাৎ নৌকোর পাশের কুঁদোটি যেদিকে যুক্ত থাকে তার বিপরীত দিকে অতিরিক্ত ভার পড়লে তক্তাটির ভারসাম্য ব্যাহত হয়। সেইজন্য তক্তাটি নৌকোর যেদিকে থাকে সব সময়েই ওরা লোককে সেদিকে বসতে বলে, এতে নৌকোর ওজনও ভার-কেন্দ্রের মধ্যে থাকে এবং নৌকো উল্টে যাবার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

যে সব নৌকোয় বাইচ খেলা হয় সেগুলিতে একটা বিশেষ অগ্রভাগ যুক্ত থাকে। এই অগ্রভাগ উজ্জ্বল রঙে রঙীন করে নৌকোর সঙ্গে খাঁজ কেটে জুড়ে দেয়। বাইচের নৌকোর পার্শ্বদেশও নানারকম সুন্দর রঙে চিত্রিত করে।

নৌকোগুলি যখন ব্যবহার করে না তখন ঘরের ভিতর তুলে রেখে দেয়। বাইচের নৌকো আবার নারকেলের বাইল দিয়ে ঢেকে রাখে। নৌকো নিয়ে ওদের বড় গর্ব। ওরা নৌকোর খুবই যত্ন নেয়। কোন কোন নৌকো সারা গাঁয়ের—সমস্ত পল্লীবাসীর সাহায্যেই বারোয়ারী নৌকো তৈরী হয়। এগুলি বাইচ খেলার

জন্য। ওরা এ নৌকোকে পবিত্র বস্তুর মতই দেখে। মাছ ধরা বা জাহাজের জন্য মাল বোঝাই করার মত সাধারণ কাজ এতে করা হয় না। গাঁয়ের নৌকোর চারপাশে শিশুরাও ঘেঁষতে পারে না। বড়রাও বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া এর উপরে বসে না। সমুদ্রে ভাসবার দরকার না থাকলে গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধা সহকারে গাঁয়ের সমাজ-কল্যাণ ঘর 'এলপনামে'র নীচে গাঁয়ের নৌকোটিকে রেখে দেয়।

বিশেষ কোন উপলক্ষে যেমন বাইরে থেকে কোন গণমান্য ব্যক্তি এলে, ছুটি নৌকোর পার্শ্ববর্তী তক্তা সরিয়ে একটা কাঠের মঞ্চ বানিয়ে তাতে জুড়ে দেওয়া হয়। মঞ্চের চারদিকে চারটি খুঁটি বেঁধে তার উপর কচি নারকেল পাতার চাঁদোয়া লাগায়। এরকম যুগ্ম নৌকা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে আর খুব আরামদায়কও বটে। তবে ছুটি নৌকোর ভারসাম্য সর্বদা ঠিক রাখা মুশকিল। কখনো-বা ঢেউয়ে উল্টে যেতে পারে। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের তৎকালীন উপমন্ত্রী শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা কর নিকোবর পরিদর্শন করেছিলেন। তীর থেকে যুগ্ম নৌকো ক'রে জাহাজে উঠবার সময় নৌকো উল্টে যায় এবং তিনি সমুদ্রে পড়ে যান। সৌভাগ্যবশতঃ পঁচাত্তর বছর বয়স্ক বিশপ রিচার্ডসন কাছেই ছিলেন, তিনি সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে স্বরাষ্ট্র বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রী জে. এল. হাতী কর নিকোবর পরিদর্শন করতে যান। জাহাজে উঠতে রাত্রিবেলা একটি জোড়া নৌকোয় চড়ে যাবার সময় সেটি উল্টে যায়। তীরের কাছে দুর্ঘটনা ঘটে। যারা নৌকো ছেড়েছিল, তারা কয়েকজন কাছে থাকায়, ছুটে গিয়ে নৌকোটা তীরে নিয়ে আসতে পেরেছিল। তা না হলে রাত্রিবেলা যা ইচ্ছে তাই ঘটতে পারতো। যারা দুর্ঘটনার মুখে পড়ে তাদের বড় একটা সাহায্য করা যায় না। জোড়া-নৌকোর ব্যাপারে অতীতের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর হয়নি বলে অভ্যর্থনার প্রতীক এই জোড়া নৌকোর ব্যবহার এরা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। বিশিষ্ট অতিথিরা তাদের সাধারণ নৌকোতেই

ঢেউ-এর দোলা খেতে খেতে হলেও নিরাপদে পৌঁছে যাক এই তারা চায়। যুগ্ম নৌকো যত সুন্দর ও আরামদায়ক হোক না, এর বিপদের ঝুঁকি এরা আর নিতে চায় না।

দীর্ঘ যাত্রায় নৌকোয় ওরা পাল তুলে চলে। নৌকোর মাঝখানে বসার জায়গায় দুটি লম্বা খুঁটিতে ক্যানভাস বা কোন মোটা কাপড়ের তৈরী পাল খাটায়। অনুকূল হাওয়ায় পাল তোলা তরী খুব দ্রুত চলে; এমনকি ছোট ছোট মোটর লঞ্চকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে। পাল-তোলা নৌকোয় চড়ে নীল সাগরের উপর ভেসে যাওয়া রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। একদিক থেকে হাওয়া বইছে, অন্যদিকে গতির উল্লাস, মধুর চুম্বনের মত ছোট ছোট জলবিন্দু মুখে ও শরীরে ছিটকে এসে পড়ে।

আসবাবপত্র তৈরীর কাজেও ঐ একই নিপুণ মিস্ত্রির হাত। প্রত্যেক ঘরে একটি করে 'সেটি', তার কাঠামো কাঠের। ওপরটা টুকরো বাঁশের ও বেতের। আজকাল কোন কোন লোক চেয়ার ও ছোট ছোট টেবিল বানাতে সুরু করেছে। কর নিকোবরের বড় লাপাটি গ্রামে মিস্ত্রির কাজের শিক্ষা ও উৎপাদনের কেন্দ্র। কিছু কিছু লোককে আসবাবপত্র তৈরী করতে এই কেন্দ্র শিক্ষা দিচ্ছে।

মিস্ত্রির কাজের জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা হল কুঠার, বাটালি, করাত, ছিদ্র করার যন্ত্র। কোন ফুট রুলার ব্যবহৃত হয় না। হাত মেপেই বেশীর ভাগ মাপ জোকের কাজ চলে, কখনো-বা বাঁশের কঞ্চি।

গ্রামে কোন কর্ম্মকার নেই। কর্ম্মকারের জিনিসপত্র সাধারণত স্থানীয় দোকান কিংবা কর নিকোবরের বড় লাপাটি গ্রামে কুটির শিল্প বিভাগের কর্ম্মকার শিক্ষণ ও উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে কিনে আনা হয়। এই কেন্দ্রের কর্ম্মকারের কাজের শিক্ষারও সুবিধা আছে। কিন্তু এই সব দ্বীপে কর্ম্মকারের কাজ পেশা হিসেবে গ্রহণ করার সুযোগ কম বলে এদিকে লোকের তেমন কোন উৎসাহ নেই। সামান্য কিছু লোক দা বানাতে কর্ম্মকারের নৈপুণ্য প্রয়োগ

করে, আর এটা লোকের দৈনন্দিন জীবনে খুবই দরকারী জিনিস। ওরা জাপানীদের পরিত্যক্ত লোহার টুকরো বেছে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে গরম করে নেয়। তারপর বড় হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে তীক্ষ্ণ কিনারা পাথরে ঘষে দা তৈরী করে।

কর নিকোবরে প্রায় স্ত্রীলোকই সেলাই ও এম্ব্রয়ডারিতে নিপুণা। অন্যান্য দ্বীপেও মেয়েরা সেলাই-ফোঁড়াই শিখে নিচ্ছে। বিশেষত কর নিকোবর ও নান কাউরিতে সরকার পরিচালিত দুটো কেন্দ্র আছে যেখানে দর্জির কাজ, পোষাক এবং এম্ব্রয়ডারি শেখনো হয়। মেয়েদের এসব বিদ্যা শেখানোতে খুবই উপকার হচ্ছে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে পেশাদার কোন দর্জি নেই বলে মেয়েরা নিজেদের ও স্বামী-পুত্রের পোষাক তৈরী করে নেয়। সেলাই হাতে, আবার মেশিনেও করে। টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়ার এবং শিশুদের পোষাকে উজ্জ্বল রঙের সুতো দিয়ে এম্ব্রয়ডারী করে। মাঝে মাঝে মেয়েরা শিশুদের জন্য পশমও বোনে।

ক্রুচেটের কাজ এবং ব্লাউস বডিস এবং বালিশের ওয়ারের জন্য লেস বোনে।

নিকোবরীদের দুটি প্রাচীন শিল্প, ঝুড়ি ও মাদুর। অবসর সময়ে মেয়েরা এসব তৈরী করে। জঙ্গলে প্রচুর বেত। তাই দিয়ে ঝুড়ি তৈরী করে। বোঝা বওয়া, জিনিসপত্র ভরে রাখা, সব কাজই ঝুড়িতে। ঢাকনি দেওয়া বা ঢাকনি ছাড়া দুরকম ঝুড়ি তৈরী করে—এগুলি যেমন মজবুত তেমনি সুন্দর এদের গড়ন।

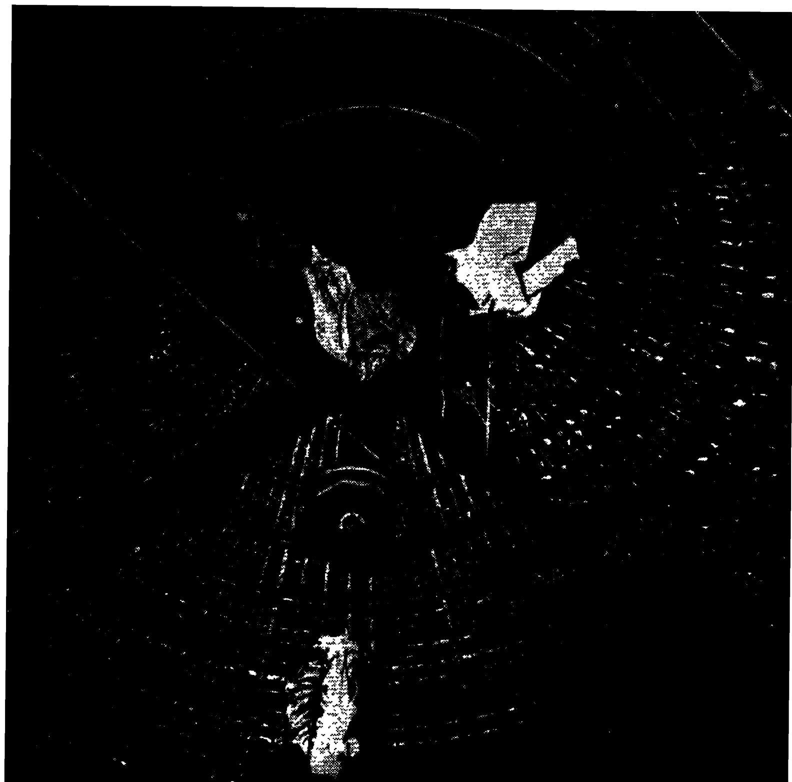
মাদুর তৈরী হয় নারকেলের বাইল ও পান্ডানাস পাতায়। নারকেলের বাইল শুকিয়ে সরু সরু লম্বা করে কেটে তা দিয়ে তৈরী হয় মাদুর। এই মাদুর যেমন শক্ত তেমন প্রায় দশ পনের বছর টেকেও। শুধু বসা বা শোয়ার জন্যই নয়, চৌকোনো ঢালু ছাদওয়ালা ঘরের দেয়াল তৈরীর জন্যও এগুলি ব্যবহৃত। একই-ভাবে তৈরী হয় পান্ডানাস পাতার মাদুর, পাতা শুকিয়ে, সরু সরু লম্বা লম্বা করে কেটে তারপর ঘন বুনোট।



চিত্র ১২। কয়েকটি মূর্তি যা কব নিকোবর ছাড়া অন্যত্র লোকেরা ভূতপ্রেত থেকে বাঁচতে ঘরে রাখে (১৩১ পাতায় দেখুন)



চিত্র ১৩। নিকোবরী ঝুড়ি এবং পান্ডানাসের মাদুর (১২৮ পাতায় দেখুন)



চিত্র ১৪। গোলাকৃতি নিকোবরী গৃহের সীলিঙ (১৩৪ পাতায় দেখুন)

নারকেলের বাইলের মাতুরের মত এগুলি অতটা টেকসই হয় না, মোটে পাঁচ সাত বছর টেকে। তবে এগুলি লোকেদের খুব পছন্দসই। মাতুরের জন্য কখনো-বা পান্ডানাসের একটু গাঢ় রঙের পাতা ব্যবহৃত হয়। এতে পাতার স্বাভাবিক সাদা রঙের পটভূমিকায় এই কৃষ্ণাভ রঙ ব্যবহার করে সুন্দর প্যাটার্ণ করা হয। এগুলির বুনট সুন্দর ও প্যাটার্ণে নূতনত্ব থাকায় বাইরের লোকেদের কাছে এগুলির খুব চাহিদা। নিকোবরীরা ভারতের মূল ভূখণ্ডে যদি এগুলি বেশী করে রপ্তানি করে তাহলে সেখানে নিশ্চয় এগুলি সমাদৃত হবে।

নারকেলের মালা ব্যবহার করে জলপাত্র হিসাবে আর তাড়ি রাখতে। নারকেল ছুলে তার মাথায় একটি ছিদ্র করে হুকের সাহায্যে ভেতরের শাঁস বার করে নেয়। তারপর বাইরেটা ছুরি দিয়ে চেঁছে চেঁছে অথবা বালু কাগজ দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে। ক্রমাগত ঘষার ফলে পাত্রটির বাইরেটা খুব মসৃণ হয়ে যায়। যখন একটি নারকেলের মালা ব্যবহার করে তখন মুখটার মাপে কাঠের একটা ঢাকনা বানায়। সাধারণত বেতের হাতল লাগিয়ে দুটো নারকেলের মালা এক সঙ্গে জুড়ে দেয়, তাতে পাত্রটি হাতে করে নিয়ে যেতে বেশ সুবিধাই হয়। ঘর সাজানর উপকরণ হিসেবে বহিরাগতদের কাছে এই নারকেল মালার তৈরী পাত্রের খুব চাহিদা।

ধনুক ওদের আর একটি হস্তশিল্পের নমুনা। এতে লাগে একটি ভারি কড়িকাঠ, চার ইঞ্চির মত চওড়া আর দু-আড়াই ফুট লম্বা। এর নীচের প্রান্ত বন্দুকের বাঁটের মত দেখতে। আধ ইঞ্চি পরিধি পাতলা ও হাল্কা কাঠের একটি ধনুকাকৃতি চাপ তৈরী করে কড়িকাঠটির দৈর্ঘ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ওপরে এঁটে দেয়। চাপের দুটি প্রান্ত তার দিয়ে যুক্ত করে। কড়িকাঠের উপরে তীর রাখার জন্যে খাঁজ কাটা থাকে; ছোট ছোট তীরগুলি যাতে জায়গা মত থাকতে পারে তারজন্য ছোট ছোট লোহার চাকতি এঁটে দেয়। এর ঠিক উপরে কড়িকাঠে একটি ছোট পেরেক থাকে। আর তার

.9

থেকে ঝুলতে থাকে ছোট একটি কাঠের টুকরো। ধনুক ব্যবহার করার সময় কড়িকাঠে জায়গা মত ঠিক একটি তীর রাখে। ধনুকের ছিলা পেছনে এমন করে টেনে ধরে যাতে ছিলা দ্বারা সংলগ্ন কাঠের টুকরোটি ঘোড়ার ওপর পড়ে থাকে এবং সংলগ্ন ছিলাটি পেরেকের সঙ্গে বেঁধে ওটাকে ঠিক জায়গা মত রাখে। ঘোড়া ছেড়ে দিলে ওটা কাঠের টুকরোটাকে গিয়ে আঘাত করে এবং টুকরোটা সরে যায়, ধনুকের ছিলা খুব টানটান থাকে বলে সামনে ঠেলে এগিয়ে এসে আবার আগের আকৃতি নেয়। তীরটার নীচের প্রান্ত টানা ছিলাটাকে ছুঁয়ে থাকে, সেটা সামনে তাড়িত হয়ে তীব্র বেগে ছুটে বেরিয়ে যায়। এই রকম ধনুক ওরা এক হাতে চালায় এবং এ দিয়ে একশ পঞ্চাশ গজ পর্য্যন্ত তীর ছোঁড়া যায়। এটার ডিজাইন অভিনব। বন্দুকের মত ঘোড়া টেপার পদ্ধতির জন্য বাইরের দর্শকদের কাছে এটা লোভনীয় হস্তশিল্পের নমুনা।

হাতের কাজের মধ্যে বোধ হয় নৌকোর মডেলের খুব চাহিদা। নরম কাঠ ছুরি দিয়ে কেটে এগুলি বানায়, লাগিয়ে দেয় কাপড়ের পাল। এই মডেলগুলির আকৃতি ঠিক নৌকোর মতই পাশে কাঠের ছোট তক্তা। উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত, দেখতে খুব সুন্দর।

কিছু কিছু লোক আংটিও বানায়। গলায় পরার ক্রুশ, চাবির চেন ইত্যাদি তৈরী করে। এছাড়া কচ্ছপের খোলে রূপা লাগিয়ে মনোহর সৌখীন জিনিস করে।

চাওড়ার একটি প্রধান হস্তশিল্প, মাটির পাত্র। ওই দ্বীপে অবশ্য ভাল মাটি নেই। আনতে হয় পাশের দ্বীপ টেরাসা থেকে। মাটি সংগ্রহ করে সাধারণতঃ মার্চ এবং এপ্রিলে অথবা নভেম্বর-ডিসেম্বরে। মাটি সংগ্রহকারীকে কৌপীন পরতে হয়। মাটি নেবার সময় ধুমপান বা বায়ু ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। ওদের বিশ্বাস তাহলে মাটি শক্ত হবে না। শুধু মেয়েরাই মাটির কাজ করে। প্রায় পাঁচ সাত ফুট কাঠের টুকরো চেঁছে ফাঁপা করে পাত্র তৈরী করে, তার মধ্যে জল মিশিয়ে মাটি রেখে দেয়। পুরনো গানি ব্যাগ চাপা দিয়ে

কয়েকদিন রেখে দেয়। তারপর তরুণী মেয়েরা চওড়া পাথরের ওপর মাটি রেখে দু-'ফুট লম্বা লোহার মুষল দিয়ে মাটি পিটিয়ে নরম করে। মাটি সম্পূর্ণ পেটান হলে তার মধ্যে কিছু বালি মিশায়। বয়স্কা কোন অভিজ্ঞা মহিলা পাত্র গড়তে সুরু করে। বেশীর ভাগ হাতেই গড়নের কাজ হয়। অথচ সব পাত্রের গড়নই এত সুন্দর হওয়া সত্যিই উল্লেখযোগ্য। গড়া হয় সব আকারের পাত্র, সাধারণতঃ বড় পাত্রগুলির কিনারা একটু বাইরের দিকে ঘোরান। যতদিন না পোড়ানর মত শক্ত হয় ততদিন পাত্রগুলি ঘরে রেখে দেয়। তারপর মাটিতে কিছু ভাঙ্গা পাত্রর উপর মাটির বাসনগুলি উল্টোমুখ করে রাখে। ওপরে ও পাশে শুকনো ডালপালা স্তূপ করে রেখে আগুন জ্বালিয়ে বাসনগুলি পোড়ায়। প্রতিটি পাত্র কতক্ষণ পোড়ান হবে আর কখন তা তৈরী হবে মেয়েরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে। তৈরী হয়ে গেলেই পাত্রটি সরিয়ে নেয়। তৈরী পাত্রগুলি মসৃণ উজ্জ্বল এবং খুব বেশি তাপ সইতে পারে। বাসনের রঙ পাটকিলে, কিন্তু সাধারণতঃ পাত্রগুলির গায়ে কচি ডাবের খোসার রস দিয়ে মোটা মোটা গাঢ় চকোলেট রঙের ডোরা কেটে দেয়।

কর নিকোবরে খুব সামান্যই চিত্রাঙ্কণ, কাঠ খোদাই, মূর্তি গড়ার কাজ হয়। নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপে কাঠের জোড়া নরনারী, পশু পাখী তৈরী করে। ভূত-প্রেত বা অশুভ আত্মার প্রভাব দূর করতেই এগুলি ঘরে রাখে। এই কাঠের মূর্তিগুলির গড়ন বেশ ভাল, গাঢ় রঙে চিত্রিত। কতকগুলির আবার মুখোসের মত ভয়াবহ মুখ, কতকগুলির আবার অর্দ্ধমানুষ অর্দ্ধ জন্তুর আকৃতি। অধিকাংশ মূর্তির মধ্যে জননেন্দ্রিয় খুব স্পষ্ট করে দেখান হয়। চেপ্টা কাঠের টুকরোর ওপর উজ্জ্বল রঙে কিছু চিত্র আঁকে, পাখী, জন্তু বা মানুষ। সেই চিত্র এঁকে ঘরে রেখে দেয়। এই মূর্তি ও চিত্রগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। এতে আমরা ওদের কল্পনাশক্তির পরিচয় পাই। কখনো-বা লোকের চাহিদা অনুসারে ওরা নিকোবরী পোষাকে বেশ সভ্য-ভব্য মূর্তি তৈরী করে দেয়। সেগুলি গৃহ সজ্জার পক্ষে খুব

সুন্দর উপকরণ। কর নিকোবরের লোকেরা অবশ্য মূর্তি গড়ে না। কিন্তু তারা কাঠের কাজে একেবারে প্রতিভাহীন নয়। মাস গ্রামে গৌরবময় সেণ্ট টমাস গীর্জ্জায় বেশ কয়েকটি কাঠের কাজ আছে, থামের উপর, মঞ্চে এবং প্রার্থনা পুস্তক রাখার স্ট্যাণ্ডে। বস্তুতঃ গীর্জ্জাটি বিশপ রিচার্ডসনের পরিকল্পনায় এবং সম্পূর্ণরূপে নিকোবরী-দের দ্বারা নির্মিত। গীর্জ্জাটির সমস্ত দিকে উৎকৃষ্ট সৌধ, নিকোবরী-দের নৈপুণ্য ও কারিগরী ক্ষমতার উৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করছে।

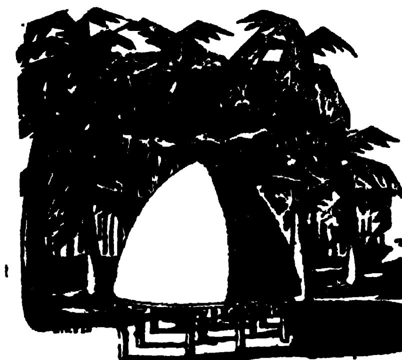
নিকোবরীদের বেশ শিল্প রুচি ও সৌন্দর্য্যবোধ আছে। ওরা ঝকঝকে রঙ পছন্দ করে। ওরা রঙের সঙ্গে রঙ ও এক রঙের সঙ্গে অন্য রঙ মিলিয়ে কাপড়-জামা পরতে ভালবাসে। ওদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় রঙ-বেরঙের জিনিসপত্র দেখতে যেমন মনোরম তেমনি এটা ওদের রুচি ও সামঞ্জস্যবোধের নিদর্শন। নারকেল ও কলাপাতার অঙ্গসজ্জার মধ্যে ওদের স্বরুচির পরিচয় মেলে। পাতা দিয়ে ওরা ক্রস, ফুল ইত্যাদি নানা নক্সা তৈরী করে। বস্তুতঃ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কর নিকোবর পরিদর্শনে গেলে, এরা এই রকমভাবে সাজায় এবং তখন সমগ্র দ্বীপটি পরীর দেশের মত দেখায়। লোকেরা নিজেদের কাজে ও হস্তশিল্পে বেশ গর্ববোধ করে। নিকোবরীদের হাতের তৈরী জিনিসপত্র পরিমাণে কম হলেও উৎকর্ষের দিক থেকে বিশিষ্টতার দাবী রাখে। হস্তশিল্পের উৎপাদন বাড়লে, যানবাহনের সুবিধা দেওয়া হলে এবং বিজ্ঞাপনের যথাযথ ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে, ভারতের মূল ভূখণ্ডে এদের উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী নিশ্চয় সমাদৃত হবে।

দশম অধ্যায়

গৃহ নির্মাণ

নিকোবরীদের ঘর-বাড়ীর নক্সা ও বিন্যাসের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। মানও উচ্চ। এটা খুব বিস্ময়কর যে সুদূর প্রাচীন-কাল থেকেই এরা চমৎকার গৃহ নির্মাণ করতে শিখেছে। সামান্য অদলবদল করলেও এরা চিরাচরিত পদ্ধতিতেই গৃহ তৈরী করে আসছে।

কর নিকোবর ও চাওড়ার গৃহগুলি দেখতে সুন্দর ও বেশ মজবুত। অন্যান্য দ্বীপে লোকেরা বড় অলস বলেই ঘরবাড়ীর দিকে তাদের এতটা নজর নেই। তাই অনেক কুদর্শন কুঁড়ে ঘর সেখানে দেখা যায়। অধিকাংশ গৃহই মাটি থেকে বেশ উঁচুতে, মাটির সমতার ছয় থেকে আট ফুট উঁচুতে শক্ত খুঁটার উপর গৃহগুলি স্থাপিত। গৃহ



নির্মাণের উপকরণ কাঠের গুঁড়ি, টিন, আরেকাপম গাছের বাইল, শন, বেত, বাঁশ, নারকেল পাতা। এ সবই পাওয়া যায় স্থানীয় জায়গায়। মোটামুটি গৃহগুলি চার রকমের—(১) গম্বুজাকৃতি গোল গৃহ, (২) মালগাড়ির মত ঢালু ছাদবিশিষ্ট গৃহ, এরও ভিত

মাটি থেকে উঁচুতে, (৩) জমি থেকে উঁচুতে তুলে ধরা হলেও উন্নত ধরনের গৃহ। (৪) পাকা বাড়ী, ভিত খুঁটির ওপরে নয়। সবচেয়ে প্রাচীন ও চিত্তাকর্ষক গৃহ গোল গম্বুজাকৃতি ঘর যা প্রকাণ্ড মৌচাকের মত দেখতে।. এই ধরণের গৃহে ছাদই দেয়াল। একটা অর্ধবৃত্তাকার উপরিভাগ গৃহের ছাদ আবার দেয়ালও বটে। এই রকম গৃহ নির্মাণের জন্য গৃহের জমির কাছে মাটিতে ছাদের কাঠামো তৈরী করা হয়। 'এরেকা আগাষ্টা' গাছের লম্বা ডাঁটা ব্যবহৃত হয়। প্রায় আঠার ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করে লম্বালম্বিভাবে স্থাপন করে চেরা বেত দিয়ে বেঁধে দেয়। গৃহের কাঠামোটা চূড়া পর্যন্ত এই রকম সমান্তরালভাবে বাঁধা। চেরা বাঁশে দিয়ে বাইরের দিকে বেঁধে কাঠামোটাকে আরো মজবুত করা হয়। চেরা বাঁশগুলি ঘনসন্নিবদ্ধ শ্রেণীতে লাগান। .ভিতরের দিকেও কাঠামোটার উপর রাটান বেতের লতানো গাছের সারি আড়াআড়ি ভাবে এঁটে দেওয়া হয়।

কাঠামো শেষ হলে ৯ ইঞ্চি থেকে এক ফুট পর্যন্ত পরিধির শক্ত কাঠের খুঁটি (যা সেখানে সুলভ) জমিতে পোতে। প্রত্যেক খুঁটি প্রায় চার ফুট করে গাড়ে। ছয় থেকে আট ফুট পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মাটির উপর থাকে। খুঁটিগুলি সমান্তরাল সারিতে পোতে। গৃহের আকার ও আয়তন অনুযায়ী খুঁটির সারির সংখ্যা নির্ভর করে। সাধারণ ঘরের মেঝেতে কুড়ি বর্গ ফুটের মত জায়গা, এবং তার জন্য তিন সারিতে পাঁচটি ক'রে পনেরটি খুঁটি সমপরিমাণ দূরত্বে গাড়া। এই খুঁটির মাথায় একটা চওড়া ও গৃহের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী লম্বা এবং তিন ইঞ্চি মোটা কাঠের বরগা লম্বালম্বি ও আড়াআড়িভাবে কাঠের বল্টুর সাহায্যে লাগান হয়। এইভাবে গড়া হয় ভিতরে চতুষ্কোণ কাঠামো। ঘরের ভিতের এই কঙ্কাল কাঠামোর উপর পৃথকভাবে নির্মিত ছাদ ও দেয়ালের কাঠামো ষাট-সত্তরজন লোকের সাহায্যে তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। ঘরের ভিতর কাঠের কড়িবরগার ও খুঁটির উপর ছাদ ও দেওয়ালের কাঠামো বেত দিয়ে মজবুত করে বেঁধে দেয়। এবার মেঝেটাকে সম্পূর্ণ করে চতুষ্কোণ কাঠামোতে

চেরা বাঁশ পরস্পরের সঙ্গে ঘন সন্নিবদ্ধ করে সাজিয়ে বেত দিয়ে কাঠামোর সঙ্গে বাঁধে। বেতের বন্ধনী দেয় আড়াআড়িভাবে। এইভাবে সম্পূর্ণ হয় মেঝে। নীচে থেকে আলো হাওয়া চলাচলের জন্য ছোট ছোট ফাঁক রাখা থাকলেও লোকজন যারা বাস করবে, তাদের জিনিসপত্রের ভার সইবার মত যথেষ্ট মজবুত করেই মেঝেটা তৈরী। সাধারণতঃ ঘরের মধ্যভাগে মেঝেতে চেরা বাঁশ না লাগিয়ে লম্বা কাঠের তক্তা এঁটে দেয়। এতে মেঝের একটা অংশে আলো বাতাসের জন্য ফাঁক থাকে না বটে, তবে ঠাণ্ডার দিনে সুবিধেও হয়। শীতের রাত্রিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়ায় চেরা বাঁশের মেঝেতে শুতে যখন খুব অসুবিধা, তখন ঘুমনোর জন্য এই একটু কবোষ্ণ জায়গা তাদের থাকে। ঘর ছাওয়া শন দিয়ে চাল তৈরী করে। ওরা ওই শনকে বলে 'আফোভ'। ঘরের কাঠামোর উপর স্তরের পর স্তর ঘাস সমান করে বিছিয়ে দেয়। তলায় কিনরাগুলি সন্তর্পণে ঠিক করে দেয় এবং সুন্দর গম্বুজাকৃতি অবয়ব নিয়ে ঘরটি তৈরী হয়। মেঝে থেকে গম্বুজ সাধারণতঃ পঁচিশ ফুট উপরে, গৃহের ভিত আবার জমি থেকে আট ফুট উঁচুতে।

গৃহে মাত্র একটিই ঘর থাকে, যদিও সেটা যথেষ্ট বড় ও প্রশস্ত। কখনও-বা আলো হাওয়ার জন্য গম্বুজাকৃতি ছাদের এক পাশে একটি খোলা জায়গা রাখা হয়।

ঘরের ভিতরে অর্দ্ধবৃত্তাকার সীলিঙের কাছাকাছি কাঠের তক্তা বসিয়ে দ্বিতীয় সীলিঙ বা মাচান। এই মাচানে একটি খোলা মুখও রাখে। এতে ছাদকে ঠেকা দেবার কাজও হয়। ভিতরের দিকে ছাদটা পড়ে না যেতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এছাড়া এতে চমৎকার ভাঁড়ারের কাজ হয়, বাসনপত্র, টিনের বাক্স, মিষ্টি আলু, শূকরের গলানো চর্বি, কাপড়চোপড়, মাদুর শয্যাপত্র ইত্যাদি ওরা যাবতীয় জিনিসপত্র এখানে জমা করে রাখে। ঘরে প্রবেশ করার জন্য মেঝের একধারে একটু খোলা জায়গা, ঘরে ঢোকা ও বের হবার জন্য সেখানে একটি মই। ঘুমবার সময় মইটাকে উপরে

তুলে রাখে। খোলা জায়গাটা বন্ধ করার জন্য তক্তা থাকে, সেটি ইচ্ছামত খোলা বা বন্ধ করা যায়। বাড়ীর ভিতরে আসবার জন্যও যেমন মইটাকে ব্যবহার করে তেমনি মাচানে ওঠার জন্যও। ঘরের ভিতের নীচে যে খুঁটি গাড়ে তার ওপর কাঠের গোলগোল চাকতি লাগিয়ে দেয়। এগুলির জন্য ইঁদুর ঘরে ঢুকতে ও চালের শনের মধ্যে ঢুকতে পারে না। একবার ওখানে ঢুকলে আর ওদের মারা অসম্ভব।



ঘরের ভেতর যদি রান্না করবার দরকার হয় তাহলে প্রবেশ দ্বারের বেশ কিছুটা দূরে একদিকে চুল্লী তৈরী করে। কর্কশ কাঠের চতুষ্কোণ তক্তা দিয়ে তৈরী উনুন চার পাঁচ ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া, কাঠের বাক্সের মত দেখতে। ঘরের মেঝেতে সেই বাক্স-টাকে বসানো, তার চারদিকে বাক্সটা বালিতে ভরা থাকে বলে আগুন লাগার ভয় নেই।

উঁচু গম্বুজাকৃতি গৃহ ছাড়াও চতুষ্কোণ মালগাড়ির মত বাড়ীও আছে। এসব ঘর অর্দ্ধবৃত্তাকার ঘরের মত এত চমৎকার বা মজবুতও নয়। কিন্তু তৈরী করতে কম সময় লাগে। আলো হাওয়ার ঢোকার পথও বেশি। এইজন্যে অনেক সময় লোকে অর্দ্ধবৃত্তাকার ঘরের থেকে এই ঘরই বেশি পছন্দ করে। নিকোবরীরা অবশ্য দুরকম ঘরের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে। 'পতি' শব্দটির মানে

গৃহ, সেটি শুধু গোলাকৃতি ঘরের সম্পর্কেই প্রয়োগ করে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট যেমন চতুষ্কোণ ঘরগুলিকে বলে 'তালিকা' অর্থাৎ কুঁড়ে ঘর।

চতুষ্কোণ ঘরের বেলায়ও কাঠামো পৃথকভাবে তৈরী করে। তারপর তুলে এনে খুঁটির উপর বসায়। এ বাড়ীগুলিরও একটি করে ঘর। গম্বুজাকৃতি ঘর তৈরীর সময়ে যেমন করে ঠিক তেমনি এর বেলাতেও খুঁটি লাগায় ও ঘরের ভিত তৈরী করে। তবে দেয়াল ও ছাদ আলাদা। দেয়াল তৈরী করে নারকেলের বাইলের মাদুরের বেড়া দিয়ে, চালা ছায় বড় বড় পাতা দিয়ে। পাতাগুলি সমান করে বিছিয়ে দেওয়া চাল। দেয়ালের ওপর দিয়ে বাড়ানো থাকে। এতে বৃষ্টির ছাঁট সোজাসুজিভাবে দেয়ালে পড়ে না। এই সব ঘরে প্রবেশপথ ঘরের মেঝেতে থাকে না। সামনের দেয়ালে একটি দরজা, তার সংলগ্ন একটি মই, মই-এর সাহায্যে ঘরে যাতায়াত করে। দেয়ালে জানালাও থাকে, ঘরের আকার অনুযায়ী সংখ্যা। এই সব ঘরেও জিনিসপত্র রাখার জন্য সীলিঙের কাছে মাচান।

আজকাল বছর কয়েকের মধ্যে ওদের গৃহনির্মাণ পদ্ধতিতে অদ্ভুত ক্রমবিকাশ দেখা যাচ্ছে। ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ক্রম-বর্দ্ধমান সংযোগের ফলে এবং দ্বীপের মধ্যে অধুনা নির্মিত সরকারি দপ্তরের দালান কোঠা দেখে উৎসাহ পেয়ে অন্যান্য দালান কোঠা নির্মাণের উপকরণ নিজেদের গৃহে ব্যবহার করতে সুরু করেছে। অনুন্নত শ্রেণীর লোকেদের কল্যাণমূলক পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎকৃষ্ট ধরনের কাঠ, যা নিকোবরে সুলভ নয়—সরকার তা পোর্টব্লেয়ার থেকে আনিয়ে স্থানীয় লোকেদের কম দামে দিচ্ছেন বলে উন্নত ধরনের গৃহ নির্ম্মাণে তারা আরো উৎসাহিত হচ্ছে। এই সব উন্নত ধরনের গৃহ কম বেশি চিরাচরিত বাড়ীগুলির মতই এক প্যাটার্ণের। বাড়ীগুলি মাটির সমতা থেকে উঁচুতেই করে তবে কাঠের খুঁটির বদলে রাজমিস্ত্রির তৈরী পাকা সিমেণ্টের থামের ওপর গৃহ ভিত স্থাপন করে। পাকা থাম তৈরীর চুন প্রবাল পাথর জ্বালিয়ে তৈরী করে আর সিমেণ্ট কেনে পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট থেকে।

এইসব উন্নত ধরনের গৃহের আকার চতুস্কোণ, ছাদ ঢালু। এসব বাড়ীরও কাঠামো আলাদাভাবে তৈরী করে খুঁটির ওপর স্থাপন করে। বাড়ীগুলিতে সাধারণতঃ মাঝখানে বড় একটি হল ঘর, চারদিকে প্রায় ছয় ফুট চওড়া সরু ঘোরানো বারান্দা। হলের দেয়ালগুলি কাঠের। বাড়ীর আকার অনুযায়ী হলের দরজা জানালা। বারান্দায় মুখোমুখি তু'দিকে খোলা, যাতে সরাসরি আলো হাওয়া তুদিক থেকে চলাচল করতে পারে। ঘরের পুরাতন রীতিতে মেঝে, হয় কাঠের নয়ত চেরা বাঁশের। চতুষ্কোণ হলের অপেক্ষাকৃত ছোট দিকের বারান্দা সাধারণতঃ বন্ধ থাকে, ওটা ভাঁড়ারের কাজে লাগে। কয়েকটি ঘরের আবার মাচানের ওপরেই ভাঁড়ারের কাজ চলে। পাশের একটি বারান্দা দিয়ে ঘরে ঢোকার পথ। এই উন্নত রীতির গৃহে কোথাও কোথাও মই-এর বদলে কাঠের সিঁড়ি। ছাদ সাধারণতঃ টালির। এরা স্থানীয় ট্রেডিং কোম্পানির মারফত টালি কেনে। টালি পাওয়া না গেলে ছাদের জন্য কাঠ এবং গলিত লোহার পাত ব্যবহার করে। অনেকে বাড়ীটাকে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করে, চকোলেট, গাঢ় সবুজ, লাল হলুদ ইত্যাদি নানা রঙে।

খুঁটির ঘর-বাড়ী ছাড়াও কিছু পাকা বাড়ী হয়েছে। এই সব গৃহে একটি চতুষ্কোণ হল আছে যার সামনে দিয়ে প্রবেশ পথ, মেঝে পাকা। এই হল ঘরের তুদিকে দেয়াল বরাবর পাকা উঁচু মঞ্চ, মাঝখানে একটি ছোট গলিপথ। মঞ্চের ওপর লোকে বসে, শোয় ও গল্পগুজব করে। এই সব পাকা বাড়ীর কয়েকটিতে সামনে প্রশস্ত বারান্দা, যার মধ্য দিয়ে হলে যাবার রাস্তা। মাঝখানের হলের পেছনে সাধারণতঃ ভাঁড়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি ছোট ঘর, গৃহ-সংলগ্ন পাকা রান্নাঘর। গৃহের ছাদ ম্যাঙ্গালোর টালি নির্মিত ও ঢালু। এই সব গৃহে আলো হাওয়া চলাচলের ভাল বন্দোবস্ত এবং অনেক দরজা জানালা। বর্ষা ও রোদ্দুর যাতে ঘরের

মধ্যে না আসতে পারে সেজন্য জানালার উপর কখনও-বা কাঠের খড়খড়ি লাগান।

নিকোবরীদের ঘরের ভেতরটা খুব প্রশস্ত এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কর নিকোবরে ঘরগুলি খালিখালিই লাগে কারণ জিনিসপত্র অনেক সময় ওরা মাচানে উঠিয়ে রাখে। অন্যান্য দ্বীপে যদিও জিনিসপত্র উপরে মাচানে তুলে রাখে, তবুও ঘরের মধ্যে কাঠের মূর্তি, চিত্র এবং পাতার ঝালর ঝুলিয়ে রাখে, ভূতপ্রেত কিংবা রোগ দূর করতে। এতে ঘর বোঝাই হয়ে যায়।

ঘরে আসবাবপত্র সামান্যই কারণ শোওযা ও বসার জন্য ঘরের মেঝে এবং মাদুরই যথেষ্ট। প্রয়োজনীয় আসবাব বলতে শুধু প্রশস্ত সেটি, যেগুলো কাঠের ফ্রেমে চেরা বাঁশে আঁটা ও ওপরে বেতের বুনোট। এই সেটিগুলি মাটিতে মেঝের নীচে রাখে এবং দিনের বেলায় এর ওপর শোয়, বসে ও গল্পগুজব করে। সেটির উপর জোড়াসন কেটে বসে জরুরি সভার কাজও করে। শিক্ষিত লোকের এবং গাঁয়ের মোড়লদের কিছু কিছু কাঠের আসবাবপত্র আছে—যেমন টেবিল, চেযার ইত্যাদি। এসব গাঁযেই তৈরী হয়। তবে এসব আসবাবপত্র তাদের নিজেদের চেয়ে বেশির ভাগই পরিদর্শক রাজ কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বিশেষ ব্যক্তির জন্যই ব্যবহৃত হয। সব রকম গৃহেই বাথরুম এবং আলাদা পাযখানা। প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট কুয়োর জলে স্নান করে। পায়খানার জন্য সমুদ্র তীরে বা জঙ্গলে নির্জ্জন স্থানে যায়। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের পরিকল্পনা অনুযায়ী কর নিকোবরে কিছু পাকা স্নানাগার ও ফ্ল্যাশ পায়খানা নির্মিত হয়েছে। এগুলো ক্রমেই জনপ্রিয় হলেও সংখ্যায় এখনো খুব কম। তাছাড়া খুঁটির ঘরগুলিতে চুল্লি থাকলেও সম্পূর্ণ রান্না এতে হয় না। অধিকাংশ গৃহেই আলাদা রান্না ঘর, যা খুব ছোট ও নিকৃষ্ট ধরণের কুঁড়ে ঘর। সাধারণতঃ রান্নাঘর উঁচু মাচার উপরে। রান্নাঘরের মধ্যে উঁচু জায়গা আছে যেখানে নানা জিনিসপত্র রাখা হয় এবং লোকে বসে খায়। মূল ঘরের মধ্যে যেমন তেমনই উনুন, বালু ভরা কাঠের বাক্সের মধ্যে তৈরী।

আদ্দিকাল থেকেই নানা আকারের মাটির বাসনকোসন যেগুলো ওরা চাওড়া থেকে আনে। আজকাল নিকোবরীদের রান্নাঘরে স্থানীয় অনেক অ্যালুমিনিয়ামের বাসন দেখা যায়। চায়ের কেৎলি, ডেকচি, নানা আকারের হাঁড়ি, পাতিল, রুটি বানানর তাওয়া, ভাজার জন্য প্যান, চামচ ও হাতা, নানা আকারের থালা, বাটি, সাঁড়াশি ইত্যাদি, মশলা বাটার শিলনোড়াও। এনামেলের প্লেট ও মগ প্রতিদিনের খাওয়া-দাওয়ার জন্য। চীনামাটির বাসন ও গ্লাস, চা ও জলখাবার এবং অতিথি আপ্যায়নের জন্য।

সাধারণতঃ বাড়ীগুলির কোন কম্পাউণ্ড থাকে না কিন্তু কোন পাকা বাড়ীতে পাঁচ ফুট উঁচু দেয়াল কম্পাউণ্ডের সীমা নির্দ্ধারণের জন্য গাঁথা। সীমানার প্রাচীর চুন মিশ্রিত প্রবাল পাথর দিয়ে গড়া। দেখতে খুবই সুশোভন। বাড়ীর চারদিকে লোকে এখনো ফুল ও সব্জির বাগান করতে শুরু করেনি। তাদের সমস্ত বাগ-বাগিচা দ্বীপের অভ্যন্তর ভাগে।

এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে সব বাড়ীতে সাধারণতঃ একটিমাত্র হল। যৌথ পরিবার প্রথার প্রয়োজনে করা। তাদের কাছে ব্যক্তি বিশেষের জন্য আলাদা ঘর তৈরী করা সম্পূর্ণ বিদেশী ব্যাপার। তাছাড়া নিকোবরীদের ব্যক্তিগত গোপনতার ধারণার সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের লোকেদের কোন মিল নেই। এখানে দুই বা ততোধিক বিবাহিত দম্পতীকে একই ঘরে থাকতে ও রাত্রিবাস করার ঘটনা মোটেই অস্বাবিক নয়।

একটি থেকে অন্য বাড়ির দূরত্ব শুধু পরিচ্ছন্নতার জন্যই নয়, দৈব-ক্রমে যদি এক বাড়িতে আগুন লাগে তবে অন্য বাড়িতে যাতে আগুন না ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার জন্যও বটে। কর নিকোবর ও চাওড়াতে ঘরের ভেতরটা এবং চতুর্দ্দিক একেবারে নিখুঁত পরিষ্কার। ভেতর থেকে ঝাড়ু দেওয়া খুব সুবিধা কারণ চেরা বাঁশের ফাঁক দিয়ে ধুলো পড়ে যায়।

নিকোবরীদের জীবনযাত্রার মতই ওদের গৃহ নির্মাণের ব্যাপারও একটি সামাজিক ব্যাপার। সাধারণতঃ পরিবারের যুবকেরা একত্র হয়ে গৃহ নির্মাণ করে। পরিবারের সভ্য সংখ্যা বেশী না থাকলে পল্লীর অন্য লোকেরাও সাহায্য করে। বিশ-ত্রিশ জন লোক ক্রমাগত কাজ করলে একটি গোলাকৃতি গৃহ নির্মাণ করতে দু'তিন মাস লাগে। কোন কোন বিশেষ কাজের জন্য—যেমন গৃহের কাঠামো ভিতে স্থাপন করতে—আরো লোকের দরকার হয়। কিন্তু গৃহ নির্মাণের কাজ যারা করে তাদের কাউকেই পয়সা দেওয়া হয় না। লোকজনদের শুধু খেতে দেবার দায়িত্ব বাড়ীর মালিকের, খাদ্য শুধু শূকরের মাংস। গৃহ নির্মাণ শেষ হলে মালিক গৃহ প্রবেশের খাওয়ার আযোজন করে। যারা গৃহ নির্মাণের কাজ করেছে তারা, পরিবারের সভ্যরা সকলে, নিকট বন্ধু-বান্ধব, পল্লীর বিশেষ ব্যক্তিরা সবাই আমন্ত্রিত হয়। মোটামুটি একটা বড় রকমের ভোজ।

নিকোবরীদের বাড়ীঘর দ্বীপের জলবায়ুর অনুকূল ও তাদের জীবনযাত্রার প্রযোজনের দিক থেকে বিশেষ উপযোগী। অধিকাংশ গৃহেরই শনের চালা, তাই খুব গরমেও ঠাণ্ডা এবং বর্ষার প্রকোপও সহ্য করতে পারে। প্রবল বর্ষায়ও ঘরের ভেতরটা ভেজে না। মাটি থেকে উঁচুতে খুঁটির উপরে অবস্থিত বলে জমির আর্দ্রতা ঘরে প্রবেশ করতে পারে না। ঘরের ভিতরটি শুষ্ক ও আরামপ্রদ। ঘরে ঢোকার মইটিও খুব দরকারী। একবার এটি সরিয়ে ফেললে বাইরের লোক বা বিপজ্জনক সরীসৃপ ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে না। বাড়ীগুলি খুব নিরাপদ। মাচানে জিনিসপত্র জমা করে রাখতে খুব সুবিধা। বাঁশের মেঝে স্প্রিং-এর মত নরম। শুধু একটি মাদুর বিছিয়ে শুলেই চলে; বেশি শয্যাদ্রব্যের প্রয়োজন হয় না। মেঝের নীচের জায়গায় দিনেরবেলায় বসা ও গল্প গুজব করার পক্ষে খুব সুবিধা, আবার নৌকা রাখার পক্ষেও। ঘরের নীচেই মেয়েরা মেশিন নিয়ে দিনেরবেলা সেলাই করে। ঘরের

নীচে তার টাঙিয়ে কাপড় মেলে দেয়। বর্ষার দিনেও এটা কাপড় শুকানোর পক্ষে বেশ ভাল জায়গা। কাঠের টুকরো ফিট করে বেত দিয়ে বেঁধে ঘরের সমস্ত জোড়াগুলি খুব নিপুণতার সঙ্গে লাগায়। বর্ষায় মরচে ধরে বলে জোড়ার জন্য পেরেক, কব্জা, ছিটকিনির মত জিনিষ ওরা ব্যবহার করে না। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ঘরের উপকরণ হাল্কা হওয়া বিশেষ দরকার, কারণ ওখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। ঘরবাড়ী ভারী উপকরণে তৈরী হলে আর্থিক ক্ষতি এবং লোক ক্ষয় হবার বেশী সম্ভাবনা থাকত।

অবশ্য এসব বাড়ীতে দুটি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ বাড়ীর উপকরণে সহজে আগুন ধরে যাবার ভয়। একবার আগুন লাগলে সমস্ত বাড়ীটাই পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ গোলাকৃতি গৃহে সাধারণতঃ কোন জানালা নেই। আলো-হাওয়ার রাস্তা মেঝের মধ্য দিয়ে হওয়ায় আলো এবং নির্মল হাওয়ার অভাব। অবশ্য নতুন ও উন্নত ধরণের বাড়ীগুলিতে এই অসুবিধা অনেকটা দূর হয়েছে। নতুন গৃহগুলিতে প্রচুর দরজা-জানালা, সোজাসুজি আলো হাওয়া চলাচলের পক্ষে প্রশস্ত।

বাড়ীগুলি খুবই মজবুত। ঘরের ছাদের শনের আচ্ছাদন নিঃসন্দেহে পাঁচ-ছয় বছর অন্তর বদলাতে হয়। গৃহের এখানে সেখানে নিয়মিতভাবে মেরামত করতে হয়। ভালমত যত্ন নিলে গোল প্যাটার্ণের বাড়ী বিশ-ত্রিশ বছর টেঁকে। স্থানীয় উপকরণে যে চতুষ্কোণ নক্সার গৃহ তৈরী হয় তার চালা প্রায়ই বদলাতে হয়, তবু এগুলি প্রায়, বছর পনের টেকে।

গৃহ নিয়ে নিকোবরীদের খুব গর্ব। বস্তুতঃ একটি ভাল বাসগৃহ তাদের কাছে ধনসম্পত্তি ও পদমর্য্যাদার পরিচায়ক। পরিবারের সঙ্গতি হলেই এরা মহা উৎসাহে নতুন বাড়ী তৈরী করার কাজে লেগে যায়। সযত্নে প্রতিটি বাড়ি তৈরী করে। নতুন বাড়িতে যাতে কোন খুঁত না থাকে, সেদিকেও ওদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

একাদশ অধ্যায়

ভৌতিক সংস্কৃতি ও লোকাচার

নিকোবরীদের খাবার-দাবারের কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। হাতে সময় থাকলে ও খাবার জুটলে সারাদিম ধরে বারবার খেতে রাজি। খাদ্যের ব্যাপারে ওদের বাছবিচার নেই। নারকেল, পান্ডানাস, মিষ্টি আলু, কাঁচা কলা, পেঁপে ইত্যাদি লোকের মুখ্য নিরামিষ খাদ্য। মাছ, পাঁঠার মাংস, শূকর ও মুরগীর মাংস প্রধান আমিষ খাদ্য। ওরা আমিষ খাদ্যই পছন্দ করে বেশি তবে সুলভ নয় বলে সব সময় খায় না।

খাদ্য হিসাবে বহিরাগতদের কাছে পান্ডানাস ফল বিশেষ প্রিয়। এটাকে বিশেষ সুখাদ্য বলে মনে করা হয়। গোলাকার এই ফলের ওজন প্রায় দশ কিলোর মত। এর দুরকম ফল খাওয়ার যোগ্য, লাল ও সাদা। লাল রঙের গুলিই বেশি প্রিয়। ফলের ভেতর ছোট ছোট কোয়া, প্রত্যেক কোয়ার মধ্যে আঁশ, ভিতরে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ। এগুলি রান্নার এলাহি পদ্ধতি। চাওড়ায় তৈরী মাটির পাত্র বা খালি ড্রামের তলায় জল রাখে, জলের উপরে ছোট ছোট কাঠি সাজায়, কাঠির উপর ফলটি রাখে। এমন ভাবে রাখে যেন ফলটির সঙ্গে জলের ছোঁওয়া না লাগে। নারকেল পাতা দিয়ে পাত্রটির মুখ ঢেকে দিয়ে তলায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এমনি করে ফলটি ভাঁপে সিদ্ধ হয়ে নরম হয়ে যায়। তারপর চার পাঁচ জন স্ত্রীলোক মিলে বড় একটি গোল কাঠের থালার চারপাশে বসে একটা একটা করে কোয়া আলগা করে নেয়। তারপর কোয়াগুলি ঝিনুক দিয়ে আঁচড়ে নেয়। নরম সাদা শ্বেতসার জাতীয় বস্তু আঁচড়ানোর ফলে কাঠের থালায় জমা হয়। আঁশগুলি ঝাড়ু দেবার কাজে লাগে। কখনো-বা আঁচড়ানোর পর বাকি কোয়াগুলি ভেঙ্গে ফেলে, ভেতরে সাদা নরম বীজ পাওয়া যায়, বাদামের মত সুস্বাদু। ওরা সেগুলি খুব খুশি হয়ে খায়। কাঠের থালায় কোয়াগুলি

আঁচড়ে যে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ জমা করে সেগুলি চটকে দলা পাকায়। কিছুটা সূতো বা একটি সরু ডাল দলাটির মধ্যে ঢুকিয়ে গোল করে ঘোরাতে থাকে। দলাটার মধ্যে বাকি যে আঁশটুকু থাকে তা সূতো বা সরু ডালের সাহায্যে মন্থন করে বের করে ফেলে। দলাটি এখন খিঁচশূন্য হয় এবং খেতে বেশ মিষ্টি লাগে। অনেকটা মিষ্টি আলুর মত। ওরা এগুলো নারকেলের টুকরো দিয়ে খেতে খুব ভালবাসে।

সাধারণতঃ নিকোবরীদের নির্ঝঞ্ঝাট রান্না, অধিকাংশ সেদ্ধ। মিষ্টি আলু, কাঁচা কলা, এবং পেঁপে ছোট ছোট টুকরো করে খায়। অন্যান্য সবজিও যখন যা পাওয়া যায় তাও সাধারণতঃ সিদ্ধ করেই খায়। ওরা এসব খাবার নারকেল কোরা দিয়ে খায়। আগে এরা নুন খেত না। রান্না করার সময় খাদ্যে কিছুটা সমুদ্রের জল মেশান হত। নিকোবরীদের ভাষায় লবণ বলে কোন শব্দ ছিল না। এখন লোকে নুন খেতে সুরু করেছে। 'সল' শব্দটি ওদের ভাষায় এসে গেছে, নিঃসন্দেহে ইংরেজীর সল্ট থেকে শব্দটির আমদানী। এখনো রান্নার পাত্রে নুন দেবার বদলে প্রায়ই নুন লাল মরিচের সঙ্গে পেষা হয়। মিশ্রিত মশলাটি রান্না করা খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া হয়। লেবু পাওয়া গেলে লেবুর রস নুন ও লঙ্কার সঙ্গে মিশিয়ে এক রকমের চাটনি করা হয়।

এখন অবশ্য লোকেরা কিছুটা বিস্তৃত প্রণালীতে রান্না করে। মূল ভূখণ্ডের মশলাই অধিকাংশ গৃহে ব্যবহৃত হয় এবং প্রায়ই তরকারী রান্না করে খাওয়া হয়।

লোকে মাছ খেতে ভালবাসে। পাওয়া গেলে সেদ্ধ করে বা ভেজে খায়। তবে প্রায়ই ছোট ছোট কাঠিতে বিঁধিয়ে মাটিতে আগুন জ্বেলে তাতে রোষ্ট করে নেয়। খুব ছোট মাছ হলে কাঁচাই খেয়ে নেয়। ছাগ বা মুরগীর মাংসও রোষ্ট করে কিংবা ষ্টু বা কারি করে খায়। মাংস লোকে খুবই পছন্দ করে কিন্তু পরিমাণে কম পাওয়া যায় বলে সাধারণতঃ উৎসবেই বেশির ভাগ খায়।

নিকোবরীদের কাছে বোধ হয় শূকর মাংসের মত এমন প্রিয় আর কোন বস্তু নেই। সব পরিবারেই অনেক শূকর থাকা সত্ত্বেও শূকরের মাংস ওরা প্রতিদিন খায় না, খায় শুধু উৎসব ও আনন্দের দিনে। বাইরে থেকে অতিথি এলে শূকর মাংস দিয়ে তাদের আপ্যায়ন করে। তাছাড়া নতুন নৌকা বা গৃহ তৈরী করে, বিয়ে উপলক্ষে আর পালা-পার্বণের দিনে শূকরের মাংস খায়। অসুস্থ হলে বা আরোগ্য লাভের পরে যদি কেউ শীঘ্র সুস্থ হতে চায় তখন শূকরের মাংস খায়, কারণ শূকর মাংস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে ওরা মনে করে। পা বেঁধে শূকরকে চিৎ করে মাটিতে শুইয়ে দেয়, তারপরে তীক্ষ্ণ বর্শা ওর হৃদয়ে বিদ্ধ করে ওকে হত্যা করে। শূকরটাকে মেরে শুকনো নারকেল পাতার মশাল দিয়ে ওর লোম ও চামড়া পুড়িয়ে ফেলে। তারপর মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে কারি বা রোষ্ট তৈরী করে। রান্নার জন্য শূকরের চর্বি আলাদা রাখে। আবার ফল, ভাত ইত্যাদির সঙ্গেও চর্বি খায়।

ষাট-সত্তর বছর ধরে বাইরের লোকের সঙ্গে সম্পর্কের ফলেই বোধ হয় ওরা প্রায়ই ভাত খায়। উৎসব উপলক্ষে তো অন্ন অবশ্য গ্রহণীয়। তাছাড়া সব পরিবারই সপ্তাহে ছ'চারদিন ভাত খায়, কারুর কাছে আবার ভাত প্রধান খাদ্য।

নিকোবরীরা দুগ্ধ প্রিয় নয়। যদিও আজকাল কোনও কোনও পরিবারে শিশুদের দুধ দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ লোকই চা পান করতে সুরু করেছে, কেউ কেউ আবার দিনে তিন চার বারও পান করে।

নিকোবরীদের মিঠাই তৈরী করার কোনও ঐতিহ্য নেই, বোধ হয় আগে চিনি পাওয়া যেত না বলেই। তবে একটি বিশেষ প্রিয় বস্তু হল রোদে শুকানো কলা। যখন কলার ফলন বেশী হয় তখন কলার খোসা ছাড়িয়ে মাদুর বিছিয়ে কলাগুলি রোদে দশ বার দিন শুকিয়ে নেয়। কলাগুলি তামাটে রঙ ধরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়।

10

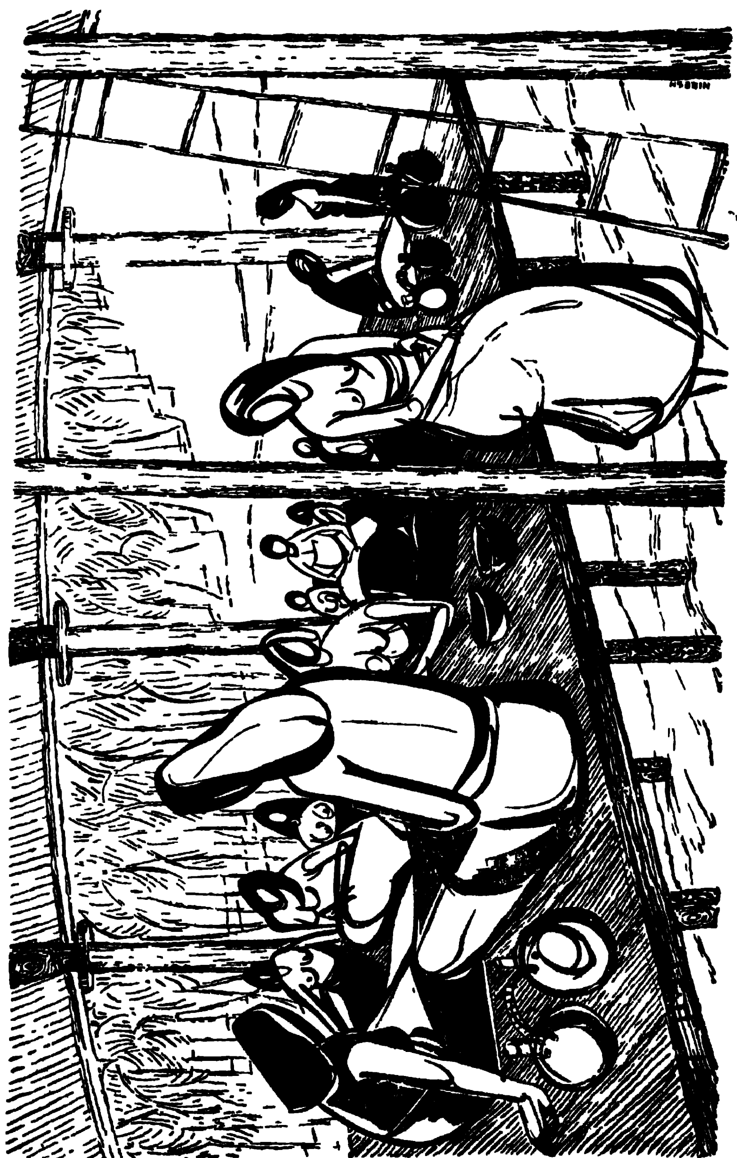
এরকম শুকনো কলার স্বাদ খেজুরের মত। মাসের পর মাস এগুলি রেখে দেয়, এদের কাছে এগুলি চমৎকার সুস্বাদু জিনিস।

নিকোবরীরা খুব কম জল খায়, সাধারণতঃ ডাবের জল খেয়ে ওরা তৃষ্ণা মেটায়। খিদে-তেষ্টা অনুযায়ী ওরা জলের জন্য ডাব বাছাই করে। দা দিয়ে এক কোপে ডাব কেটে জল খায়, তারপর ডাবটাকে দু'খণ্ড করে, ডাবের ছোলা থেকেই একটু কেটে নিয়ে চামচের মত করে ডাবের নরম লেইগুলি খেয়ে ফেলে।

ওরা সবরকম উত্তেজক জিনিসের পক্ষপাতী। প্রায় সবাই পান খায়। জঙ্গলে আবাদের ফলে প্রচুর পান হয়। সমুদ্রোপকূলে প্রাপ্ত প্রবাল পাথর জ্বালিয়ে চুণ তৈরী করে। খয়ের ব্যবহার করে না। নিকোবরী পান স্বাদে কটু ও তিক্ত। সারাদিন ধরে ওরা পান চিবোয়। বিশ বছরের নীচে ছেলেপিলেদের পান খাওয়া বারণ। কখনো বা ট্রেডিং কোম্পানির দোকান থেকে শুকনো তামাক কিনে পানের সঙ্গে খায়।

নারী পুরুষ উভয়ে ধূমপান প্রিয়। সাধারণতঃ নিজেদের বিড়ি ওরা নিজেরা তৈরী করে, বিড়িকে ওরা 'পপ্' বলে। পান্ডানাস গাছের শুকনো পাতা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে বিড়ির বাইরের আবরণ হয়। শুকনো তামাকের গুঁড়ো পান্ডানাস পাতার ক্ষুদে ক্ষুদে টুকরোর সঙ্গে মিশিয়ে ভিতরে দিয়ে পেঁচিয়ে নেয়। এই দেশী বিড়ি খুব একটা কড়া নয়। এগুলির আকার অবশ্য খুব বড়। গাঢ় তামাটে রঙ। এগুলোকে সিগারের মত লাগে। লোকে এখন সিগারেট খেতেও শিখেছে। স্থানীয় দোকান থেকে কেনে। বিশ-পঁচিশ বছরের আগে ছেলেমেয়েরা খায় না। এই নিষেধের আংশিক কারণ তরুণ-তরুণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ওরা ধূমপান ক্ষতিকর বলে মনে করে। অসতর্ক মুহূর্তে ছেলেমেয়েরা হয়ত বা বিড়ি সিগ্রেটের জ্বলন্ত টুকরো বাড়ী ঘরের উপর ফেলবে আর সহজেই অগ্নিকাণ্ড ঘটবে—এ ভয়ও আছে।

খুব জনপ্রিয় মাদক দ্রব্য তাড়ি। এতে লোকেদের মহা আনন্দ।



তাল গাছের পুষ্পিতাবস্থায় তাড়ি চুঁইয়ে নেওয়া হয়। তাড়ি সংগ্রহের জন্য বৃক্ষ নির্ব্বাচনের কোন বিশেষ প্রণালী নেই। নানা গাছেই চেষ্টা করা হয়। কোন বিশেষ গাছে বেশী পরিমাণে এই তরল পদার্থ পাওয়া যাবে বলে যদি বোঝা যায়, তবে সেই গাছ তাড়ির জন্য বেছে রাখে। তাল গাছের পুষ্পিত জায়গাটি কাটে, সেই কাটা জায়গা থেকে তাজা মিষ্টি রস চুঁয়ে পড়ে। সকালে কাটা জায়গার পাশে একটি পাত্র বসিয়ে রাখে। দিনের শেষে পাত্র রসে ভরে গেলে সেটিকে ওরা তুলে নিয়ে যায়। সমুদ্রে ফেলে দেওয়া বড় বড় কাঁচের বোতল সমুদ্রের ঢেউয়ের ধাক্কায় তীরে এসে আছড়ে পড়ে। সেগুলি অথবা মাছ ধরার বয়ার এক দিকে ভেঙ্গে গেলে তা পাত্রের মত হয়। সেগুলি তরল পদার্থ ঢেলে রাখার বোতল। চার পাঁচ দিন রেখে দিলে তরল পদার্থে পচন ধরে, মিঠা থেকে স্বাদ হয় টক টক। এই তরল পদার্থ এখন মাদক উপাদনে ভরপূর এবং এই ভাবে তাড়ি তৈরী হয়।

তাড়ি খেতে ওরা ওস্তাদ। গড়ে একজন ব্যক্তি দু'গ্যালন তাড়ি খেতে পারে। মেয়েরাও খায়। তবে যুবকদের মত অতখানি নয়। অন্য সব উত্তেজক দ্রব্যের মত অল্পবয়স্কদের পক্ষে তাড়িও নিষিদ্ধ। পঁচিশ-ত্রিশ বছরের আগে পুরুষেরা আর পঁয়ত্রিশ-চল্লিশের আগে মেয়েরা তাড়ি খায় না। বৃদ্ধরা অভ্যাসবশতঃ তাড়ি খায় না, যদিও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা নেই।

গ্রামে সাধারণতঃ একা একাই লোকে তাড়ি খায় কিন্তু বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠানের সময় বন্ধু-বান্ধব সহ যৌথভাবে তাড়ি পান করে। উৎসবে আমন্ত্রিত ইয়ার-দোস্ত সমেত দশ-বিশ জন নিমন্ত্রণকারীর গৃহের নীচে বাঁশের সেটিতে বসে। তাড়ি নারকেলের মালায় করে পান করে। কখনো-বা গ্লাস ও এনামেলের মগ। অর্দ্ধেক নারকেলের মালায় তাড়ি খাবার সময় প্রত্যেক পানকারীর সামনে অর্দ্ধেক নারকেলের মালায় নির্ম্মিত একটি ষ্ট্যাণ্ড থাকে। এতে পানপাত্র রাখে। নারকেলের মালার উপরটি পানপাত্র রাখার

উপযোগী করার জন্য চ্যাপ্টা ও মসৃণ করা হয়। একজন থাকে তাড়ি পরিবেশন করার জন্য। একটি স্ত্রীলোক সাধারণতঃ উপস্থিত থাকে পান, দেশী বিড়ি বা সিগ্রেট দিতে। অলস মন্থর গতিতে তাড়ি পান চলতে থাকে, কখনো-বা দিন কাবার হয়ে যায়।

এইরকম যৌথ পানের সময় প্রচুর পরিমাণে তাড়ি খাওয়া হয়। প্রচুর তাড়ি খাবার পরও নিকোবরীরা কারো সঙ্গে অনুচিত ব্যবহার করে না, কোন অপরাধও নয়। যৌথ তাড়ি পানের সময় পানকারীদের মধ্যে একটা শান্ত ভাব বিরাজ করে। তারপর প্রক্রিয়া শুরু হলে ওরা পৃথিবীকে ভুলে যায়। বাইরের কেউ ওদের দেখছে কিনা খেয়াল থাকে না। তাড়ি পানের শেষের দিকে নেশা যখন জমে উঠে তখন ওরা নাচ-গান সুরু করে। যতক্ষণ তাড়ি পান, ঠাট্টা মস্করা, হৈ-হুল্লোড় সবই চলে।

এক নিকোবরী আর এক নিকোবরীকে কখনো তাড়ি বেচে না। সরকার যতই নিরুৎসাহ করুক, ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত নিম্ন পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের কাছে গাঁয়ের বয়স্করা তাড়ি বিক্রি করে।

রাম ও হুইস্কির মত অন্য কড়া মদও ওদের খুব প্রিয়। কিন্তু এসব দ্বীপে আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারী। অনুমতিপ্রাপ্ত মদ্য ব্যবসায়ী না থাকায় এসব মদ পাবার সুযোগ খুবই কম।

পুরুষদের পুরনো পোষাকের নাম ছিল 'কিসাত'। খুবই হ্রস্ব বাস, খানিকটা কাপড় কোমরে জড়িয়ে পেছন দিকে কিছুটা লেজের মত ঝুলিয়ে রাখত। কর নিকোবরে এই বেশ এখন সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে—অবশ্য অন্য সব দ্বীপে কোথাও কোথাও এখনো পরে, তবে এ পোষাক অতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে।

পুরুষের সাধারণ পোষাক এখন উজ্জ্বল রঙের বীচ সর্ট। পাতলা তুলার তৈরী কাপড় স্থানীয় দোকানে পাওয়া যায়, সর্ট স্ত্রীলোকেরা বাড়ীতে তৈরী করে। এই সর্ট খুব আরামপ্রদ। স্থানীয় জলবায়ু ও লোকেদের বাহ্যিক প্রকৃতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। গাঁয়ে

পুরুষেরা উপরের জামা বড় একটা পরে না। পরলেও দোকানের গেঞ্জি, স্পোর্ট সার্ট এবং স্থানীয় দোকানের সার্ট। যারা সরকারী দপ্তর বা ট্রেডিং কোম্পানিগুলিতে কাজ করে তারা পরে সার্ট, বুশ সার্ট, সর্ট, ট্রাওজার্স। উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষেও অন্যান্য গ্রামবাসী এসব পোষাক পরে। এরা কোট কদাচিত পরে। অবশ্য বিশেষ অনুষ্ঠানে গাঁয়ের প্রধান এবং পরিবারের দু'একজন কর্তা পরে থাকে।

বিশেষ অনুষ্ঠানে কিংবা নিজের গ্রামের বাইরে যেতে হলে জুতো পরে। এসব দ্বীপে কোন মুচি নেই বলে চামড়ার জুতো জনপ্রিয় নয়। রবারের চটি ও রবার সোলের কাপড়ের জুতো, যা জলবায়ুর ও দ্বীপের মাটির অনুকুল, পরে।

মেয়েদের পুরনো পোষাক ছিল ঘাসের স্কার্ট। এখন তা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। বিশেষ দেখা যায না। বেশ কিছুকাল ধরে স্ত্রীলোকেরা বর্মি টাইপের উজ্জ্বল পোষাক পরে। সাধারণতঃ কাপড় ছাপায়। উপরের পোষাক আঁট ব্লাউস, লুঙ্গি। লুঙ্গির উপর এক টুকরো কাপড় কোমরে বেঁধে নেয়। ব্লাউসের নীচে মেয়েরা ব্রেসিয়ারও পরে। বিশেষ উপলক্ষে চলতি ফ্যাশনে নাইলনের স্বচ্ছ ব্লাউস, এম্ব্রয়ডারী করা ব্রেসিয়ার। গাঁয়ে দৈনন্দিন কাজকর্মের সময় অনেক স্ত্রীলোক উপরের জামা পরে না। নিকোবরী পুরুষদের সামনে এইভাবে বের হওয়া ওদের অভ্যেস। অবশ্য কোন বহিরাগত দেখলে ওরা ভারি বিব্রত বোধ করে।

ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ উলঙ্গই থাকে। বিশেষ অনুষ্ঠানে ওদের নিয়ে যেতে হলে ছেলেদের পরান হয ছোট বুশ সার্ট, রেডিমেড স্পোর্ট সার্ট এবং হাফ প্যান্ট, মেয়েদের ফ্রক। ছেলেরা সার্ট ও হাফ প্যান্ট পরে স্কুলে যায়, মেয়েরা ফ্রক বা স্কার্ট ব্লাউস। কোন কোন মেয়েরা সালোয়ার কামিজ পরতে সুরু করেছে। কাচালের রানী চাঙ্গা এবং নান কাউরির রানী লক্ষ্মী এই দু'জন উপজাতীয় রানী ছাড়া আর কেউ শাড়ী পরে না। সারা বছর ধরে জলবায়ু উষ্ণ। গরম কাপড়ের দরকার হয় না। তবে ছোট

শিশুদের জন্য মেয়েরা পশমের পুলোভার বোনে—প্রবল বর্ষা ও ভারি বাতাসের জন্য ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এগুলি তাদের পরানো হয়।

কর নিকোবর ছাড়া অন্যান্য দ্বীপে নারী পুরুষ উভয়েই উৎসব ও বিশেষ অনুষ্ঠানে ওদের পুরনো টুপি পরে। রঙিন কাপড় ও খড় দিয়ে তৈরী ওই টুপি। পুরুষের টুপি উপরের দিকে চ্যাপ্টা, দু'দিকের দুপ্রান্ত কুকুরের লেজের মত ঝুলে থাকে। মেয়েদের টুপি রঙিন, নানা রকম উজ্জ্বল কাপড়ের টুকরোতে তৈরী। ওদের টুপির চ্যাপ্টা গোল কিনারা, ডাঁটার মত দুদিকে দুটি লম্বা ফালি সোজা উপরে উঠে গেছে।

নিকোবরীরা বস্ত্র প্রিয়। ওরা কাপড়-চোপড়ের খুব যত্ন নেয়। কাপড় নিয়মিত ধোয়। ভারতের মূল ভূখণ্ডের গ্রামবাসীর তুলনায় ওরা সাধারণতঃ অনেক পরিষ্কার কাপড় পরে। ওদের উজ্জ্বল রঙের পরিষ্কার কাপড়-চোপড় দ্বীপের সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে তোলে।

টেরাসা ও চাওড়ার কিছু লোক ছাড়া পুরুষেরা লম্বা চুল রাখে না। ওদের মধ্যে এখন সব রকম আধুনিক ষ্টাইলই দেখা যায়, যদিও সবচেয়ে প্রিয় 'ক্রু' কাট। নাপিত নেই বলে ওরা নিজেরাই চুল কাটে।

মেয়েরা সাধারণতঃ ঘাড় পর্য্যন্ত চুল রাখে। নিয়মিত কাটে। মাঝখানে বিভক্ত ওদের চুল খোলাই থাকে। কেউ কেউ আবার বেণী বাঁধে। অবিবাহিত মেযেরা সাধারণতঃ রিবন বাঁধে। পশ্চিমের রীতি অনুযায়ী কেউ-বা বব্ চুলও রাখে। মূল ভূখণ্ডের মেয়েদের মত কেউ কেউ আবার খোঁপাও বাঁধে।

স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই নারকেল তেল পছন্দ করে। চুলে ও গায়ে নারকেল তেলই মাখে। আজকাল প্রায় সকলেই স্নানের জন্য সাবান ব্যবহার করে। শিক্ষিত ও সমাজের একটু উন্নত শ্রেণীর পুরুষের অনেকেই আধুনিক সব রকম প্রসাধনদ্রব্য ব্যবহার করে। মেয়েরাও, পাউডার, লিপষ্টিক এবং নেল পালিশ ব্যবহার করে।

মেয়েরা নিজেদের চেহারা সম্বন্ধে খুবই সতর্ক, যা করলে আরো সুন্দর দেখাবে তা করতে খুবই সচেষ্ট।

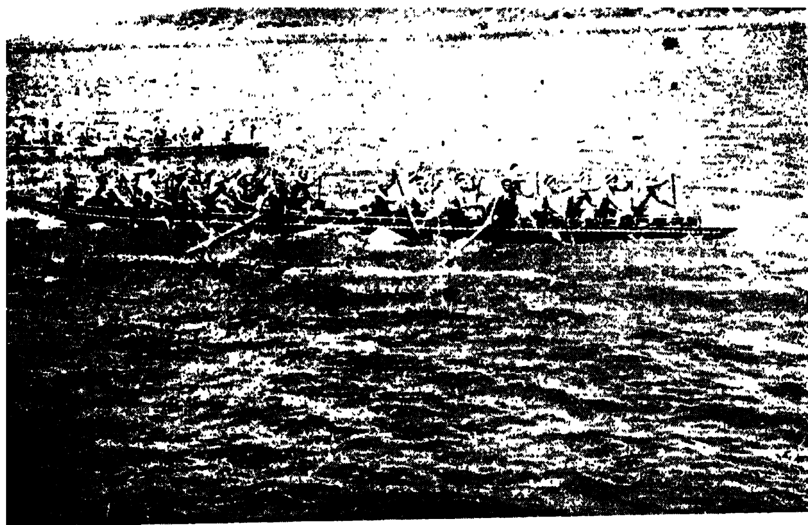
পুরুষদের সর্বদা দাড়ি কামানো মুখ, কারুর-বা পাতলা গোঁফ। নিকোবরী পুরুষের মুখে চুল এত কম, যে প্রতিদিন ওদের দাড়ি কামাতে হয় না। ছোট পিন দিয়ে পুরুষেরা দাড়ি থেকে চুল তুলে ফেলে। বেশ বেদনাদায়ক পদ্ধতি। তবু এটাই এখনো চালু। জনা কয়েক শিক্ষিত লোক দাড়ি কামানর জন্য ব্যবহার করে সেফটি রেজর।

নিকোবরীরা কখনো স্বর্ণালঙ্কার ব্যবহার করে না। অতীতে রূপার গয়না খুব জনপ্রিয় ছিল। পুরুষ-নারী উভয়েই একরকম অলঙ্কার পরে। প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা এবং রূপার তার দিয়ে গয়না বানানো হয়। তার দিয়ে গাঁথা হয় মুদ্রা। সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে চার আনিগুলিই ব্যবহৃত হয়, কখনো বা আধুলি ও টাকা। এই মুদ্রার মালা নেকলেসের মত গলায় পরে। মুদ্রার ছুটো তার বগলের নীচে এবং ছুদিকের কাঁধে এমনভাবে পরে মনে হয় বুকের উপর ক্রুস। কখনো-বা একটি মুদ্রার নেকলেস থেকে আর একটি মুদ্রার তার বেঁধে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় কোমরের নীচে পর্যন্ত। মুদ্রার অলঙ্কার সব সময় এক তারে হয় না, ছ'তিন বা চারটি তার একত্র সংযুক্ত করে চার লহরী মালাও করে। সেটি মালিকের ঐশ্বর্যের উপর নির্ভর করে। মোটা রূপার তার, পায়েও পরে, হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত। আবার হাতে কনুই পর্যন্ত রূপার তারের বালা। মুদ্রার মালা মাথার চারদিকে এমন করে বাঁধে যে মুদ্রাগুলি কপালের ওপর ঝুলে থাকে।

অতীতে ছেলে-মেয়েদের কান ফোঁড়ান হত। পাতলা রূপার তারে মুদ্রা গেঁথে তাদের কানে পরানো হত। এখন কর নিকোবর এবং অন্যান্য দ্বীপের অনেক পরিবারেই ছেলেদের কান ফোঁড়ান হয় না। অবশ্য মেয়েদের কান এখনো ফোঁড়ায়। রূপোর তারের আংটি করে তারা কানে পরে। আঙুলে রূপোর তারের এবং কচ্ছপের খোলায় তৈরী আংটি।



চিত্র ১৫। প্রাচীন অলঙ্কারে ভূষিতা নিকোবরী মেযে (১৫২ পাতায দেখুন)



চিত্র ১৬। নৌকা বাইচ (১৭৭ পাতায় দেখুন)

ত্র ১৭। নৌকা বাইচের পরে নৌকা তীরে নিয়ে আসা (১৭৮ পাতায় দেখুন)





চিত্র ১৮। শূকর লড়ছে (১৮১ পাতায় দেখুন)

চিত্র ১৯। লাঠি খেলা (১৮২ পাতায় দেখুন)





চিত্র ২০। কর নিকোবরে মেয়েদের ভলিবল প্রতিযোগীতা (১৮৪ পাতায় দেখুন

চিত্র ২১। নানকাউরি দ্বীপপুঞ্জে নৃত্য (১৯৪ পাতায় দেখুন)



আজকাল সাবেক কালের অলঙ্কার কদাচিত পরে। শুধু চাওড়া ও টেরাসাতে কিছু লোক দৈনন্দিন জীবনে এসব পরে। কর নিকোবর এবং অন্য সব স্থানে বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষেই শুধু পরে। যে সব বালক ডোঙ্গায় চড়ে প্রথমবার চাওড়া যায় তারা সবরকম পুরনো অলঙ্কার পরে যায়। অসুখের সময়ও কখনো-বা রূপোর তারের অলঙ্কার পায়ে পরে। ওদের বিশ্বাস এতে রোগীর পা সুরক্ষিত থাকবে এবং রোগী তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হবে।

মেয়েরাও এখন সস্তা কৃত্রিম অলঙ্কার পরে—নেকলেস, চুড়ি, দুল ইত্যাদি। এগুলি স্থানীয় দোকানে পাওয়া যায়।

উৎসব অনুষ্ঠানেও লোকে ফুলের, নারিকেল ও কলাপাতার সুন্দর অলঙ্কার তৈরী করে মাথায়, গলায় ও হাতে পরে, বিশেষ করে কলাপাতার মালা তো উৎসবের চিহ্ন। ভূতপ্রেতের উপদ্রব থেকে এগুলি বাঁচায় বলে ওদের বিশ্বাস।

শোবার জন্য নিকোবরীদের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নেই। সাধারণতঃ সূর্যাস্তের সময় বাড়ী ফেরে, কিন্তু শুতে যায় দেরীতে। খায়, গল্পগুজব করে, গান গায়, তাড়ি খায়, আর ঘুমায় বরং দেরীতে। কখনো-বা উৎসবের সময় সারা রাত জেগে নাচ গান করে। মাছ ধরার জন্যও প্রায়ই বাইরে সারারাত থাকে। অনেকে আবার অসময়েও ঘুমিয়ে পড়ে। সমগ্রভাবে ধরলে ভারতের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসীদের চেয়ে নিকোবরীরা বেশি ঘুমায়, তবে একটানা ঘুমায় না, সারাদিনে কয়েকবার অল্প সময়ের জন্য ঘুমায়।

সারা বছর জলবায়ু উষ্ণ থাকে বলে বিছানাপত্র খুব বেশি লাগে না। লোকেরা সাধারণতঃ ঘরের মেঝেতে শোয়। চেরা বাঁশে তৈরী বলে তা বেশ নরম, স্প্রিং-এর মত। গদি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। নারকেল বা পান্ডানাস পাতায় তৈরী চাটাই মেঝেতে বিছিয়ে শোয়। আগে মাথা রাখার জন্য শক্ত কাঠের

টুকরো ব্যবহার করত, কিন্তু এখন রেশমি তুলোর নরম বালিশে মাথা রাখে।

তুলো এসব দ্বীপে পাওয়া যায়। রাতে একটু ঠাণ্ডা পড়লে অধিকাংশ লোক চাদর গায়ে দেয়। কেউ-বা তোষক, বালিশ, কম্বল ইত্যাদি পুরো শয্যাদ্রব্য ব্যবহার করে, তবে খুব কম লোকেই। যারা পাকা বাড়ীতে থাকে তারা বিছানাপত্র ব্যবহার করে। কর নিকোবরে মশারির ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে। অন্যান্য দ্বীপে খুব কম লোকে ব্যবহার করে।

রাত্রিবেলা আলো জ্বালাবার পুরনো রীতি এখনও চালু। তুলোর বা ছেঁড়া কাপড়ের পলতে অর্দ্ধেক নারিকেলের মালাতে বা বড় সামুদ্রিক প্রাণীর খোলের মধ্যে নারিকেল তেল বা শূকরের চর্বি ভরে জ্বালায়। অধুনা কেরোসিনের বাতি বা নানা রকম স্থানীয় লণ্ঠন দোকানে পাওয়া যায়। গাঁয়ে বিজলী এখনো চালু হয়নি। উৎসব উপলক্ষে যখন সারা রাত গাঁয়ের কোন এলাকা বা কয়েকটি বাড়ি আলোকিত করার আবশ্যক হয়, রাশিকৃত নারকেলের মালা কতকটা দূরত্ব রেখে জ্বালান হয়। একটি স্তূপে অর্দ্ধেক নারকেলের মালা অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি করে সাজায়, প্রতিটি নারকেলের মালার একটু অংশ পরেরটির ওপর থাকে, তারপর শেষেরটি জ্বালিয়ে দেয়। এই রকম নারকেলের মালার বাতি একসঙ্গে তুতিন ঘণ্টা জ্বলে। দেখাশোনা করার প্রয়োজন হয় না। এর উজ্জ্বল আলো। রাত্রে পথ চলতে, জঙ্গলে বা জনপদে লোকে বেশির ভাগ নারকেল পাতার তৈরী মশাল ব্যবহার করে।

আজকাল দেশলাইর সাহায্যে আগুন জ্বালান হয়। আগুন জ্বালার প্রাচীন রীতি বড় মজার। ঘর থেকে বহুদূরে গভীর জঙ্গলে আগুনের দরকার হলে দেশলাই হাতের কাছে না থাকলে এখনো লোকে এই ভাবেই আগুন জ্বালায়। প্রথমে তু' টুকরো চেরা বাঁশ নেয়। এক টুকরো মাটিতে রাখে। গোলাকার তলের দিক উপরমুখী করে রাখে। নীচে কিছু শুকনো পাতা ও ডালপালা রেখে দেয়। এই

বাঁশের টুকরোটি এমনভাবে রাখে যাতে পায়ের দিকের ভারসাম্য ঠিক থাকে। একটি ছোট গর্ত উপরের দিকে করে, তারপর এর ওপর আড়াআড়িভাবে বাঁশের অন্য টুকরোটির তীক্ষ্ণ কিনারা দিয়ে খুব দ্রুত ঘষতে থাকে। এইভাবে ঘর্ষণের ফলে বাঁশের দুটি টুকরো থেকে খুব সূক্ষ্ম ও দাহ্য বাঁশের গুঁড়ো বের হয়। এই গুঁড়ো বাঁশের টুকরোতে করা গর্ত দিয়ে নীচে মাটিতে যেখানে শুকনো পাতা ও ডাল পালা জড় করে রাখা হয়েছে তার মধ্যে পড়ে। ঘর্ষণের সময় যে স্ফুলিঙ্গ বের হয় তা ওই দাহ্যবস্তু বাঁশের গুঁড়োর সংস্পর্শে আসে এবং আগুন জ্বলে ওঠে। অচিরে এই আগুন শুকনো পাতা ও ডালপালার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁশের টুকরো ছাড়াও আগুন জ্বালাবার দ্বিতীয় একটা উপায় আছে। এক টুকরো শক্ত কাঠ মাটিতে রাখা হয়। একটি পাতলা কাঠের টুকরো এর উপর ঘষে। টুকরোটি ঘষে ছুরি দিয়ে চেঁছে তার মুখটা ছুঁচালো করে নেয়। এই ছুঁচালো মুখ কাঠের টুকরোটি মাটিতে পড়ে থাকা কাঠের উপর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে। ঘর্ষণের ফলে স্ফুলিঙ্গ বের হয়। ঘর্ষণের জন্য যে সব কাঠের গুঁড়ো পড়ে স্ফুলিঙ্গের ফলে তাতে আগুন জ্বলে ওঠে। একটু আগুন জ্বললেই আগুনটাকে জোরালো করার জন্য শুকনো ডালপালা দেওয়া হয়।

এখন কর নিকোবর এবং অন্যান্য উন্নত স্থানে গ্রিগেরিয়ান ক্যালেণ্ডার ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়। লোকেদের সন তারিখ মাস ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি সঠিক ধারণা আছে। তবে কিছু বৃদ্ধ ও অশিক্ষিত লোক ছাড়াও কর নিকোবরে এমন লোক আছে, যারা এখনও প্রাচীন পঞ্জিকা ব্যবহার করে। এই পঞ্জিকাতে বছরের কোন গণনা নেই। ইতিহাসের কোন নির্দিষ্ট কাল থেকে কোন শকাব্দ গোনা হয় না। পঞ্জিকাতে শুধু একটা বছরের মাসের ও দিনের হিসাব থাকে। সমস্ত হিসাব-কিতাবের ভিত্তি শুধু চাঁদ ও দুটি মৌসুমী বায়ুর সময়কাল। লোকে জানে এক বছরে বার মাস। প্রত্যেক মাসে চন্দ্র পরিক্রমনান্তে ত্রিশ দিন পূর্ণ

হয়। দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে ছুটি মৌসুমী বায়ুর যে নিবিড় সংযোগ, তাও তারা জানে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রথম সুরু হবার পরের অমাবস্যা থেকে নিকোবরী পঞ্জিকার আরম্ভ। একটি লম্বা লাঠি নিয়ে একদিনের চিহ্ন হিসাবে প্রতিদিন একদিন করে দাগ দেয়। প্রথম দশ দিন চন্দ্র কলা বাড়ার সঙ্গে লাঠিটার উপর সোজা দশটি দাগ দিয়ে রাখে, একটি অপরটির সমান্তলাল করে। দশমীর পর চাঁদ যখন বেশ বড় হয় তখন থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত শেষের পাঁচ দিন এবং পূর্ণিমার পরে কৃষ্ণপক্ষের প্রথম দিন উজ্জ্বল রাত বলে মনে করা হয়। উজ্জ্বল সময়ের চিহ্ন রূপে ছয়টি টেরচা এবং কৌণিক ঢেরা লাঠিটার উপর টানে। তারপর ক্ষীয়মান চাঁদের প্রথম দশদিন আবার লাঠিটার উপর দশটি সোজা সমান্তরাল দাগ টানে। তারপর একাদশী থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত বাকি চারদিন অন্ধকার রাত বলে মনে করা হয়। লাঠির উপর আবার টেরচা ও কৌণিক ঢেরা টানে সময়ের ছোতক হিসাবে। এইভাবে চাঁদের মাসিক পরিক্রমা লাঠির উপর চিহ্ন দিয়ে আঁকা হয় এবং চারভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন চন্দ্র কলা বাড়ার সময় (দশটি সোজা চিহ্ন), চন্দ্র-করোজ্জ্বল রাত (ছয়টি টেরচা ঢেরা চিহ্ন), ক্ষয় পাওয়া কলার সময় (দশটি সোজা রেখা), আঁধার রাত (ছয়টি টেরচা ঢেরা)। প্রতিটি দিন চিহ্নিত করার জন্য এভাবে সারা বছর ধরে চন্দ্র পরিক্রমার হিসাব রাখে।

চটপট ও নির্ভুল হিসাবের জন্য লাঠি ছাড়াও ওরা একটি কাঠের তক্তা নেয়। তাতে একদিকে একটার উপর আর একটা ত্রিশটি ছোট গর্ত করে রাখে এবং আর একদিকে একই রকম বারটি গর্ত প্রথম সারি গর্তের সমান্তরাল করে রাখে। একদিকে ত্রিশটি গর্ত মাসের দিনগুলির চিহ্ন এবং চারটে ভাগে এগুলি বিভক্ত, ১০, ৬, ১০ এবং ৪টি গর্ত পর পর করা চারটি অংশ চিহ্নিত করার জন্য ; নিকোবরীরা এতেই প্রতি চন্দ্রমাসের হিসাব রাখে। অন্যদিকে বারটি গর্ত বছরের বার মাসের চিহ্ন। দেশলাই বাক্সের কাঠির মত ছুটি

ছোট পাতলা কাঠি দু'সারি গর্তের মধ্যে থাকে। গর্তগুলির প্রথম সারিতে দিনের হিসাব বোঝা যায়। কাঠিটিকে প্রতিদিন একটি করে গর্ত থেকে সরিয়ে দ্বিতীয়টিতে রাখা হয়। আবার দ্বিতীয় সারিতে কাঠিটি প্রতি মাসের শেষে একবার সরান হয়। এইভাবে দিন আর মাসের হিসাবের একটি মোটামুটি সঠিক ধারণা করা হয়।

হিসেবপত্র করার পুরনো পদ্ধতি নিকোবরীরা ত্যাগ করেছে। মাপ-জোখের জন্য এখন মেট্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দূরত্ব মাপা হয় প্রধানতঃ গজ, ফার্লং, মাইল ইত্যাদি ইংরেজী নিয়মে। মেট্রিক প্রথা খুব জনপ্রিয় হচ্ছে। গাঁয়ে অনেকেরই ঘড়ি আছে। ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম অনুযায়ী তা চলে, সেই হিসাবেই দিনের সঠিক সময়ের হিসাব স্থির করা হয়। সমস্ত দ্বীপে গণনার যে পুরনো পদ্ধতি এখানে চালু আছে তা হলো জোড়ায় জোড়ায় হিসাব করা। তাই যদি কাউকে দশটি নারকেল দিতে হয়, ওরা বোঝে দশ জোড়া বা কুড়িটা নারকেল।

দ্বাদশ অধ্যায়

স্বাস্থ্য

নিকোবরীরা প্রচণ্ডভাবে বহির্জীবন যাপন করে, খায় মোটামুটি ভাল এবং সাংসারিক ঝামেলাও তেমন নেই, তাই তাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। বস্তুতঃ এই দ্বীপপুঞ্জে বহিরাগত আগন্তুকরা প্রথমেই এদের সুগঠিত দেহ, স্বাস্থ্য ও আনন্দের দীপ্তি দেখে মুগ্ধ হয়।

কিন্তু ভাল স্বাস্থ্য থাকা সত্ত্বেও এদের নানারকম রোগপীড়াও আছে। দ্বীপপুঞ্জের অভ্যন্তরে ঘন আগাছা গুল্মের জঙ্গল এবং জলাভূমি থাকায় সেগুলি মশা উৎপত্তির কেন্দ্র। এই মশা গোদ ও ম্যালেরিয়ার বাহক। খাবার অভ্যাসের দোষে বিশেষ করে অনিয়মিত আহার, কখনো বা অতি ভোজন, কখনও বা ভালভাবে রান্না না করে খাবার ফলে পাকস্থলীর অসুখ করে। দূষিত কুয়ার জল রোগ বীজাণুতে ভর্তি। তাই সিদ্ধ না করে জল খাবার ফলে আমাশয়, উদারাময় ইত্যাদি হয়। যেসব শূকরের কৃমি আছে সেই শূকরের মাংস খেলে পেটে কৃমি হয়। তাদের খালি পায়ে কাদায় ঘোরার ফলে পায়ের লোমকূপের মধ্য দিয়ে হুকওয়ার্ম শরীরে প্রবেশ করে। আর্দ্র জলবায়ুতে দেহে প্রচুর ঘাম হয় বলে খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি চর্ম রোগ হয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার জন্য অনেকের হয় সর্দিকাসি ও ইনফ্লুয়েঞ্জা। অনবরত পান চিবোনোর জন্য এবং নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার না করার জন্য দাঁতের রোগ হয়। যক্ষ্মা, যৌনরোগ, ট্রাকোমা ইত্যাদি কোন কোন রোগ বাইরে থেকে এসেছে, স্বাধীনতার আগে যেসব বণিক দ্বীপপুঞ্জে ছিল বোধ হয় তাদের দ্বারা। জাপানী অধিকার কালেও এসব রোগ কিছু এসেছে। এসব ছোঁয়াচে রোগীকে পৃথক করে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না বলে এসব ছড়িয়ে পড়েছে। যক্ষ্মারোগী একই ঘরে অন্যান্য স্বাস্থ্যবান লোকের সঙ্গে একত্র বাস করছে।

অতীতে যে যৌন শিথিলতা ছিল এবং এখনো যা অনেকটাই আছে তার ফলে গনোরিয়া ইত্যাদি যৌন রোগ বিস্তার লাভ করছে।

নিকোবরীদের পুরনো বিশ্বাস এই ছিল যে, সব রোগই ভূতপ্রেতের জন্য হয় এবং ওঝা ডাকিনী চিকিৎসকরা ভূতপ্রেত দমন করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষা বিস্তার ও খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হবার ফলে এসব পুরাতন সংস্কার ও বিশ্বাস অনেক কমে গেছে। এখন কর নিকোবরে একেবারেই কোন ওঝা ডাক্তার নেই। অন্যান্য দ্বীপের অনেক স্থানেই এদের প্রভাব অনেকখানিই কমে গিয়েছে। তবে চাওড়া ও আরো কিছু জায়গায় লোকে এখনো ঝাড় ফুঁক তুক-তাকে বিশ্বাস করে। তাই রোগের বিষয় পুরাতন সংস্কার রয়ে গেছে। ওঝা চিকিৎসকদের রাজত্বও বর্তমান।

ওঝারা বড় মজার লোক। এ ব্যবসা প্রায়ই বংশ পরম্পরায় চলে, যদিও অন্যরাও এই ব্যবসা অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারে। স্ত্রীলোক ওঝাও আছে, তবে তাদের সংখ্যা কম। ওঝারা যে কোন লোককেই শিষ্য করতে পারে, বিশেষ করে যার ইচ্ছা আছে এবং যার ওপর তাদেরও আস্থা আছে। ওঝারা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তাদের ব্যবসাতে যখন গ্রহণ করতে সম্মত হয়, তখন তার দীক্ষার জন্য কোন পূর্ণিমার দিন নির্দিষ্ট করা হয়। যে ব্যক্তির দীক্ষা হবে তাকে একটি নতুন লেঙ্গটি পরানো হয়, হাতে পায়ে রূপার গয়না এবং গলায় কচি কলাপাতা ও কচি শূকরের মাংসের মালা। হলুদ সহ নারকেল তেল তার গায়ে ঢেলে দেওয়া হয়। তাড়ি পান ও ভোজের উৎসবে সারা রাত সমস্ত ওঝা ও ডাকিনী ডাক্তাররা জেগে থাকে। একজন বয়োবৃদ্ধ ওঝা শয়তানকে আহ্বান করে দীক্ষার সময়ে লোকটিকে শক্তি দিতে যাতে সে সর্বদা শয়তানকে অনুকরণ করতে পারে। ওঝারা দাবী করে যে স্বয়ং শয়তান সেই রাত্রে পুরুষের বেশে আসে। তারা আরো দাবী করে যে যখনই ঔষধের আবশ্যক হয় শয়তানের সঙ্গে তারা যোগাযোগ করে এবং শয়তান তাদের প্রয়োজনীয় দাওয়াই দিয়ে যায়।

দীক্ষার শেষে দীক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষণকাল চলে। সে সময়ে তাকে একা রোগী দেখতে দেওয়া হয় না। অভিজ্ঞ ওঝার অধীনে তাকে কাজ করতে হয়। জঙ্গল থেকে ভেষজপত্র ও লতাগুল্ম সংগ্রহ করতে তাকে শেখান হয়। শয়তানকে ডাকা ও ভূতপ্রেতকে শাসন করার পদ্ধতিও তাকে দেখান হয়। যখন অভিজ্ঞ ওঝা ডাক্তাররা বোঝে যে নবদীক্ষিত ব্যক্তি তাদের কলা কৌশল শিখে নিয়েছে তখনই তাকে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করতে দেয়। দ্বীপের সমস্ত ওঝা চিকিৎসকরা ভ্রাতৃত্বের বলিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। চিকিৎসাপত্র এবং অন্যান্য ব্যাপারে তারা পরস্পরকে সাহায্য করে।

নিজেদের পেশায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত না থাকলে ওঝা ডাক্তাররা অন্য লোকেদের মতই পোষাক পরে। গাঁয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মে যোগ দেয়। মিষ্টি আলুর চাষের কাজে তাদের পরিবারবর্গকে সাহায্য করে। ক্ষেত-আবাদের প্রেতাদিকে খাদ্য উৎসর্গ করার কাজে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অন্যান্য দ্বীপে ওঝাদের যাদু বা তুকতাক থেকে রক্ষা করার জন্য যাত্রাকালে গ্রামবাসীদের যাত্রা-সঙ্গীও তাদের হতে হয়।

অন্য লোকের মতই তাদের ঘরবাড়ী, যদিও তারা তাদের পূর্ব-পুরুষ এবং যাদুবিদ্যার মৃত শিক্ষকদের কাষ্ঠ প্রতিকৃতি রাখে, এদের আত্মার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে তাদের শূকর-মুরগী এবং অন্যান্য খাদ্য উৎসর্গ করতে হয়।

সাধারণতঃ দ্বীপের প্রধান ওঝা একা একটি পৃথক বাড়ীতে বাস করে, শয়তানের ধ্যান করে এবং রোগীদের রোগমুক্ত করার নতুন উপায় চিন্তা করে। তার বাড়িটা বলতে গেলে একটি গবেষণা-গারের মত।

ওঝারা যখন রোগীর চিকিৎসায় বের হয়, প্রাচীন পোষাক লেঙ্গটি ছাড়াও তারা কলাপাতার মালা, রোপ্য মুদ্রার মালাও পরে। দুটি হাতেই সাদা কাপড়ের টুকড়া বাঁধে। তাতে রোপ্য মুদ্রা বাঁধা থাকে। অসুখের কারণ খারাপ প্রেতাত্মাদের বিঁধবে বলে তাদের

হাতে ছোট ছুরি থাকে। আর পরে হরেক রকমের টুপি। প্রায়ই ট্রেডিং কোম্পানির দোকানের আধুনিক প্যাটার্ণের টুপি পরে, প্রাচীন পোষাকের সঙ্গে এগুলি বড়ই বেমানান।

তুকতাকের চিকিৎসকরা সাধারণতঃ রাত্রে রোগী দেখে, কারণ শুধু রাত্রেই শয়তান বাইরে আসে। তারা বলে কেউ যখন অজান্তে শয়তানের বাসস্থানে প্রবেশ করে, তখন সে অসুখে পড়ে কারণ শয়তান এক টুকরো পাথর বা লোহা তার শরীরে রাখে, তার ফলে তার খুব ব্যথা ও যন্ত্রণা হয়। তাই চিকিৎসার সময়ে ওঝারা এই সব বাইরের জিনিস যেমন পাথর, লোহার টুকরা, মরিচ, তামাক ইত্যাদি রোগীর দেহ থেকে বার করে এবং রোগী ও তার আত্মীয়দের দেখায়। যখন এসব বাইরের জিনিস শরীর থেকে টেনে বের করে তখন রোগী যেখানে শুয়ে থাকে সেদিকে বাতির ছায়া করে রাখে যাতে শয়তান এসে চিকিৎসায় সাহায্য করতে পারে। ওঝারা যাতে রোগীর দেহ থেকে বাইরের বস্তু টেনে বার করার ছলনা এবং রোগী ও তার স্বজনদের ভালমত প্রতারণা করতে পারে সেইজন্যই তাদের এই ছায়ার আশ্রয় দরকার।

ওঝারা ডাক্তার ও পুরোহিত দুয়েরই কাজ করে। জন্ম-মৃত্যু বিবাহাদির সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত উৎসব-অনুষ্ঠানেই তারা খুব বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে। তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি ঐন্দ্রজালিক জাদু থেকে পৃথক কোন বস্তু নয়। তাদের প্রধান চিকিৎসা হল শুধু বশীকরণ আর ব্যাধির কারণ খারাপ আত্মাদের তাড়িয়ে দেবার ক্রিয়াকলাপ মাত্র।

একটি খুব সাধারণ প্রক্রিয়া হল বিশেষ এক প্রকার পাতা গৃহের মধ্যে বা গৃহের প্রবেশপথে কচি নারকেল পাতার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া। বিভিন্ন প্রকারের পাতা বিভিন্ন রোগকে দূর করে বলে বলা হয়। রোগ নিরাময়ের জন্য মাঝে মাঝে বিশেষ এক প্রকারের গাছের গুঁড়ির থাম বাড়ির বাইরে পোতা হয়।

সর্পাঘাত দূরীকরণের জন্য ছোট একটি সাপের প্রতিকৃতি করে

ঘরের মধ্যে রাখে। চুণ মিশিয়ে তাকে খাদ্য উৎসর্গ করা হয় যাতে যে সাপটা কামড় দিয়েছে তার বমি বমি ভাব হয় এবং তার বিষের ক্রিয়া নষ্ট হয়।

কখনো কখনো ওঝারা দাবী করে যে তারা একদল আত্মাকে দেখতে পায় যারা আক্রমণ করলে লোকেরা অসুখে পড়ে। এটা ঘটলে 'সওয়াচ' নামে তরুণ বৃক্ষ কেটে তার গুঁড়িতে থাম তৈরী করে সমুদ্রতীরে পোঁতে এবং কচি নারকেল পাতা ও অন্যান্য পত্রসজ্জায় থামটিকে সুশোভিত করে।

সর্বপ্রকার অসুখে রূপোর তারের গয়না হাতে পায়ে পরলে আরোগ্যের পথে সহায়ক হয় বলে ওদের বিশ্বাস। ছোট ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে ছুরির আকৃতি করে এবং লাল রঙে চিত্রিত করে নিরাময়ের সহায়ক হবে বলে রোগীর আশেপাশে রাখে।

প্রায়ই বলা হয় যে ভুল গাছের পাশে মূত্র ত্যাগ করে বৃক্ষ নিবাসী ভূতকে অসন্তুষ্ট করার ফলে রোগ হয়। এসব ক্ষেত্রে ওরা ভূতের উদ্দেশ্যে গাছের পাশে খাদ্য রেখে আসে।

বছরে একবার ওঝারা লোকেদের সাধারণ স্বাস্থ্যের জন্য ভূত তাড়ানোর উদ্দেশ্যে উৎসব অনুষ্ঠান করে। ওই দিন অনেক শূকর মারা হয়। নারকেল পাতার সজ্জায় জনপদ সাজানো হয়। মিষ্টি আলু ও কলা দিয়ে তৈরী হালুয়ার মত একটি জিনিস কলাপাতায় মুড়ে, শূকরের মাংস বিশেষ করে যকৃত, হৃদপিণ্ড এবং মূত্রাশয় এই সব গাঁয়ের চারদিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। দিন কয়েক ঝুলিয়ে রাখার পর এই সব জিনিস ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। তারপর লোকেরা লম্বায় ত্রিশ ফুট আন্দাজ একটি ভেলা তৈরী করে। ভেলাটিতে কিছু ছোট শুকনো লাঠি খাড়া করে বেঁধে দেয় ও কিছু শুকনো নারকেল পাতা ওর সঙ্গে বেঁধে মশালের মত জ্বালিয়ে দেয়। ভেলাটি কচি নারকেল পাতায় সাজানো হয়। সন্ধ্যাবেলা ভেলাটিকে খোলা সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে আসে, যেন রোগ ব্যাধি ও ভূতপ্রেতকে দ্বীপ থেকে নির্বাসনে পাঠানো হল।

তারপর তিন চার দিন ধরে তারা নাচ, গান, উৎসব, আনন্দ করে।

কঠিন রোগ হলে রোগীর আত্মীয় বন্ধুগণ রাতভোর তার পাশে বসে গান করে। যদি কেউ খুব বেশি অসুস্থ হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখী হয় তখন তাকে সাদা কালো কাপড দিয়ে বোনা কচি নারকেল পাতার শয্যায় চিৎ করে শুইয়ে দেওয়া হয়। কচি নারকেল পল্লব তার চারপাশে ও তার দেহে রাখা হয়। তারপর তার গায়ে নারকেল তেল ঢেলে দেওয়া হয়। মুরগীর পালক কিনারার দিকে জ্বালিয়ে কচি ডাবের ওপর রাখে। যখন পালক সম্পূর্ণ পুড়ে যায় তখন কচি ডাব অর্দ্ধেক করে কেটে ফেলা হয়। রোগীকে তখন উঠিয়ে অন্যত্র শোয়ান হয় এবং নারকেলের শয্যা অন্যান্য কচি ডাবের সঙ্গে তুলে নিয়ে সমুদ্রে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। কিছু পাতা তেলের সঙ্গে মিশিয়ে রোগীর গায়ে মাখান হয়। কখনো-বা এই পদ্ধতিতে রোগী নিরাময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে খুব কমই হয়, প্রায়ই রোগী পরপারে যাত্রা করে।

ভীষণ মারাত্মক দুর্ঘটনাও শয়তানের দ্বারা সঙ্ঘটিত হয়। এসব ক্ষেত্রে বেঁচে যাওয়া রোগীকে পাতার মুকুট তৈরী করে মাথায় পরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর একটা কুকুরকে ধরে তার কান ফুটো করে মাটির পাত্রে রক্ত জমা করে রাখা হয়। রক্ত পল্লব মুকুটে ছিটিয়ে দিয়ে মুকুটটি সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। লোকে বিশ্বাস করে শয়তান কুকুরের এত রক্তপ্রিয় যে কুকুরের রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে মুকুটটা সমুদ্রে ফেলে দিলে সে ওটাকে আক্রমণ না করে পারে না। দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিকে তো আগে থেকেই শয়তানে ভর করে, এতে শয়তানকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এইসব যাদু ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে ওরারা জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা শিকড়বাকর থেকে এক রকম দেশী ঔষধ তৈরীর পদ্ধতি অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে। ব্যাধি সৃষ্টিকারী ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য রকমারী ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে

প্রায়ই এইসব ওষুধপত্রও দেওয়া হয়। এই সব দেশী ওষুধের নিশ্চয় কোন উপকারীতা আছে, কারণ কর নিকোবরে পর্যন্ত যেখানে বর্তমানে কোন ওঝা বা যাতুকর ডাক্তার নেই সেখানেও লোকের এই সব ওষুধে বিশ্বাস আছে। গুটি কয়েক শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ লোকই প্রথমে দেশী ওষুধ খায়।

ভেষজ শিকড়বাকর, লতাগুল্ম, জল—নারকেল তেল এবং শূকর চর্বির মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়। কিছু ওষুধ খায় আবার কিছু ওষুধের ব্যথা-বেদনার জন্য প্রয়োগ করে। সর্বপ্রকার রোগে ও আরোগ্য কালে শূকরের মাংস, বিশেষতঃ কচি শূকরের মাংস, স্টু করে খাওয়ায়। কচি ডাবের জলও প্রচুর পরিমাণে পান করার ব্যবস্থা প্রচলিত।

সাম্প্রতিককালে নিকোবরীদের জন্য আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির অনেক উন্নতি হয়েছে। বৃটিশ শাসনকালে এর প্রথম সূচনা। কর নিকোবরে মাস গ্রামে একটি ছোট ডিসপেনসারী খোলা হয় এবং বিশপ রিচার্ডসন এর কম্পাউণ্ডার হন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের কয়েক বছর আগে ডিসপেনসারীটিকে একটি হাসপাতালে পরিণত করা হয় এবং মিশনারী ডাক্তারদের সহায়তায় এটি চলতে থাকে।

স্বাধীনতার উত্তর কালে এই সব দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। কর নিকোবরে এখন একটি হাসপাতাল আছে, তাতে একজন ডাক্তার অধিকর্তা আর একজন কম্পাউণ্ডার। এই হাসপাতালে পঁচাত্তর জন রোগীর চিকিৎসা হতে পারে। কর নিকোবরের মত দ্বীপের আকার ও লোকসংখ্যার তুলনায় এখানে খুব ভাল ওষুধপত্র ও ব্যবস্থাদি আছে। এমন কি রঞ্জন রশ্মি প্রযোগ ও ছোট খাট অস্ত্রোপচার করার ব্যবস্থাও আছে। ছোঁয়াচে যক্ষা রোগের জন্যও আলাদা ওয়ার্ড আছে, যেটি মাইল খানেক দূরে সমুদ্রের কাছাকাছি মালাকা গ্রামে অবস্থিত।

হাসপাতাল ছাড়াও আরও ও বড় লাপাটি গাঁয়ে দুটি ডিসপেনসারী

সহ মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দূর গ্রাম থেকে রোগীদের আনার জন্য একটি আম্বুল্যান্সও দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য দ্বীপে জনবসতি ছড়িয়ে আছে। ফলে সব লোকের জন্য ডাক্তারি সুবিধার ব্যবস্থা করা শক্ত। তবু কামোরটাতে হেড কোয়ার্টার এলাকায়ও কুড়িটি সীট সহ একজন ডাক্তারের অধীনে একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে। তাছাড়া কামোরটা দ্বীপে পিল পিল্লাউ এবং কাকানাতে একটি ডিসপেনসারী, কাচাল দ্বীপে কাপাঙ্গা, ওয়েষ্ট বে কাচালে এবং চাওড়া, টেরাসা, পুল্লোমিল্লো, কোন্দুলে একটি করে ডিসপেনসারী খোলা হয়েছে।

ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সমুদ্র যখন শান্ত থাকে অস্ট্রেলিয়ার দেওয়া একজন ডাক্তার সহ একটি হাসপাতাল জাহাজ দ্বীপের মধ্যে গড়ে সপ্তাহে একদিন করে প্রধান সব স্থানে যাতায়াত করে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে যত চিকিৎসার সুবিধা আছে তাতে যদি রোগী না সারে, তবে সরকারী খরচে তাকে পোর্ট ব্লেয়ার পাঠান হয়। সেখানে বড় হাসপাতালে ভাল চিকিৎসার সুবিধার জন্য। এই সব দ্বীপে বিনামূল্যে সরকারী চিকিৎসার ব্যবস্থা। হাসপাতালের রোগীদের বিনামূল্যে পথ্যও দেওয়া হয়।

কর নিকোবরে সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের স্বাস্থ্য বিধি প্রকল্প যেমন কুয়াগুলির জীবাণু নষ্ট করা, পাশ ইঁদারা নির্মাণ, স্নানাগার ও পায়খানা তৈরী করা, টনিক, পুষ্টিকর খাদ্য, ভিটামিন ট্যাবলেট ইত্যাদি দেওয়ার ফলে লোকেদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হচ্ছে।

তাছাড়া ১৯৬৪ সাল থেকে চোখের জন্য রিলিফ ক্যাম্প এবং যৌন রোগ দূর করার প্রচেষ্টাও খুব ফলপ্রসূ হয়েছে। তবে এরকম ক্যাম্প ও আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। অন্যান্য দ্বীপে এধরণের কার্যকলাপ বৃদ্ধির আবশ্যকতাও অনেক।

দ্বীপপুঞ্জে ম্যালেরিয়া ও গোদ বিরোধী কাজও খুব ফলপ্রদ হয়েছে। কর নিকোবরে এসব রোগের ভীতি এখন আর নেই। মশারীর নীচে ঘুমালে মোটামুটি এসব রোগের ভয় থেকে নিরাপদেই থাকা

যায়। অন্যান্য দ্বীপে আরো কাজ করা এখনো বাকী। চাওড়া ও টেরাসসাতে ম্যালেরিয়া ও গোদের এখনো খুবই প্রাদুর্ভাব। হাতীর মত ফোলা পা অনেক দেখা যায়। এসব দ্বীপেও ম্যালেরিয়া ও গোদ বিরোধী কাজ এখন সুরু হয়েছে। এসব রোগ ক্রমে ক্রমে কমে আসছে।

কয়েক বছরের মধ্যে নিকোবরীরা বিশেষ করে কর নিকোবরীরা আধুনিক ওষুধপত্র ব্যবহার করতে সুরু করেছে, এটা সত্যিই বিস্ময়কর। অনেকেই এখনো প্রথমে তাদের দেশী ওষুধপত্র ব্যবহার করে। যদি দু'এক দিনের মধ্যে কাজ না হয় তবে তারা ডিসপেনসারী বা হাসপাতালে চলে যায়। শিক্ষিত কিছু লোক দেশী ওষুধ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেছে এবং ক্রমে ক্রমে এদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শুধু অনুন্নত অঞ্চলে বিশেষ করে চাওড়া ও টেরাসসাতে যেখানে ওঝা ও যাদুকর ডাক্তররা এখনো সর্বময় সেখানে লোকেরা আধুনিক চিকিৎসায় বাধা দেয়। এসব অঞ্চলে লোকের স্বাস্থ্যও অন্যান্য স্থানের লোকের স্বাস্থ্যের তুলনায় বেশ খারাপ। তবে আশা করা যায় শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা আধুনিক চিকিৎসার মর্ম বুঝবে এবং আধুনিক ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণ করবে।

বাস্তবিকই নিকোবরীদের স্বাস্থ্যকর বহির্জীবন উপভোগ করার এবং দারিদ্র্যজনিত রোগ থেকে মুক্ত থাকার জন্য এত সুবিধা আছে যে যদি এসব দ্বীপে রোগ ব্যাধি দূর করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা করা হয় এবং লোকে আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর সুবিধা গ্রহণ করে, তবে উত্তম স্বাস্থ্যের আশীর্বাদ এরা উপভোগ করতে পারবে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শিক্ষা

নিকোবরীদের কাছে এই সবে শিক্ষার সুযোগ এসেছে। অতীতে তাদের নিজস্ব কোন শিক্ষাপদ্ধতি ছিল না। দৈনন্দিন কাজের জন্য যত যোগ্যতারই প্রয়োজন হোক না কেন, বড়দের সঙ্গে কাজ করে, তাদের কাজ লক্ষ্য করেই ছোটরা তা শিখে নিত। বৃটিশ শাসন-কালেও এই আদিবাসীদের শিক্ষার প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয়নি। মিশনারী পরিচালিত একটি স্কুলই শুধু কর নিকোবরের মাস গ্রামে ছিল। এই স্কুলেও ছাত্র সংখ্যা খুব কমই ছিল।

তাই স্বাধীনতার পর সরকার নিকোবরীদের শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য বিশেষ জোর দিয়েছেন। কর নিকোবরে কাকানা, মালাকৃকা, টাসালু, কিন্যুক, বড় লাপাটি, মাস, টিটপ, সারাই, আরঙ ও কাইমুস গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। দ্বীপের সমস্ত গাঁয়েরই এতে সুবিধা হযেছে। বড় লাপাটি গ্রামে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের সংলগ্ন দু'টি হোস্টেল—একটি ছেলেদের, অন্যটি মেয়েদের। দ্বীপের সব জায়গা থেকে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য জায়গা থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা এসে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেতে পারে। তার জন্যই এই হোস্টেলের ব্যবস্থা।

অন্যান্য দ্বীপে বিদ্যালয়ের অবস্থা ততটা সন্তোষজনক নয়। চাওড়াতে স্কুল সুরু করার অনেক বাধা ছিল। কিন্তু আবেদ নেগো বলে একজন কর নিকোবরী শিক্ষকের প্রশংসনীয় কাজের ফলে প্রায় সত্তর জন ছাত্র নিয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে। স্কুলে যাবার মত বয়সের যত শিশু এই দ্বীপে আছে সেই তুলনায় এই স্কুলের ছাত্রসংখ্যা খুবই কম।

বাকি দ্বীপগুলির জনসংখ্যা ছড়িয়ে আছে বলে স্কুলে যাবার

উপযোগী সমস্ত শিশুদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া খুব শক্ত। স্কুলগুলি খুব উদারভাবেই খোলা হয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেশি। তবু এই দ্বীপে কয়েকটি কুটির নিয়ে এক একটি পৃথক গ্রাম। তাই সেই কয়েকটি কুটিরের জন্য একটি করে পৃথক স্কুল করা সম্ভব হয়নি। একটি মাঝামাঝি জায়গায় একটি পৃথক স্কুল স্থাপিত হলেও যাতায়াতের অসুবিধার জন্য দূর দূর থেকে এসে শিশুদের পক্ষে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। জনগণের প্রাচীনপন্থী মনোভাব এবং আধুনিক শিক্ষার তাৎপর্য্য বোঝার অক্ষমতা স্কুল চালনোর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদার মনোভাব নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রামে একটি স্কুল খোলা হল। ভারতের মূল ভূখণ্ডের মত স্কুল খোলার উপযোগী ছাত্র সেখানে নেই, সেই গ্রামেরই স্কুলে যাবার বয়সী শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যায় না। স্বাভাবিক দৈনিক হাজিরা মাত্র পাঁচ থেকে দশটি শিশুর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তখন এই স্কুলের জন্য একজন শিক্ষককে রাখা অপব্যয়। ফলে স্কুলটি চালাবার জন্য এত টাকা খরচ করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না; কাজেই স্কুলটি বন্ধ করে দিতে হয়। তবু এই সব কারণ সত্ত্বেও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় এই দ্বীপে স্থাপিত হয়েছে। টেরাস্সাতে দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে একটি মাইনিয়ুকা, অন্যটি বেঙ্গালিতে। কামোরটাতে চারটি স্কুল, একটি কাকানাতে, একটি পিল পিল্লাউতে, একটি দারিং গ্রামে এবং একটি কামোরটা হেড কোয়ার্টারে। কাচালে চারটি স্কুল—কাপাঙ্গা, জনসন, ইষ্ট বে কাচাল এবং ওয়েষ্ট বে কাচালে। দুটি ছোট দ্বীপ পুলোমিল্লা এবং কোন্দুলে একটি করে স্কুল।

নান কাউরি দ্বীপের চাম্পিনে একটি সিনিয়র বুনিয়াদি বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। দূর থেকে এবং অন্য দ্বীপ থেকে ছাত্ররা যাতে আসতে পারে সেইজন্য এই স্কুলের সংলগ্ন একটি ছাত্রাবাসও স্থাপিত হয়েছে।

সরকার কর্তৃক নিকোবরীদের অন্যান্য যে সব সুবিধা দেওয়া

হয়েছে তাতে বিনামূল্যে বই ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেওয়া হয়। হোস্টেলের ছাত্রদেরও নানা রকমভাবে সাহায্য দেওয়া হয়। দুপুরের আহার এবং যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তিও দেওয়া হয়। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কোথাও ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হয় না।

খেলাধূলা ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়েও মনোযোগ দেওয়া হয়। অতীতে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষা ব্যবস্থা এত অনুন্নত ছিল বলে সরকার লোকের শিক্ষানুরাগ বাড়াবার কতকগুলো বিশেষ সুবিধা দিচ্ছেন যাতে দেশের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তারাও দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাকা দালান। স্কুলের সময় সাধারণতঃ সকাল সাড়ে আটটা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত। দুপুরে খাবারের জন্য ছুটি। প্রার্থনার সঙ্গে প্রতিদিনের কাজ সুরু। তারপর ক্লাশ। গণিত, নিকোবরী, হিন্দী, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান এবং ড্রইং শেখান হয়। ক্লাশের পর ছাত্ররা দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গায়। তারপর কর নিকোবরের সমস্ত স্কুলে বাগান করার জন্য ক্লাশ হয়। অন্যান্য দ্বীপে কয়েকটি স্কুলে ছোট বাগানও করা হয়েছে। কোন কোন স্কুলের সংলগ্ন খেলার মাঠ। খেলা-ধূলায়ও খুব উৎসাহ দেওয়া হয়। কর নিকোবরের স্কুলগুলিতে প্রতিদিন শরীর রক্ষা শিক্ষার ক্লাশ হয়। এটা ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ জাগাবার পক্ষে খুব সহায়ক হয়েছে। শারীরিক শিক্ষার ফলে তারা বেশ চটপটেও।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম নিকোবরী ও হিন্দী। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা নিকোবরী, ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকেও কেউ কেউ এসেছেন। বিশেষ করে কর নিকোবরী শিক্ষকরা অন্যান্য দ্বীপে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে স্কুল পরিচালনাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছেন। সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও কর নিকোবরে অধিকাংশ গ্রামে এবং অন্যান্য দ্বীপে একটি দুটি স্থানে

গীর্জ্জা দ্বারা পরিচালিত বেসরকারী স্কুল আছে। এই সব স্কুলের শিক্ষকরা পাদরী। তাঁরা নাম মাত্র বেতনে স্কুলের কাজে নিযুক্ত। ধর্মগ্রন্থ শিক্ষার জন্যই বেশির ভাগ তাঁরা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। দ্বীপের সমস্ত শিশুদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য যখন সরকারী স্কুল রয়েছে তখন বেসরকারী স্কুলের কোন প্রয়োজনই নেই। তবে আমাদের দেশের ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করার জন্যই সরকারী স্কুলে কোন ধর্মীয় শিক্ষা চলতে পারে না। গির্জ্জা সংঘ শিশুদের প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষা দেবার জন্যই স্কুল খুলতে আরম্ভ করেছে।

এই সব স্কুলে গণিত, নিকোবরী, ইংরাজী ও ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রার্থনা ও স্তোত্রও শেখান হয়। সরকারী প্রাথমিক স্কুল ও ধর্মীয় স্কুলের ঠিক একই সময়।

নিকোবরীরা এই স্কুলগুলিকে তাদের ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মনে করে বলে তারা বেশির ভাগ ছেলেপিলেদের এসব স্কুলে পাঠায়। তাই সরকারী বিদ্যালয় থেকে এসব স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বেশি। নিকোবরী পিতামাতারা সাধারণতঃ তাদের শিশুদের প্রথমে এই স্কুলে দেয়। এসব স্কুলে শুধু দুটো ক্লাশ। শিশুরা এই দু'ক্লাশ পাস করলে মা-বাবারা তাদের যদি আরো পড়াতে চায়, তবে তাদের সরকারী স্কুলে দেয়। শিশুকে সেখানে আবার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে পড়া শুরু করতে হয়। সরকারী স্কুলে ভর্ত্তির সময় পরীক্ষা নেওয়া হয়। তাতে এক বা দু' বছর নষ্ট হয়। এটি একটি প্রধান কারণ যার জন্য নিকোবরী শিশুরা বিভিন্ন ক্লাশে ভারতের মূল ভূখণ্ডের শিশুদের চেয়ে একটু বেশি বয়সেই পড়ে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার জন্য সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ থেকে ছাত্রদের কর নিকোবরে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে আসতে হয়। স্কুল গৃহটি একটি নতুন প্রশস্ত অট্টালিকা, আসবাবপত্র ও গ্রন্থাগারে সুসজ্জিত। স্কুলের জন্য একটি খেলার ময়দানও তৈরী হচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় সকাল নয়টা থেকে বিকাল তিনটা পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল দিল্লীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের

সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে যে সব বিষয়ে পড়ানো হয় তা হল ইংরেজী, হিন্দী, গণিত, সমাজতত্ত্ব, ভূগোল ও ইতিহাস, ড্রইং ও সংস্কৃত। শিক্ষার মাধ্যম হিন্দী ও ইংরেজী। এই স্কুলের শিক্ষকগণ ভারত ভূখণ্ডের। কারণ এখন পর্যন্ত নিকোবরীদের শিক্ষার মান এতদূর অগ্রসর হয়নি যাতে এই ধরনেব শিক্ষক এদের মধ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রদের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও জোব দেওযা হয। এতে সাধারণতঃ নিকোবরীরা খুবই ভাল করে।

এটি দুর্ভাগ্যই বলতে হবে যে এ পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার কোন সুবিধা নেই। নিকোবরীরা স্বভাবতঃই যন্ত্র চালনা করতে খুব দক্ষ। এতে তাদের যথেষ্ট নৈপুণ্যও আছে। তাই যদি তারা বিজ্ঞান শিক্ষাব সুযোগ পায তাদের অনেকেই ভবিষ্যতে কারিগরীর কাজ গ্রহণ করবে এবং এতে তারা খুব ভালও করবে।

শিক্ষা প্রসার সূচীর প্রভাব নিকোবরীদের উপর কতটা পড়েছে তা নির্ণয করা শক্ত। স্কুলগুলি খোলাতে খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপের মান যে উন্নত হযেছে সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই। নিকোবরী ছাত্ররা (যারা এ বিষযে খুবই প্রতিভাসম্পন্ন) শিক্ষার নানা প্রকার সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছে। শিশুদের চলাফেরা অনেক সপ্রতিভ হযেছে। তাদের ব্যবহারও অনেক মার্জ্জিত হযেছে। নিকোবরী ছেলেমেযেরা সুনিয়ন্ত্রিত। স্কুলের শিক্ষা তাদের মধ্যে অনেক শৃঙ্খলা এনেছে। শিক্ষার ফলে লোকের দৃষ্টিভঙ্গীরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন তারা নতুন ভাবধারা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। বহির্জগতে কি ঘটছে না ঘটছে তা জানবার জন্য আগের চেয়ে আজকাল অনেক বেশী উৎসুক। স্কুলের শিক্ষার ফলে লোকেরা দেশের অন্যান্য অংশে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানবার জন্য আরো বেশি আগ্রহান্বিত। এর ফলে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তাদের অধিকতর ভাবগত ঐক্য সম্ভব হচ্ছে।

নিকোবরীদের নানা বিষয়ে শিক্ষার মান এখনো ততখানি হয়নি। এই দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষিত একটি ছাত্রও এ পর্য্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি। মূল ভূখণ্ডে পাঠরত কোন কোন নিকোবরী ছাত্রের উন্নতি হযেছে অনেক বেশী। এই সব ছাত্রদের বেশির ভাগই নিকোবরীরা নিজেদের পযসাতেই পাঠিযেছে। তারা সাধারণতঃ বিহারের রাঁচীতে যায কারণ সেখানে তারা অনেকটা নিজেদের রাজ্যের মত আবহাওযা পায। এরকম একটি ছাত্র বি. এ. পাশ পর্যন্ত করে এখন গির্জ্জার কাজে নিযুক্ত।

নিকোবরীদের বিদ্যালয়ের পাঠের ক্ষেত্রে উন্নতি না হবার নানা কারণ। প্রথমতঃ নিকোবরী শিশুদের অনেক বিষয়ে যা পড়ানো হয় তা ভারতের মূল ভূখণ্ডের বা অন্য জাযগার বিষয়ের ওপর লেখা। এসব বিষয়ের পরিষ্কার ধারণা করা তাদের পক্ষে খুবই শক্ত। এই সব দ্বীপের অবস্থা মূল ভূখণ্ডের অবস্থা থেকে একেবারে আলাদা। অধিকাংশ নিকোবরীদের এমন অনেক জিনিসই হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, যা ভারতের মূল ভূখণ্ডের একটি শিশু চোখে দেখে বা দৈনন্দিন জীবনের সংস্পর্শে এসে খুব সহজেই শেখে। শিশুরা বইতে যা পড়ে তা বুঝতে ছায়াছবি অবশ্য অনেক সাহায্য করেছে। তবু অধীত বিষয়ের প্রতিটি বস্তুর ধারণা করা তাদের পক্ষে কঠিন, কারণ এসব তাদের জীবন থেকে একেবারে আলাদা।

নিকোবরী শিশুদের বয়স গড়ে এত বেশি যে শিক্ষার সুবিধার পূর্ণ সুযোগ তারা খুব কমই গ্রহণ করতে পারে। পিতামাতা তাদের একটু দেরীতেই স্কুলে পাঠায়। তাছাড়া অনেক ছাত্রই দু'এক বছর ধর্মীয় স্কুলে পড়ে আসে, তাতে সরকারী স্কুলে যথার্থ পাঠ সুরু করার সময়ে তাদের বয়স বেড়ে যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দশ এগার বছর বয়সের ছেলে এবং বার তের বছরের মেয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় ক্লাশে পড়ছে এরকম পাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিশ পঁচিশ বছর বয়সের ছাত্রও আছে। নিকোবরী ছাত্রদের মধ্যে যারা বেশ বড়, শিক্ষা শেষ হবার আগেই তারা বিয়েথাওয়া করে

ঘর সংসার পাতে। তাই উঁচু ক্লাশে খুব কম ছাত্রই থেকে যায়। মন দিয়ে লেখাপড়া শিখছে এমন ছাত্রের সংখ্যা খুবই কম।

তাছাড়া উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে নিকোবরী ছেলেমেয়েরা অবিচ্ছিন্ন মনোযোগ দিতে পারে না। মনও একাগ্র করতে ওরা অপারগ। সাধারণতঃ নিকোবরীরা ধীর মন্থর গতিতে চলে। তাদের ছেলে-মেয়েরাও মূল ভূখণ্ডের ছেলেমেয়েদের মত পড়াশুনার জন্য কঠোর শ্রম করতে অসমর্থ।

ছাত্রদের অনিয়মিত হাজিরা তাদের পড়াশুনার উন্নতির পক্ষে একটা বড় রকমের বাধা। অনেক শিশুদেরই মা-বাপের দৈনন্দিন কাজে কম বেশি সাহায্য করতে হয়। ফলে তারা প্রায়ই স্কুলে আসতে পারে না। তাছাড়া বড়দের মতই নিকোবরী শিশুদের স্কুলে আসার চেয়ে গাঁয়ের নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদের প্রতিই বেশি আকর্ষণ। গাঁয়ে উৎসব-অনুষ্ঠান লেগেই আছে। নিকোবরী শিশুরাও সেই সুযোগে স্কুলে অনুপস্থিত থাকে। স্কুলে যখন আসে তখনও স্কুল ছুটির পর তাদের ঘরের কাজ করতে হয়। ফলে স্কুলে যা পড়ে সেই পাঠের অভ্যাস করার প্রচুর অবসরই তারা পায় না। মা-বাপ পড়াশোনা জানে না বলে শিশুদের প্রয়োজন হলে বাপ-মায়ের সাহায্য পায় না। তাতেও তাদের বাড়ীতে পাঠাভ্যাসের অসুবিধা হয়।

সবচেয়ে বড় কথা এই কারণেই নিকোবরী ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় ভাল করার বিশেষ প্রেরণা পায় না। তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি তাদের শিক্ষার উপর নির্ভর করে না। তাদের মৌলিক প্রয়োজন যৌথ পরিবারই মিটিয়ে দেবে, তাদের এই নিরাপত্তাবোধ আছে। তারা জানে গ্রামে সাধারণ কাজ করেই তাদের খাওয়া-পরা ভালভাবেই চলে যাবে।

সরকার কর্তৃক বিশেষ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বেও সরকারী শিক্ষা প্রসার কার্যসূচী থেকে নিকোবরীরা এখন পর্যন্ত আশানুরূপ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে নি।

প্রকৃতপক্ষে নিকোবরে বর্ত্তমান শিক্ষা সূচী একটি অদ্ভুত কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। এসব দ্বীপে সীমাবদ্ধ কয়েকটি সরকারী চাকুরি। তাও গ্রহণ করার মত শিক্ষার মান-ও যোগ্যতা নিকোবরীরা এখনো অর্জন করতে পারে নি। এদের মধ্যে খুব অল্প কয়েকজন স্কুলের শিক্ষা শেষ করে নিম্নতর কিছু কাজ করার মত যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে যেমন গ্রামসেবক, প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, ড্রাইভার ইত্যাদির কাজ। এমন কি কেরাণীর কাজ করার মত লোকও এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অন্য দিকে অধিকাংশ ছাত্র যারা স্কুলে পড়ছে তারা কোমল পেলব হযে পড়ে এবং শারীরিক শ্রম বিমুখ হয়। তারা গাঁযের মাঠেঘাটে ক্ষেতে-খামারে নিজের হাতে কোন ঠোস কাজ করার চেয়ে বেশবাসের পারিপাট্য ও নিজেদের চেহারার খিদমদ করার দিকে বেশি নজর দেয। এইভাবে একদিকে ভাল চাকুরি পাবার যোগ্যতা তারা অর্জন করতে পারে না, অন্যদিকে গাঁয়ের কাজ করার পক্ষেও তারা অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। অথচ তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মিটাবার জন্য তাদের আরও অনেক বেশী কাজ করা উচিত। আজকাল পিতামাতারা স্কুলে যাতায়াতকারী ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাতে চাইছেন না। কারণ তাদের ভয় এতে ছেলেমেয়েরা কাজ তো শিখবেই না, উপরন্তু বোঝা হয়ে পড়বে এবং ক্ষেত-আবাদ দেখা, মাছ ধরা বা গৃহ কার্য করা এসব কিছুই করতে পারবে না।

অবশ্য নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষা কার্যসূচীর সঠিক বিচার করার সময় এখনো আসেনি। স্বাধীনতার পূর্বে নিকোবরীদের কোন শিক্ষা প্রায় ছিলই না। তাই শিক্ষার নতুন কার্যসূচীর পূর্ণ প্রভাব পড়তে কিছু সময় নেবেই। এখন যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে পরিবর্তনের সময়ে সব জায়গাতেই যেমন দেখা যায় বোধ হয় সেই রকমই। ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রবর্তিত শিক্ষাসূচী অভিজ্ঞতার সাহায্যে পরিবর্তন করে ওদের প্রয়োজন মিটাবার উপযোগী করতে

হবে। বিশেষ করে এই সব দ্বীপে শিক্ষার মান উন্নত করতে নিকোবরী ভাষায় ভাল পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা দরকার। শ্রাব্য ও দৃশ্য শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রয়োগ অনেক বেশি কার্য্যকরী হবে।

আনন্দের বিষয় এই যে কর নিকোবরে কোন কোন ছোট ক্লাসে কয়েকটি ভাল ছেলে এখন আছে যারা পড়াশুনায় যথার্থই অনুরাগী এবং যারা নিয়মিতই স্কুলে যায়। এরা উঁচু ক্লাসে ভাল করবে বলেই মনে হয়। এসব দ্বীপে বড় সরকারী চাকুরি পাবার মত যোগ্যতাও অর্জন করবে এবং সবচেয়ে বড় কথা ভবিষ্যতে তারা নিকোবরীদের প্রয়োজনীয় নেতৃত্বও দিতে পারবে। এও সম্ভব যে বাগান করার ক্লাশ সুরু করে শারীরিক শ্রমের প্রতি জোর দেওয়াতে শ্রমের মূল্য সম্বন্ধে চেতনা জাগবে। শিক্ষিত লোক মনে করবে যে স্কুলের শিক্ষা তাদের নিয়মিত দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রতিবন্ধক নয় বরং উন্নতির সহায়ক। কয়েক বছর আগে যে শিক্ষাসূচী আরম্ভ হয়েছে ভবিষ্যতে তা নিকোবরীদের উপকারে আসবে—এটা আশা করা অযৌক্তিক নয়। এতে তাদের মানসিক বিকাশ হবে এবং ভবিষ্যৎ উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভের পথে তাদের অধিকতর যোগ্য করে তুলবে।

চতুর্দশ অধ্যায়

খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক

নিকোবরীরা খেলাধুলা ভালবাসে এবং জীবনের সব কিছুতেই আমোদ-প্রমোদ খোঁজে। ক্রীড়ানুষ্ঠানে এদের অফুরন্ত প্রতিভা। যে কোন নূতন খেলাই তারা খুব সহজে শিখে নিতে পারে। বর্ত্তমানে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে নৌকো বাইচ, শূকরের লড়াই, কুস্তি, লাঠি খেলা ইত্যাদি পুরানো ক্রীড়া ছাড়াও ফুটবল, ভলিবল ইত্যাদি অন্যান্য খেলাও আছে।

নিকোবরীদের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য ও চিত্তাকর্ষক ক্রীড়ানুষ্ঠান নৌকো বাইচ। কর নিকোবরে এটি প্রধান খেলা। চাওড়া ও নান কাউরিতেও এই খেলা কিছুটা চলে।

সর্বদা দুটি গাঁয়ে প্রতিযোগিতা চলে। কোন গ্রামের বাসিন্দারা যদি আগে থেকে প্রস্তুত হতে পারে এবং ভাল বাইচের নৌকা সংগ্রহ করতে পারে তবে তারা অন্য গাঁয়ের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় নামতে চায়। সেই গ্রামের বয়স্করা অন্য গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। যে দিন সমুদ্র শান্ত থাকবে বলে আশা করা যায়, পারস্পরিক কথাবার্তার পরে এমন একটি দিন বাইচ খেলার জন্য নির্দ্ধারিত করা হয়।

খেলার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রিত গ্রাম থেকে যারা ক্রীড়ায় যোগদান করবে তারা নিমন্ত্রণকারী গ্রামে আসে। বাইচের নৌকো সমুদ্র পথে যথাস্থানে আনা হয়। যদি সমুদ্র অশান্ত থাকে বা স্রোত প্রবল থাকে তবে নিজেরাই নৌকো বয়ে নিয়ে আসে। (প্রায় ৪০।৫০ জন লোকের প্রয়োজন হয় নৌকোর নীচে খুঁটি লাগিয়ে প্রতিটি নৌকো বহন করে নিয়ে আসবার জন্য)। নিমন্ত্রণকারী গাঁয়ে পৌঁছে নিমন্ত্রিতরা সেই গাঁয়ের 'এলপানাম' বা সার্বজনীন গৃহে অবস্থান করে। অতিথিদের দেখা শোনার ভার নিমন্ত্রণকারী

গাঁয়ের বিভিন্ন পরিবারের উপর ন্যস্ত। রাত্রে উৎসব, তাড়ি পান, গান ইত্যাদি খুব চলে।

পরের দিন বাইচ খেলা। সাধারণতঃ মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিকালবেলা খেলা সুরু হয়। বাইচ খেলা দেখার জন্য সমস্ত পল্লী সমুদ্রতীরে এসে জমা হয়। সেখানে প্রচুর উত্তেজনা ও উৎসব-পূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। বাইচের নৌকোগুলি পাশে ও গলুইতে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করা হয়। দেখতে মনোরম লাগে। কচি কলা-পাতা দিয়ে আরো সুন্দর করে সাজানো হয়। খেলায় অংশ-গ্রহণকারীরাও রঙীন পোষাক পরে। গলায় মালা, ফুল, নারকেল ও কলাপাতার মুকুট পরে।

একটি গাঁয়ের একটি নৌকোকে অপর গাঁয়ের আর একটি নৌকোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামানো হয়। প্রতি নৌকোয় চল্লিশ জন করে লোক থাকে। প্রতি গাঁয়ের পাঁচ থেকে নয়টি নৌকোকে প্রতিযোগিতায় নামানো হয়। প্রত্যেক গাঁয়ে মোট নৌকোর সংখ্যা সর্বদা বেজোড়, এতে হারজিতের সিদ্ধান্তে আসা সহজ। খেলার আরম্ভ ও শেষের কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই— সাধারণতঃ বাইচ খেলা তীরের কাছ দিয়েই হয়, সমুদ্রের মধ্যে প্রায় একশ পঞ্চাশ গজ দূরে নিমন্ত্রণকারী গাঁয়ের তীর থেকে নিমন্ত্রিতদের গাঁয়ের তীর পর্যন্ত। খেলা আরম্ভ হবার আগে বাইচের নৌকোগুলি সমুদ্রে নামানো হয়। যেখানে খেলা সুরু হবে সেখানে একটির পর একটি জোড়ায় জোড়ায় সাজানো। একটি নির্দিষ্ট সময়ে খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম জোড়া নৌকো সামনে ধেয়ে যায়। তারা প্রায় দু'শ গজ এগিয়ে যাবার পর দ্বিতীয় জোড়া নৌকো যাত্রা সুরু করে। এইভাবে চলে।

বাইচ খেলা দেখতে ভারি চমৎকার। যারা দেখেছে তারা এই দৃশ্য সহজে ভুলতে পারে না। শত শত লোকের গাঢ় রঙের সাজ-পোষাকে অপূর্ব বর্ণাঢ্য দৃশ্য। তীরের শুভ্র বালু সৈকত, পিছনে নারকেল তরুশ্রেণীর শ্যামল পটভূমিকা, অদূরে সমুদ্রের নীল জলের

বিস্তার। খেলার সময় তীব্র উত্তেজনা সমস্ত আবহাওয়াকে ভরপুর করে রাখে। সব কিছুকে অনুরঞ্জিত করে দেয়। গাঢ় রঙে রঞ্জিত গলুই। লাবণ্যময় গঠন লম্বা লম্বা নৌকোগুলি সমুদ্রের নীল জলে ভেসে চলে। ফুল মালায় সজ্জিত সুন্দর তরুণদের চেহারা মনোহর লাগে। সূর্যালোকে তাদের পেশল দেহ চক চক করে, যেন একটি কবিতার গতি ছন্দ দাঁড়ের সঙ্গে তালে তালে এগিয়ে চলে। খেলা যখন শেষ হয়ে আসে খেলায় অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানাতে এবং তীরে নৌকো নিয়ে আসতে সাহায্য করার জন্য নানা বর্ণের পোষাকে শোভিত বিপুল জনতা নৌকোর দিকে বেগে এগিয়ে আসে। খেলার শেষে শত শত সুরেলা কণ্ঠ একত্র হয়ে ভরা গলায় সঙ্গীতের সুরলহরী সৃষ্টি করে এবং আকাশ-বাতাস সুরের রেশে পূর্ণ হয়ে যায়।

বাইচ খেলার আগাগোড়াতেই বিপুল উৎসাহ। আর লোকে তাদের নৌকো নিয়েও খুব গর্ব বোধ করে। কিন্তু অদ্ভুত ওদের খেলোয়াড়ি মনোবৃত্তি। খেলাতে যতই তারা দক্ষতা দেখাতে চাক-না কেন, সুকোমল মনোবৃত্তির জন্য তারা কখনোই পরাস্ত প্রতি-যোগীদের লজ্জা দিতে চায় না, তারা তো শত্রু নয়, তারা যে বন্ধু, সে প্রতিযোগিতায় আহ্বানকারীই হোক বা আহূতই হোক। এমন কি যখন ভিন্ গাঁয়ের দুটি নৌকো পাশাপাশি প্রতিযোগিতা করে চলে এবং পরস্পরকে হারিয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। যখন একটি নৌকো অন্য নৌকো থেকে কিছুটা এগিয়ে যায়, সেই অগ্রগামী নৌকোর লোক নৌকোর গতি একটু কমিয়ে দেয় যাতে অন্যরাও কাছে আসতে পারে। এতে খেলার উত্তেজনা বজায় থাকে। কোন দলই বিশেষ লজ্জার মধ্যে পড়ে না।

যে গাঁয়ের নৌকোগুলি অধিক সংখ্যায় গন্তব্য স্থানে আগে গিয়ে পৌঁছায় তারাই জিতেছে বলে ধরে নেয়। তবে জয়-পরাজয় বাইচ খেলাতে খুব জরুরী নয়। উভয় গাঁয়ের মোড়ল ও বয়স্করা শুধু বলতে থাকে যে দুই গাঁয়েরই নৌকোগুলো চমৎকার, কোনটির চেয়ে

কোনটি ন্যূন নয়। আজকাল কখনো কখনো বাইরে থেকে গণ্যমান্য লোকেরা কর নিকোবরে পরিদর্শনে আসেন। তারা একটি নিজস্ব ধারণা নিয়ে দ্বীপে আসেন। বিশেষ প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়েই এদের জন্য নৌকো বাইচের ব্যবস্থা করা হয়, তাঁরা যেন মনে না কবেন যে লোকেরা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহী নয়। এই রকম বাইচ খেলায় দুই গ্রামের চেয়ে বেশি গ্রাম যোগদান করে। প্রতিটি গাঁযের অধিকারভুক্ত সাত-আটটি নৌকো খেলায নামে। আরম্ভ ও শেষ করার নির্দিষ্ট সময় আছে। খেলার শেষে বিশিষ্ট দর্শকদের দ্বারা প্রদত্ত পুরস্কার প্রদান প্রতিযোগিতার মনোভাবকে আরো আরো বাড়িয়ে তোলে। পুরনো রীতিতে জোড়া নৌকোর বদলে সব নৌকো এক সঙ্গে চলতে সুরু করে। ১৯৬৪ সালে কর নিকোবর পরিদর্শন কালে তদানীন্তন উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেন নৌকোর আকৃতির একটি রৌপ্য ট্রফি দিযেছিলেন। সেটা কখনো কখনো বিজযীদলকে অন্যান্য পুরস্কারের সঙ্গে দেওয়া হয়।

বাইচ খেলার এই পবিবর্তিত রূপও নিকোবরীরা খুব উপভোগ করে। কিন্তু এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে যখন নিজেরা খেলে তখন তার পুরনো ঢঙেই খেলে, যাতে জয-পরাজযেব কোন মূল্য নেই, খেলার শেষে কোন পুরস্কার নেই—লোকেরা যা চায তা হল প্রচুর ক্রীড়াকৌতুক, উত্তেজনা ও আনন্দোৎসব।

বাইচ খেলার পর উভয গ্রামের লোক সমুদ্রতীরে জমা হয় এবং কুস্তি করে। শুধু বাইচ খেলায় অংশগ্রহণকারীরাই কুস্তি লড়ে। চেহারা ও বয়স অনুসারে তারা পরস্পরের সঙ্গে কুস্তি করে। কুস্তির পর ভোজ। এবার বাইচ খেলায নিমন্ত্রণকারী গাঁয়ের লোকেদের আতিথ্য নেবার পালা। তারা সেই গাঁযের সর্বজনীন গৃহে রাত্রে থেকে যায়। পান-ভোজন, গান, উৎসব ইত্যাদি পুরাদমে চলে। পর দিন নিমন্ত্রণকারী গাঁয়ের লোকেদের আবার খাওয়ান-দাওয়ানর পর নিমন্ত্রিত গাঁয়ের লোকেরা আবার খেলার প্রস্তাব দেয়। একটি

দিন নির্দিষ্ট হবার পর আগের নিমন্ত্রণকারী গাঁয়ের লোকেরা নৌকোয় চড়ে নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যায়।

সমুদ্রে যখন স্থির জলের বিস্তার দেখা যায় তখন তরুণেরা খেলনার নৌকো নিয়ে বাইচ খেলে। 'এগুলি পাঁচ থেকে দশ ফুট লম্বা এবং খুব সরু। 'রাহুক' গাছের প্রশস্ত পত্র দিয়ে এগুলিতে পাল লাগান হয়। এই পালে খুবই হাওয়া লাগে। তরুণেরা গভীর জলে কিছু দূর ডোঙাগুলি নিয়ে যায় এবং ডোঙাগুলি ছেড়ে দেয়। বায়ুতাড়িত হয়ে সেগুলি তীরের দিকে আসে। বাইচ খেলার মত এগুলি জনতার উৎসব অনুষ্ঠান নয়। এতে সারা গ্রাম যোগ দেয় না, ভিন গাঁয়ের দুটি পরিবার যারা পুরনো বন্ধু, তারাই এতে যোগ দেয় এবং মাঝামাঝি রকমের ভোজ উৎসব হয়।

. বাইচ খেলার পরই নিকোবরীদের প্রাচীন ও প্রধান খেলা কুস্তি। সাধারণতঃ কোন উৎসবের সময় এবং বাইচ খেলার পর কুস্তি খেলা হয়। তবে বাইচ খেলার মত এটা কোন আনুষ্ঠানিক খেলা নয়। উৎসব ছাড়া সাধারণ সময়েও কোন গাঁয়ের লোকেরা কুস্তি লড়ছে দেখা যায়। কুস্তি'সাধারণতঃ সমুদ্রতীরে হয়, কারণ নরম বালিতে পড়ে গেলেও কোন আঘাত লাগার ভয় নেই। অনেক সময় তীরের কাছে সমুদ্রের জলেও ছেলেপিলেরা লড়ে। কুস্তির সময় একই বয়স ও ওজনের লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে কুস্তি করে। যখন কেউ প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎ করে মাটিতে ফেলে দেয় তখনই সে জয়ী হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। গলায়. একটি হাতে এবং কোমরের নীচের কোন জায়গায় ধরা অন্যায়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর পায়ের মধ্য দিয়ে ধরা চলে। এইভাবে কুস্তি সুরু হয়। উভয় ব্যক্তি পরস্পরের পিঠের উপর দিয়ে দু'হাতে নিবিড় আলিঙ্গনে জাপটে ধরে, তারপর নিছক শারীরিক বলে একজন আর-একজনকে মাটিতে ফেলে দিতে চেষ্টা করে। কেউ মাটিতে পড়ে গেলেও যদি তার পিঠ সম্পূর্ণ মাটিতে স্পর্শ না করে তবে খেলা সমান সমান বলে ধরে নেয়। তিনবার খেলার পর সবচেয়ে যার কৃতিত্ব সে জেতে। তবে বাইচ খেলার মতই

তাদের কাছে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফল মোটেই জরুরী ব্যাপার নয়, আনন্দ করাই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

সত্যিকারের কোন শূকরের লড়াই হয় না। একটা লোক একটা শূকরকে ক্ষেপিয়ে উত্তেজিত করতে থাকে আর পশুটা তাকে ছুটে ছুটে কামড়াতে চেষ্টা করে। অস্থায়ারী ভোজের (কানা-আঁা-হুঁা উ) সময় অথবা বাইরে থেকে কোন পরিদর্শক এলেই শুধু সত্যিকারের শূকরের লড়াই হয়। আগের দিন বন থেকে বুনো শূকর ধরে এনে গ্রামের মাঝখানে কাঠের খোঁয়াড়ে বন্ধ করে রাখা হয়। শূকরের মেজাজ তিরিক্ষি করার জন্য রাত্রে খেতে দেওয়া হয় না। তাদের উত্তেজিত করার জন্য একটু তাড়িও খাওয়ান হয়। লড়াইর দিন খোলা জায়গায় প্রশস্ত গোল রঙ্গভূমিতে দর্শকরা জমা হয়। এক এক করে খোঁয়াড়ের মুখগুলি খুলে দেওয়া হয়। শূকরটির এতক্ষণে তিরিক্ষি মেজাজ হয়ে গেছে। সে রেগে বেরিয়ে আসে। শূকরের পিছন দিকের একটি পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। দড়িটি খোঁয়াড়ের কাছে একজন ধরে থাকে, আর শূকর-লড়াইকারী শূকরটাকে খোঁচাতে থাকে। যে খোঁচায় তার দিকে শূকরটা ছুটে যায় এবং কামড়াতে চেষ্টা করে। লড়াইকারী কোন রকমে যদি শূকরটার কান ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, সে লড়াইয়ে জয়ী বলে ধরে নেওয়া হয়। কখনো-বা শূকরটা লড়াই-কারীকে বিশ্রীভাবে কামড়ে দেয়। তবে পশুটা বেশী কিছু করতে পারে না। যদি দেখা যায় শূকরটা একটু বাড়াবাড়ি করছে পেছনের পা দড়ি দিয়ে বেঁধে সে পশুটাকে পিছনে টানে এবং তিন-চার জন লোক মিলে শূকরটাকে খেলার মাঠ থেকে বাইরে নিয়ে যায়। কোন কোন লাটিন দেশে ষাঁড়ের লড়াইতে যদি পশুটা খুব ভাল খেলে তবে তাকে হত্যা করা হয় না। কিন্তু শূকরের লড়াইতে পশুটার লড়াইর গুণের তত মূল্য দেওয়া হয় না। অধিকতর তেজী পশুকে অন্য পশুদের চেয়ে তাড়াতাড়ি হত্যা করা হয়। বলতে গেলে মানুষ ও পশুর মধ্যে এই অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই

বহিরাগতদের কাছে শূকরের লড়াই তত আকর্ষণীয় নয়। বিশেষ করে তারা যদি পশু-প্রেমিক হয়। একমাত্র এই উপলক্ষ্যেই নিকোবরীরা তাদের প্রিয় শূকরের প্রতি কিছুটা নিষ্ঠুরতা দেখায় —এইজন্যে এতে এত উৎসাহ।

. লাঠি খেলা অতীতে একটি প্রধান খেলা ছিল। কিন্তু এখন আর হয় না। কর নিকোবরে এ খেলা একেবারে পরিত্যক্ত। তবে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য কোন কোন দ্বীপে উৎসবের সময়, বা বাইরে থেকে বিশিষ্ট অতিথিরা এলে তাদের চিত্তবিনোদনের জন্যও এই খেলা হয়। প্রায় দশ ফুট লম্বা দুটি লাঠির এই খেলা। আগে এই খেলা খুব উৎসাহ সহকারে হত। যুধ্যমান ব্যক্তিরা তাদের প্রতি-দ্বন্দ্বীদের মত জোরে পায়ে আঘাত করার চেষ্টা করত এবং সমস্ত শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে হত। খেলায় অংশগ্রহণকারী লোক প্রায়ই খুব চোট পেত এবং কখনো-বা গুরুতরভাবে আহত হত। আজকাল সরকার এই সাংঘাতিক লাঠি খেলা বন্ধ করে দিয়েছেন। এতে এখন আর আহত হবার কোন আশঙ্কা নেই। এ খেলা এখন নিরীহ ব্যাপার। এখন আর এতে কোন উত্তেজনা নেই। খেলার একটা অঙ্গ খেলোয়াড়রা তাদের পুরনো পোষাক লেঙ্গটি আর টুপি পরে, খুবই রঙচঙে। এই পোষাকে তরুণ খেলোয়াড়দের পেশল দেহের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় বলে এই খেলার এত আকর্ষণ।

কখনো-বা তরুণরা তাদের অধিকতর হিংস্র মোরগদের মুরগীর লড়াইর জন্য শিক্ষা দেয় এবং ভিন্ গাঁয়ের মুরগীদের সঙ্গে লড়াই করায়। কিন্তু এ খেলা তেমন জনপ্রিয় নয়।

এই সব প্রাচীন খেলাধূলায় মহিলারাও সক্রিয় অংশ নেয়, তবে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নয়। নান কাউরিতে কখনো-বা মেয়েরা বাইচ খেলায় যোগ দেয়। তবে এটা তত উৎসাহজনক ব্যাপার নয়। সাধারণতঃ মেয়েরা দর্শকরূপে যোগ দেয় এবং খেলার পর উৎসবের ব্যবস্থা করে। উৎসবের ব্যবস্থার জন্য তারা তো অপরিহার্য। এসব খেলাধূলায় পুরুষের মতই তাদের উৎসাহ এবং আনন্দ। এসব

কোন খেলাতেই কোন বাজি ধরাধরি নেই। বলতে গেলে জুয়াখেলা নিকোবরীদের কাছে একেবারে অজানা।

এই সব প্রাচীন খেলাধূলা ছাড়াও নিকোবরীরা আজকাল বাইরের অনেক খেলা শিখেছে। অন্যান্য দ্বীপে সে সব খেলা উন্নততর ও জনবহুল জায়গায় হয যেমন নান কাউরি দ্বীপের চাম্পিনে, কাচাল দ্বীপের ওয়েস্ট বে কাচাল এবং কাপাঙ্গাতে বাইরের খেলার মধ্যে ফুটবল সবচেয়ে জনপ্রিয়। বার্মায় থাকাকালে বিশপ রিচার্ডসন এই খেলা শিখেছিলেন এবং তিনিই এর প্রচলন করেন। এখন দ্বীপের প্রত্যেক গাঁয়ে ফুটবল টীম ও খেলার মাঠ আছে। মাস গ্রামে এই মাঠের চার দিকে পাকা দেয়াল দেওয়া হয়েছে। এই মাঠ খুব ভাল ভাবে সংরক্ষিত। আন্তঃ পল্লী ফুটবল টুর্নামেন্ট এবং বার্ষিক খেলাধুলা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

কর নিকোবরের ফুটবল খেলার মান খুবই উঁচু। নারকেল গাছে চড়ার অভ্যাসের দরুণ নিকোবরীদের পদদ্বয় সুগঠিত। তাদের পেশল গঠন ও কর্মোৎসাহ তাদের আদর্শ ফুটবল খেলোয়াড় করেছে। এই দ্বীপের ফুটবল খেলোয়াড়দের কাছে বাইরের অনেক বিশিষ্ট টীম পরাজিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে যখন উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের একটি টীম সুব্রত মেমোরিয়াল কাপ টুর্নামেন্টে যোগ দিল তারা সহজেই সেমি ফাইনালে পৌছাল। ১৯৬৬ সালে স্কুল টীমের কৃতিত্ব আরো বেশি কারণ সে বছর টুর্নামেন্টে তারা জয়ী হয়।

নিকোবরীরা এ পর্যন্ত ক্রীড়া শিক্ষার কোনো সুযোগ পায় নি। তবে সম্প্রতি সরকারী কার্যসূচী অনুসারে নিকোবরীদের ক্রীড়া শিক্ষা দেবার জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় তাঁর পরিচালনায় এই দ্বীপে ফুটবল খেলা আরো জনপ্রিয় হবে।

এদের প্রাচীন খেলায় হার-জিতের দাম নেই, কিন্তু ফুটবল খেলায় আছে। খেলোয়াড়দের মধ্যে যথেষ্ট সততা আছে, তারা সাধারণতঃ খেলায় অন্যায় আচরণ বা বিধিভঙ্গ করে না। এটা খুবই

উল্লেখযোগ্য যে পেনালটি গোল দিয়ে তারা জিততে চায় না। খেলায় পেনালটি কিক পেলে তারা জেনেশুনে বলটা গোলের বাইরে মারে।

ফুটবলের পরেই ভলিবল। এটাও তারা বাইরে থেকে শিখেছে। কর নিকোবরের গ্রামে ভলিবলের কোর্ট আছে। এই খেলায় নিকোবরীরা বেশ কুশলী, ফুট ওয়ার্ক, স্ম্যাশিং এবং প্রশংসনীয় সংঘবদ্ধ টীম ওয়ার্ক। মেয়েরাও ভলিবল খেলে। তাদের খেলার মান মোটামুটি উঁচু। মেয়েদের ভলিবল খেলা খুবই বর্ণাঢ্য। বাইরের দর্শকদের কাছে খুবই আকর্ষণের বস্তু।

বাইরে থেকে অন্য খেলাও এসেছে, যেমন হকি, ক্রিকেট ও ব্যাডমিণ্টন। কিন্তু এগুলি তত জনপ্রিয় নয়। কারণ দ্বীপের আর্দ্র জলবায়ুর পক্ষে এসব খেলা অনুকূল নয়। কারণ এসবের জন্য প্রচুর আয়োজন ও বন্দোবস্ত প্রয়োজন হয়। সমুদ্রতটে লোকে হাডুডুও খেলে। কিন্তু এর মান ততটা উঁচু নয়।

দৌড়ঝাঁপের মানও ততটা সুবিধাজনক নয়। অল্প দূরের দৌড়ে তারা বেশ চটপটে। কিন্তু বেশি দূরের দৌড়ে তারা অতটা কৃতিত্ব দেখাতে পারে না। অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বীকেই কোর্স শেষ করার জন্য খুব উৎসাহ দিতে হয়।

যদিও কর নিকোবরে খেলাধূলার ব্যবস্থা কিছুটা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক এবং শিক্ষা বিভাগ থেকে করা হয়, তবুও এর বেশীর ভাগই নিকোবর অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন দ্বারাই সংঘটিত। এই সংস্থাটিই সমস্ত গাঁয়ে খেলাধূলা দেখাশোনার ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয়। গাঁয়ের স্পোর্ট-ক্লাবগুলি (যেগুলি দ্বীপের সব গাঁয়ে কাজ করছে) এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই সংস্থার পরিচালনায় কর নিকোবরের ট্রেডিং কোম্পানির ম্যানেজমেণ্ট এবং গ্রামের সব স্পোর্ট ক্লাবের প্রতিনিধি দল করে থাকে। সংস্থাটি সারা বছর ফুটবল, ভলিবল,

সাইকেল রেস, সাঁতার এবং দৌড়ঝাঁপের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে।

জানুয়ারিতে আবহাওয়া সবচেয়ে ভাল। তখন সাইকেল রেস হয়। কর নিকোবরে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ভাল সাইকেল চালায়। এই সব প্রতিযোগিতায় দ্বীপের সব গ্রাম থেকেই অনেকে যোগদান করে।

মেয়েদের সাইকেল রেস আই.এ.এফ. রানওয়ে থেকে সুরু হয়। দশ কিলোমিটার লম্বা কোর্স চুক চুকিয়া গ্রামে গোলরাস্তা বরাবর যায়। ছেলেদের সাইকেল রেস আরো লম্বা, প্রায় ষোল কিলোমিটার। এটিও রানওয়েতে সুরু। শেষ হয় মাস গ্রামে। রেস সুরু হয় খুব ভোরে। তখন যানবাহন চলাচল কম। সাইকেল রেস খুব জনপ্রিয়। সমস্ত পথ জুড়ে নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে সকলে সারি বেঁধে দাঁড়ায়।

১৯৬৫ সাল থেকে ছেলেদের সাঁতারের প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। অ্যাথেলেটিক সংস্থা মার্চ-এপ্রিলে প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান ঠিক করেছে।

প্রতিযোগিতা মাস গ্রামের তীর থেকে কিছুটা দূরে জেটির কাছ থেকে সুরু হয়। প্রতিযোগীদের প্রায় দু'শ গজ দূর থেকে তীরে সাঁতরে আসতে হয়। সমুদ্রের সঙ্গে নিকোবরীদের দৈনন্দিন জীবনের নিবিড় সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এদের সাঁতারের মান এতটা নীচু হওয়া খুবই বিস্ময়কর। লোকেরা দীর্ঘকাল জলে ভেসে থাকতে পারে কিন্তু আধ মাইলের বেশি সাঁতার কাটতে পারে না। তাও আবার সাঁতারের বেগ খুব উল্লেখযোগ্য নয়। দ্বীপ ঘিরে সমুদ্রের জলে পোকা, তাদের কামড় খুব বেদনাদায়ক। গভীর জলে হাঙর ইত্যাদি জানোয়ার। এসবের জন্যই বোধ হয় লোকেরা সমুদ্রে বেশী দূর সাঁতার কাটতে যায় না এবং এই কারণেই সাঁতারের মানের উন্নতি হয় না।

ইনডোর গেমের মধ্যে ক্যারাম, ড্রটস খুব জনপ্রিয়। কর

নিকোবরের সব গাঁয়েই এসব খেলার চল। স্কুলের ছেলেরা টেব্‌ল টেনিসও খেলে। যদিও লোকেরা খুব সাধারণ খেলাই খেলে তবুও তাস খুবই জনপ্রিয়। বুড়োরাও অবসর সময়ে বাড়ীর নীচের সেটির ওপর বসে তাস খেলে, সঙ্গে তাড়িও পান করে।

এসব খেলা ছাড়াও লোকেরা শিকার-প্রিয়। শিকারের অস্ত্র বর্শা, দা এবং চিত্তাকর্ষক ধনুক। দা আর বর্শা দিয়ে বুনো শূকর শিকার করা হয। শিকারের সময় বিশেষ শিকারি কুকুর সঙ্গে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ খরার সময় শূকর শিকার করা হয না। জঙ্গলে প্রচুর খাদ্য পাওযা যায না বলে সে সময খুব একটা শূকর পাওযা যায় না। বর্ষার সময় খাদ্যের অভাব নেই।

ক্রস ধনুক ও তীরের সাহায্যে পাখী ও বাদুড় শিকার করা হয়। যদিও ধনুক ব্যবহার করতে যথেষ্ট দক্ষতা আবশ্যক (যেটি শুধু এক হাতে ধরে ব্যবহার করতে হয়)। নিকোবরীদের লক্ষ্য এত ভাল যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা একবার দুবার খাবার মত প্রচুর শিকার করতে পারে। যেসব পাখী মারা হয় তা হল ইম্পিরিয়াল পায়রা ও হরিয়াল, বিশেষ করে ইম্পিরিয়াল। ইম্পিরিয়াল পায়রা পাওয়া যায় জঙ্গলে, বৃক্ষচূড়ার পাতার আড়ালে। এমন ভাবে থাকে যে খোলা চোখে প্রায় দেখাই যায় না। তাদের গভীর কূজনধ্বনিতে জঙ্গলে তাদের উপস্থিতি বোঝা যায়। শিকারীরা তখন পাখী খুঁজতে থাকে। যতটা পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকুক অভ্যাসের দরুন তারা ঠিক পাখীর অবস্থান ঠাহর করতে পারে। ক্রস ধনুকে বিদ্ধ করে পায়ই তাদের মারে।

বাদুড় মারা সোজা কাজ কারণ তারা সদলবলে একটি গাছেই থাকে। তাদের কিঁচিরমিচির আরো স্পষ্ট। তাদের রঙ ধূসর বলে সবুজ পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকতেও পারে না। শিকারে গিয়ে সর্বদাই প্রায় লোকে একটা দুটো বাদুড় নিয়ে আসে ও পরমানন্দে খায়।

শিশুরাও বিশেষ করে বালকরা বড়দের অনেক খেলাই খেলে। তবে আঠার বছর না হওয়া পর্যন্ত কেউ বাইচ খেলে না। ছোট শিশুদের নিজেদের অদ্ভুত খেলা রয়েছে। আজকাল অবশ্য ট্রেডিং কোম্পানির দোকানে নানা রকমের ভাল খেলনা পাওয়া যায়। তারা সেগুলি কেনেও। খেলনাগুলি খুবই সাধারণ, তবে নৌকো ছাড়া। কখনো সম্পূর্ণ সুপুরির খোল ছুরি দিয়ে কেটে শূকর তৈরী করা হয়, ছোট কাঠি লাগিয়ে শূকরের পা বানানো হয়। পাতলা পাতলা কাঠি দিয়ে হাতপাখা বানায়। ছুরি দিয়ে কেটে গোল করে, তার মধ্যে নরম কাঠ দিয়ে একটি ব্লেড তৈরী করে—ব্লেডে একটি ফুটো করে লাগিয়ে দেওয়া হয়। হাওয়াতে বা হাতে করে ঘোরালে ব্লেড পাখার মত ঘুরতে থাকে।

এ ছাড়া নারকেলের বাইলের টুকরা বা পাস্তানাস গাছের পাতা গোল করে চাকার মত বানায় যা হাওয়ায় মাটিতে গড়িয়ে যায়। একে বলে ইনরুলস, যার মানে গাড়ি। কখনো-বা এ জিনিস তৈরী করা হয় মুরগীর পালক দিয়ে। পেচিয়ে নিয়ে নারকেলের কোমল গলার টুকরোতে লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং মাটিতে গড়িয়ে যায়।

তবে ছেলেদের সবচেয়ে মজার খেলা নকল নৌকো বাইচ। ভারী মোটা দু'তিন ফুট লম্বা নারকেলের সবুজ বাইল নেয়। মাটিতে রেখে শিশুরা এর ওপর বসে। একজন একটি বাইলের ওপর শরীরের ভার ও একটি পা এবং অন্য পা পিছন দিকে মাটিতে একদিকে রাখে। দাঁড়ের অনুকরণে প্রায় দু'ফুট লম্বা মোটা ছোট লাঠির জোরে এবং পায়ের সাহায্যে বাইলটি সামনে এগিয়ে চলে। যে শিশু আগে গিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছায় সে জেতে। সাধারণতঃ তিন-চারটি শিশু এইভাবে খোলা জায়গায় প্রতিযোগিতা করে। কখনো-বা নারকেল গাছের বাইলের পরিবর্তে পাতলা কাঠ নকল নৌকো বাইচের জন্য নেওয়া হয়। ফুল দিয়ে সাজায়।

উজ্জ্বল রঙীন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে পাল। যাতে সত্যিকারের নৌকোর সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য থাকে।

গল্প ও উপাখ্যান বলতেও এরা কম আগ্রহী নয়। যখন দৈনন্দিন কাজ থেকে ছুটি পায়, খেলাধূলা বা সাংস্কৃতিক কাজ-কর্মও কিছু থাকে না তখন নিজেদের গৃহভিতের তলে বা খোলা জায়গায় বসে তারা গল্প করে ও ঠাট্টা তামাসাও চলে। শিশুরা একাগ্রমনে শোনে। এইভাবে গল্প উপকথা বংশপরম্পরায় চলতে থাকে।



পঞ্চদশ অধ্যায়

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিকোবরীদের জীবনে সঙ্গীতের একটি প্রধান স্থান। সঙ্গীত শুধু পরম্পরাগত ভোজ এবং উৎসব-অনুষ্ঠানেই নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রাত্যহিক জীবনের বাঁধাধরা কাজের একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য তারা কাজ করতে করতে গান গায়। তা ছাড়া সভ্য সমাজের লোকেদের মত ওরা অপরের শ্রুতিগম্য হবে বলে জোরে গাইতে লজ্জা বোধ করে না। দ্বীপে এটা একটা সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা। কুয়া থেকে জল তুলতে অথবা কাঁধে ভার বইতে বা ক্ষেতে কাজ করতে অথবা সমুদ্রে মাছ ধরার সময় হঠাৎ কেউ গান করতে সুরু করে দেয়, আর একজন হয়তো ধুয়া ধরে এবং এমনি করে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সমবেত কণ্ঠে তারা গান গেয়ে চলে।

প্রাচীন নিকোবরী সঙ্গীত একটু একঘেঁয়ে। সব গানেরই যেন একই সুর। কর নিকোবরে বাইরের নানা প্রভাবের ফলে প্রাচীন সঙ্গীত আজকাল কম শোনা যায়। তবে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপে প্রাচীন সঙ্গীতেরই চল। গানের সুর তালে তালে ওঠা-নামা করে। কখনও উচ্চ গ্রামে ওঠে আবার হঠাৎ খাদে নেমে যায় এবং আবার উঁচু পর্দায় সুর উঠতে থাকে। এইভাবে একই রকমের সুরের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে এবং অবিরাম গান চলতে পারে।

অধিকাংশ গানেই আরোহ এবং অবরোহ, সর্বোচ্চ এবং নিম্নতম স্তরে তফাৎ বিশেষ নেই। এইজন্যই গান একঘেঁয়ে লাগে। কর নিকোবরে কোন কোন গান কবিতা আবৃত্তির মত মনে হয়। একই সুরের সমবেত কণ্ঠের গান একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়। জনকয়েক হিন্দু পুরোহিত বৈদিক মন্ত্র একসঙ্গে সুর করে পড়লে যেমন মনে হয় তেমনিই মনে হয় ওদের মিলিত কণ্ঠের গান।

সঙ্গীতের তাল ঢিমে। মনে হয় নিকোবরীদের অলস জীবন তাদের গানেও সংক্রামিত। বাইচ খেলার গানে পর্যন্ত খেলার উৎসাহ বা গতির উদ্দাম ছন্দ বিন্দুমাত্রও নেই। এমন ঢিমে তালের এই গান যে দেশের অন্যান্য অংশের প্রবল গতিছন্দপূর্ণ নৌকোর গানে যারা অভ্যস্ত তাদের কাছে এ গান বড় অদ্ভুত মনে হয়। এই বিলম্বিত লয়ের জন্য এদের প্রাচীন সঙ্গীতও একঘেঁয়ে লাগে।

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। কোন কোন সুর আবার ভোলা যায় না। এই সুরে বাইরের কোন প্রভাব বোঝা যায় না। এ ওদের পুরাতন সঙ্গীতেরই অংশ অথবা হালের শিক্ষা এটা বলা কঠিন। এসব সুরের একটা অদ্ভুত লালিত্য আছে। এসব সুরে সেই যুগের আদিম আদিবাসী জীবনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। তখন মানুষ ছিল প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি এবং মানুষের মনে প্রকৃতির রূপ বিস্ময়কর ও ভীতিপ্রদ ছিল।

আবার কোন কোন গানের সুখকর সুর ভারতের মূল ভূখণ্ডের অন্যান্য উপজাতীয় লোকের গানের সুরের সঙ্গে মেলে। হতে পারে ছুটি বিভিন্ন স্থানে মানব-মন একই সুরের সৃষ্টি করেছে অথবা হতে পারে যে এসব সুরে দ্বীপপুঞ্জের রাঁচীর শ্রমিকদের গানের প্রভাব আছে। এই সব শ্রমিক ছোটনাগপুরের উপজাতীয় লোক। এরা প্রায়ই নিকোবরীদের সামনে নিজেদের লোকসঙ্গীত ও লোকগানের অনুষ্ঠান করে।

কোন কোন সুরে পাওয়া যায় সমুদ্রধ্বনির প্রভাব। সমুদ্রের তরঙ্গের মত গানের সুরে শক্তি আসে, ফেটে পড়ে, আবার মিলিয়ে যায়। পরক্ষণেই বিপুল শক্তিতে জেগে ওঠে, যেন তীরে আছড়ে পড়ে এক-একটি বিরাট ঢেউ।

নিকোবরী প্রাচীন সঙ্গীতকলায় বাদ্যযন্ত্র একেবারে নেই বললেই হয়। অতীতে বোধ হয় কোন লতা এবং নারকেল গুঁটায় তৈরী একরকম বীণা ছিল কিন্তু এখন তা একেবারে দেখা যায় না। এটি

তাৎপর্যপূর্ণ যে অন্যান্য উপজাতীয় লোকেদের মত এদের কোন ঢোলক নেই। এর কারণ হয়তো এই যে নিকোবরীরা কোনদিনই যোদ্ধা ছিল না এবং তাদের মনোবল বাড়াতে কোন ঢোলকের প্রযোজন হত না।

নিকোবরীদের প্রাচীন সঙ্গীত বড়ই সীমিত, কিন্তু তাদের সঙ্গীতের বিশেষ প্রতিভা আছে। কান তাদের এমন তৈরী যে একবার কোন সুর শুনে তা তারা প্রায়ই ধরতে পারে ও গাইতে পারে। মেয়েদের সুর কিছুটা চড়া। উঁচু পর্দায় ওদের গলা একটু তীক্ষ্ণ। কিন্তু সেই দিক থেকে পুরুষদের কণ্ঠস্বরের বেশ পাল্লা আছে এবং পুরুষদের মধ্যে খাদের মোটা গম্ভীর স্বর, উচ্চ গ্রামের স্বর সবই পাওয়া যায়। সমবেত কণ্ঠের গানে এই বিভিন্ন স্বর খুব ভালভাবে মিশে যায় ও গান বেশ চমৎকার জমে ওঠে।

গান একক ভাবেও গাওয়া হয় যেমন কেউ হয়তো একাকী দৈনন্দিন কাজ করতে করতে গাইছে, কেউ-বা শান্তভাবে এক পাত্র তাড়ি পান করতে করতে গাইছে। আবার সমবেতভাবেও গায়—সবাই মিলে যখন কাজ করে বা উৎসব আনন্দ-ভোজের সময় একসঙ্গে মিলিত হয়। প্রধান অনুষ্ঠানে যেমন অস্থায়ী ভোজে বা বাইচ খেলার সময় সমবেত কণ্ঠে খুব গান গায়। এসব অনুষ্ঠানে কিছুটা খোশ মেজাজে বা প্রচুর তাড়ি পানের উৎসাহে সঙ্গীত চর্চা চলে। প্রাচীন সঙ্গীতের মধ্যে একটা শক্তি ও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

পোষাকী অনুষ্ঠানে খাওয়া ও গানের কথা ছেড়ে দিলেও লোকের কণ্ঠস্বর এবং চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের গুণেও মনে হয় যেন নিকোবরী সঙ্গীতের একটি নিজস্ব মোহ আছে। ঠিক সূর্যাস্তের পর কর নিকোবরের কোন পল্লীর রাস্তায় হেঁটে বেড়ালে চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়। পশ্চিম আকাশে যখন সোনার রেখার শেষ ঝলক, তখন গোধূলির রঙে গ্রামের অপূর্ব রোম্যান্টিক চেহারা, আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং সাঁঝের ছায়া দীর্ঘায়িত হয়, লোকে তখন কাজ থেকে ঘরে ফেরে এবং সমস্ত আবহাওয়া একটা প্রশান্ত

ভাবে ভরে ওঠে। একটি একটি করে গৃহগুলিতে ছোট ছোট প্রদীপ ও রান্নার আগুন জ্বলে ওঠে। ভাজা মাছের ও নারকেলের গন্ধ বাতাসে ভেসে ওঠে। ঘরের মধ্যে দেখা যায় দু'একজন আয়াস করছে এবং আপন মনে গুনগুন করে গান গাইছে। কুয়ো থেকে কেউ-বা শেষবারের মত জল নিয়ে আসছে গান গাইতে গাইতে, রাস্তায় দুটি তরুণ হাতে হাত রেখে কোন রোম্যান্টিক সুরে সুর মিলিয়ে হেঁটে আসছে। গাঁয়ের গৃহপাঙ্গণে হয়তো তিন-চারটি শিশু একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে পাখীর মত সুরে আনন্দে গান গাইছে। এই সব পটভূমিকায় এই মানবকণ্ঠের সঙ্গে যেন মিলে যায় গাঁয়ের পিছনের নারকেল বীথির মর্মর ধ্বনি এবং সমুদ্রের গর্জন যেন অর্গ্যানের সঙ্গতের মত মনে হয়।

নিকোবরা সঙ্গীত নিবিড় ও বিচিত্র। বাস্তবিকপক্ষে এই অর্থে ওখানে এমন কোন লোকসঙ্গীত নেই যা পরম্পরায় চলে আসছে। অতীতে তো গানগুলি লেখা হত না, এমন কি এখনো কদাচিৎ লেখা হয়। লোকের স্মৃতিশক্তি কম বলে শীঘ্রই তা ভুলে যায়। হতে পারে কোন কোন গান বেশি জনপ্রিয় বলে দীর্ঘকাল লোকের স্মরণে থাকে, কিন্তু এখনো খুব কমই একপুরুষের গান উত্তর পুরুষ পর্যন্ত টিকে থাকে। অপরদিকে সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতার জন্য গানের অধিকাংশ বিষয়বস্তু একই। রচনা হালের হলেও প্রাচীন সুরে যখন গাওয়া হয় মনে হয় প্রাচীন লোকসঙ্গীতই গাওয়া হচ্ছে।

গান রচনায় নিকোবরীদের মনের অদ্ভুত সরসতা। বিভিন্ন বিষয়ে প্রতি বছর নানা জনে বিস্তর গান রচনা করে। নিকোবরী ভাষায় কোন সাহিত্য না থাকায় এই গানগুলিই লোকের সৃষ্টির আবেগের একমাত্র ফসল। তাই এগুলির আকর্ষণও বেশী।

লোকে সঙ্গীত রচনা বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে গ্রহণ করে। বিপুল শুভেচ্ছা ও স্নেহের নমুনা হিসাবে এক গাঁয়ের নবলব্ধ তরুণীর উপর ভিন গাঁয়ের লোক একটি গান বাঁধলো। যাদের জন্য গান

তৈরী করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট দিনে তারা সঙ্গীত রচনাকারীদের নিমন্ত্রণ করে। পান-ভোজনান্তে সমাজকল্যাণ গৃহে নতুন গান গাওয়া হয়। আহ্বানকারী ব্যক্তিরা নবসঙ্গীতের খুব উৎসাহভরে তারিফ করে। অন্য গাঁয়ের প্রধান ভোজের জন্যও লোকে আগেই নতুন গান রচনা ক'রে রাখে এবং অপরের সামনে পরিবেশন করার আগে সেই সঙ্গীতের অনুশীলনও করে।

সঙ্গীতের চরণধ্বনিতে কোন মিল নেই। বাইরের লোকের কাছে গানের অর্থ কখনো দুর্বোধ্য কারণ গানে ওদের উপকথার নানারকম পরোক্ষ উল্লেখ থাকে। রচনাকারীরা ধরে নেয় যে সমস্ত শ্রোতাই তাদের লোককথার সঙ্গে পরিচিত। তবু গানের কলি খুব চিত্তাকর্ষক। কতগুলি গানে আছে সূর্য, চন্দ্র, বর্ষা-বাদল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দৃশ্যের ব্যাপারে সাধারণ লোকের অনুভূতি, বিস্ময় বিহ্বলতার প্রতিক্রিয়া। কিছু গানে আছে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় চাহিদা যেমন নারকেল ইত্যাদি পাদপের প্রশস্তি। কতগুলি গানে নীতিকথা আহরণ করার কথা। কয়েকটি গান প্রেম ও ব্যথা ও মানুষের স্বাভাবিক ভাবাবেগের উপর রচিত। প্রেমের গানে প্রিয়-মিলন-বিচ্ছেদের ও বেদনার কথা। কিছু গান প্রাচীন উৎসব উপলক্ষেই রচিত। যেমন বাইচ খেলা বা অস্থায়ী ভোজ। এসব গানে নৌকো ও শূকরের প্রশস্তি। কোন কোন গানে ব্যক্তি প্রশস্তিও আছে, যেমন বিশপ রিচার্ডসন এবং এমন কি অফিসারদের বিশেষ করে অ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনারকেও নিয়ে। কিছু গানে বহিরাগতদের দেখে লোকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা। সাময়িক ও আধুনিক বিষয়বস্তুও গানে নেওয়া হয়। কিছু গানে হাস্যরসের স্পর্শ। অন্নাভাবের কথা, নতুন জাহাজের আগমন ইত্যাদিও। কিছু গানের আবার গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তু, যেমন দেশ-প্রেমের কথা। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানী আক্রমণের সময় কয়েকটি উৎকৃষ্ট স্বদেশপ্রেমের গান কর নিকোবরে রচিত হয়েছিল। সেই সব গানে স্বদেশপ্রেমের ভাবাবেগ পুরো মাত্রায়।

গানের মত নিকোবরীদের কাছে নাচও প্রাচীন জিনিস। যদিও তাদের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে নৃত্যের তেমন কোন নিবিড় যোগাযোগ নেই। এক সময় উৎসব ছাড়া সাধারণ দিনেও লোকেদের নাচতে দেখা যেত, বিশেষ করে পূর্ণিমার রাতে। যাদুকর ডাক্তারীতে যাদের নতুন দীক্ষা হ'ত তাদের সারা বছর প্রতি রাত্রে নাচ বাধ্যতামূলক ছিল। তবে এখন সভ্যতার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ দিনে লোকেরা নাচে না। কিন্তু ভোজ ও উৎসব-অনুষ্ঠানে নাচ এখনো বিশেষ আবশ্যকীয় বস্তু।

চাওড়া ও অন্যান্য জায়গায় যেখানে এখনো ঝাড়ফুক, রোজার, যাদুর ডাক্তারের প্রভাব উৎসবের দিন ছাড়া অন্যদিন তাদের আদেশে নাচতে হলে নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে নাচতে হবে। এতে তরুণ-তরুণীরা নাচের সময় পরস্পরকে নিবিড় করে পাবার প্রচুর অবকাশ পায় এবং অনেক যৌন সম্পর্কও স্থাপিত হয়। নিকোবরী নাচ খুব সাধারণ। সাধারণতঃ যৌথ নৃত্য করে এবং সব সময় সঙ্গীত সহযোগে নৃত্যানুশীলন করে। যারা নাচে তারা হাত বাড়িয়ে পরস্পরকে ধরে এবং বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে অথবা একটা বৃত্তাংশে নাচে। কখনো-বা বাহু প্রসারিত না করে নৃত্যশিল্পীরা তাদের ডান হাত অন্য জনের কাঁধে রেখে এবং বাঁ হাত কোমরে রেখে নাচে। কর নিকোবর পুরানো নৃত্যপদ্ধতি অনুযায়ী নরনারী একসঙ্গে কখনো নাচে না, কিন্তু নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থানে নারী-পুরুষ একত্র নাচে। তবে কর নিকোবরে মেয়েরা ও পুরুষেরা আলাদা আলাদাভাবে দল বেঁধে নাচে, কিন্তু দর্শকের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই থাকে। চাওড়াতে শুধু কুমারী মেয়েদের নাচতে দেওয়া হয়।

কর নিকোবরে সাধারণতঃ তিন ভাগে নাচ হয়। প্রধানতঃ নাচ-গান সুরু হবার আগে নৃত্যশিল্পীরা বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বাঁ পা তুলে ধরে ডান পা দিয়ে তিনবার ক্ষিপ্র গতিতে পদ সঞ্চালন করে। তারপর তারা পা বদলায়।



এই রকম তিনবার পদসঞ্চালন করে—বিপরীত দিকে, ঘড়ির কাঁটার চলার দিকে। এইভাবে তিনবার ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে এবং দুবার ঘড়ির কাঁটার চলার দিকে নৃত্যের ভঙ্গিতে পদসঞ্চালন করে। তারপর শিল্পীরা আসল নাচ-গান সুরু করে। প্রধান নাচের ভঙ্গি একটু শ্লথ থাকে। বৃত্তাকারে ঘোরাটা সাধারণতঃ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে চলতে থাকে। নৃত্যের পদবিন্যাস বড় সরল। কতকটা বিলাতী 'সম্বা' নাচের মত পদক্ষেপ। সুদৃঢ় ভাবে নৃত্যের তালে তালে ডান পায়ে সজোরে মাটি ঠোকে কিন্তু বাঁ পায়ের সঞ্চালন অপেক্ষাকৃত লঘু। আর বাঁ পা পেছন দিকে একটু ছুঁড়ে দেয়। গান শেষ হয়ে এলে প্রধান নৃত্য থামে কিন্তু আসর ভাঙার আগে শিল্পীরা সুরুতে যেমন গৌরচন্দ্রিকা করেছিল তেমনি করে নেয়— একটি পা উঠিয়ে অন্য পায়ের সঞ্চালনের পুনরাবৃত্তি করে নেয়।

অন্যান্য দ্বীপে এই বিপুল একক পদবিন্যাস নৃত্যের আগে বা পরে

করা হয় না, নৃত্যের গতির দিকও নির্দিষ্ট থাকে না, কিন্তু এ ছাড়া অন্য ব্যাপারে কর নিকোবরের নাচের মতই।

বিভিন্ন নাচের পদসঞ্চালনের কোন বিশেষ বৈচিত্র্য নেই। সব নাচই প্রায় একই রকম। তবু নিকোবরীদের কাছে এর গুরুত্ব অসীম। এমন কি সাধারণ কোন উপলক্ষেও যখন নাচ হয় তখন কেউ মুহূর্তের আবেগে হঠাৎ এসে নাচে যোগ দেবে না। একটি বিশেষ নাচ ও গান আগে থেকে যারা অভ্যাস ও অনুশীলন করেছে তারাই শুধু অন্যের সামনে নৃত্যকলা প্রদর্শন করবে।

পুরনো নাচে কোন অঙ্গভঙ্গি নেই। মুখের ভাব প্রকাশের দিকেও ওরা বিশেষ জোর দেয় না। শিল্পীরা অবশ্য তাদের শরীর ও মাথা দোলায়। বিশেষ করে পানোৎসবের পর যখন নৃত্য করে তখন ওরা খুব খোশ মেজাজে থাকে এবং নৃত্যে প্রকাশ পায় আনন্দ। বৃত্ত না ভেঙে তারা সামনে পেছনে সরে সরেও যায়, কখনো বৃত্তের প্রায় কেন্দ্রবিন্দুতে আসে এবং সমস্ত নৃত্যশিল্পীরা খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। কিন্তু মুহূর্তে গানের তালে তালে তারা আবার পেছনে সরে গিয়ে বাহু পূর্ণপ্রসারিত করে দেয়।

এই সাধারণ নৃত্যও তাদের কাছে পরম উপভোগ্য। নৃত্য-গীত এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করতে ওরা অভ্যস্ত হয়ে গেছে, এই জন্যই বোধ হয় পানোৎসবের পর যখন সহজেই দেহ ও মনে উন্মাদনা সঞ্চার হয় তখন ওরা নৃত্য করে। অস্থায়ারী ইত্যাদি ভোজের সময় নারী পুরুষ শিশু সকলেই নাচে, আর নাচের ব্যাপারে ওদের শ্রান্তিহীন উৎসাহ; বোধ হয় সারা রাত প্রায় বিরামহীনভাবে নাচতে পারে।

সম্প্রতি নিকোবরীদের নাচ-গান বিশেষ করে কর নিকোবরে প্রধানত গির্জা ও ফিল্মের দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত হয়েছে।

খৃষ্টধর্ম বিস্তারের পর নিকোবরীতে একটি ধর্মসঙ্গীত গ্রন্থ অনুবাদের পর ভজন গান খুব জনপ্রিয় হয়েছে। চার্চের স্কুলেও নিকোবরী ভাষায় এবং ইংরেজীতে স্তব গান শেখানো হচ্ছে। খুব

শৈশবেই তারা তা শিখেও নিচ্ছে। তারা এই সব সঙ্গীত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করে। বিশেষ ধর্মানুষ্ঠানে চার্চের সাধারণ সার্ভিসের সময়ও স্তবগানের মান খুব উঁচু।

নিকোবরীদের সঙ্গীত-প্রতিভা বড়দিনের সময়ে সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে ভজন গানের মধ্যে। এই সব ভজন গানে নিকোবরীদের স্বাভাবিক সঙ্গীত-প্রতিভা এবং কণ্ঠস্বর, ভক্তি, বিশ্বাস, গভীর ধর্মানুরাগ ও আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। কর নিকোবরে ভজন গান যে-কোন দিক দিয়েই প্রথম শ্রেণীর। বড়দিনের আগে ভজন গান এক সপ্তাহ চলে। এই সময়ে বিভিন্ন গাঁয়ের ভজন গাইয়েরা কখনো-বা এক গাঁয়ের বিভিন্ন দল রাতে সমস্ত দ্বীপের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং পল্লীতে পল্লীতে গান গায়। নর-নারী, শিশু সকলেই এই গানে যোগ দেয়। সাধারণতঃ গাইয়েরা একটি ট্রাক ভাড়া করে কাগজের ও আসল ফুলে সাজায়, পেট্রোমাক্সের আলো জ্বালায়। জাঁকজমকের সঙ্গে তারা রাত্রির সফরে বের হয়। প্রধান প্রধান স্থানে গান গাইবার ও জলখাবারের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকে। গায়কদের আগমনের কোন বার্তা দিতে হয় না। ভজন গানে অংশ নিতে এবং ভিন্ গাঁয়ের গায়কদের স্বাগত জানাতে এরা রাত জাগতে প্রস্তুত।

তবে ভজন গাইয়েরা সরকারী কর্মচারীদের (যাদের কাছে ঘুমের কদরই বেশি) কাছে তাদের পৌঁছাবার সঠিক খবর অগ্রিম পাঠিয়ে দেয়, সাহেবরা সেই অনুযায়ী নিদ্রার সময়টা ঠিক করে নিতে পারে। আর আগে খবর পেয়ে তাদের জন্য চা, সিগ্রেট, জলখাবারের ব্যবস্থা ঠিক করে রাখতে পারে, এমন চমৎকার সঙ্গীত এসব আদর-আপ্যায়ন তো তাদের প্রাপ্য পুরস্কার।

গির্জার সঙ্গীত অধর্মীয় সঙ্গীতকেও প্রভাবান্বিত করেছে। সাধারণ গানেও একটা গম্ভীর সুরের মেজাজ এসেছে।

সঙ্গীতে ছায়াচিত্রের প্রভাবও বিশেষভাবে পরিস্ফুট। নিকোবরীদের অনেক নতুন গানে ছায়াচিত্রের গানের প্রভাব খুব সহজেই বোঝা যায়। রুপালি পর্দায় নাচ দেখার ফলে ওদের নাচেও নতুন

ভঙ্গিমা এসেছে। তা ছাড়াও সঙ্গীতের কান তাদের খুব তৈরী বলে নিকোবরীরা হিন্দী চিত্রের অনেক জনপ্রিয় গানও শিখেছে। দৈনন্দিন জীবনে ওরা সব সময়ই তা গায়। এই সব হিন্দী ছায়াচিত্রের গান বেশ ভালই গায়, যদিও নিকোবরী গানের মত এত ভাল হয় না। বিশেষ 'শ'-এর উচ্চারণ দোষযুক্ত বলে কানে বাজে। তা ছাড়া শব্দগুলি যখন ঠিক ঠিক ধরতে পারে না তখন সুরটা দেয় আরো চড়িয়ে, ফলে গানের সৌন্দর্য অনেকটা হানি হয়।

মাঝে মাঝে কর নিকোবরে এমন নিকোবরী গানও শোনা যায় যার সুর জনপ্রিয় ইংরেজী গানের সুরের অনুকরণে রচিত, যেমন ক্লেসেণ্টাইন, সানি রিভার, বিউটিফুল ব্রাউন আইজ, গুডনাইট আইরীন ইত্যাদি। এটি আশ্চর্যজনক, কারণ সাধারণতঃ নিকোবরীরা কখনো পাশ্চাত্য সঙ্গীত শোনে নি। মনে হয় ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত দ্বীপপুঞ্জে রয়্যাল এয়ার ফোর্স থাকাকালীন সেই স্টেশনে বাজানো রেকর্ড শুনে এসব সুর অনুকরণ করা হয়েছে।

ছায়াচিত্র ছাড়াও কিছু হিন্দী গান স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে শিশুরা শিখেছে, কেউ কেউ আবার ভজন গানও। তাছাড়া ওরা ভাষা শিখতে ও গান শিখে ফেলতে বেশ পটু। বাংলা, তামিল, মালয়ালাম, পাঞ্জাবী ইত্যাদি অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় দু-চার খানা গানও স্কুলের ছেলেরা শিখে ফেলেছে, যদিও গানের অর্থ ওরা বোঝে না।

অনুন্নত জাতির কল্যাণ সাধন পরিকল্পনা অনুসারে নিকোবীরদের নাচ-গান শিক্ষার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হবার ফলে গত দু'বছরে কর-নিকোবরের অধিবাসীরা সঙ্গীত ও নৃত্যকলায় খুবই এগিয়ে গিয়েছে। ভারতের মূল ভূখণ্ডের কিছু জনপ্রিয় নৃত্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের শেখানো হয়েছে। বিশেষ করে পাঞ্জাবের ভাংরা নাচ ছোট ছোট স্কুলের ছেলেরা খুব চমৎকার শিখেছে। এমন নিপুণ ছন্দে এবং আনন্দে ও লাস্যে তারা ভাংরা নাচে যে মূল ভূখণ্ডের সব দর্শকদের প্রচুর হাততালি পায়। স্কুলের মেয়েদের ভারত-

নাট্যম, মণিপুরি ইত্যাদি ধ্রুপদী নৃত্য শেখানো হয়েছে। এসব নাচের কঠিন ছন্দ এবং মুখের যথার্থ ভাব ফুটিয়ে তুলতে অনেক অনুশীলনের আবশ্যক। তবুও বিস্ময়কর ভাবে নাচের উন্নতি হয়েছে।

গান রচনা আরো তাৎপর্যপূর্ণ। নাচ-গানের বিষয়বস্তু নিকোবরীদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়া। তাদেরই মুখের ভাষায় রচিত এবং বেশ মিষ্টি সুর বাঁধা। নিকোবরীদের দৈনন্দিন জীবনের বিষয়বস্তুর উপর রচিত এই সব গানের সুরে যাতে সিনেমার সুরের ছাপ না থাকে এবং সুখশ্রাব্যও হয়, আবার কথার সঙ্গেও সঙ্গতি থাকে সে দিকে সচেতন দৃষ্টি দেওয়া হয়। আশা করা যায় কিছুকাল পরে নিকোবরীরা এই সব নতুন ধরনের গানকে তাদের নিজেদের ঐতিহ্যের অংশ বলে মনে করবে। এই নতুন নিকোবরী নাচ-গান বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

বস্তুতঃ একটি নতুন ধরনের নিকোবরী নাচ-গান বিকশিত হয়ে উঠছে যার মধ্যে এই সব দ্বীপের এবং মূল ভূখণ্ডের নাচ-গানের একটা সমন্বয় সাধিত হয়। এতে ওদের প্রাচীন সঙ্গীত ও নৃত্য অবলুপ্ত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। নতুন ধরনের নিকোবরী নাচ-গান জনপ্রিয় বটে, লোকে দৈনন্দিন জীবনে আধুনিক গানও গায়, তবু প্রাচীনভোজনে ও উৎসবে যখন নাচ-গান হয় তখন তারা তাদের পুরনো ও নিজস্ব নাচ-গানই করে। সরকারী কর্ম্মচারীরা পুরনো নাচ-গানের জন্য সর্বদা প্রয়োজনীয় উৎসাহ দিয়ে থাকেন। স্বাধীনতা দিবসে, গণ্যমান্য লোকেদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিকোবরীদের প্রাচীন নাচ-গানের প্রতিও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দেখানো হয়। নতুন ও পুরনো দুরকম নাচ-গানই ভবিষ্যতে পাশাপাশি চলবে এবং নিকোবরী সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করবে।

নিকোবরীদের কোন প্রাচীন নাটক নেই। সম্প্রতি ছায়াচিত্র দেখে এবং স্কুলের উৎসব-অনুষ্ঠানে শিশুদের দিয়ে করানো ইংরেজী ও হিন্দী নাটক থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়ে কর নিচকাবরে কোন কোন তরুণ নিকোবরীতে ছোট ছোট নাটক রচনা করতে

তৎপর হয়েছে। এসব নাটক বেশীর ভাগই হাস্যরসাত্মক। সবচেয়ে জনপ্রিয় বিষয়বস্তু হল ঝাড়ফুঁকের রোজা এবং অন্যান্য প্রাচীন রীতি রেওয়াজ। স্কুলের ছেলেমেয়েদের দিয়ে করা এই সব হাস্যরসাত্মক চুটকি বা নাটকে এবং হিন্দি ও ইংরেজী নাটকেও নিকোবরীরা অদ্ভুত নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। সব রকম ভাবাবেগই ওরা খুব ভাল ফুটিয়ে তুলতে পারে।

এখন অবশ্য ছায়াচিত্রের চেয়ে বেশি অনুকরণ ওদের কাছে আর কিছুতে নেই। এটা আজকাল চিত্তবিনোদনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। গ্রামে বিদ্যুতের চল না হওয়াতে এই দ্বীপপুঞ্জের খুব কম লোকই সিনেমা দেখতে পারে। এ বিষয়ে কর নিকোবরের লোকেরা বেশী ভাগ্যবান। সরকারী প্রশাসনিক হেড কোয়ার্টার এলাকা, ভারতীয় বিমান বাহিনীর স্টেশন এবং ট্রেডিং কোম্পানির চুক চুকিয়া গ্রাম হেড কোয়ার্টারে বিজলী আছে এবং লোকে সেখানে আয়োজিত সাপ্তাহিক ফিল্ম শো দেখতে পারে। একটি ছোট ও আধা ভ্রাম্যমাণ জেনারেটরের সাহায্যে প্রতি সপ্তাহে বড় লাপাটি গ্রামে কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রে ছায়াচিত্র দেখানো সম্ভব হয়, কখনো-বা অন্যান্য গ্রামেও।

অন্যান্য দ্বীপের লোকেদের মধ্যে নান কাউরি ট্রেডিং কোম্পানির হেড কোয়ার্টার নান কাউরির চাম্পিনে বিজলী থাকায় শুধু সেখানকার লোকেরা মাঝে মাঝে পুরনো ছায়াচিত্র দেখে। এই সব ছবির রীল ট্রেডিং কোম্পানি নিজেদের কর্মচারীদের চিত্তবিনোদনের জন্য সোজাসুজি কিনে আনে। তবে সরকার একটি ভ্রাম্যমাণ প্রজেক্টর এবং জেনারেটর অন্যান্য দ্বীপের জন্যও কিনেছেন এবং অচিরেই এসব দ্বীপের লোকেরাও ছায়াছবি বিশেষ করে প্রামাণিক চিত্র দেখতে পাবে।

ছবি প্রায় সময়ই খোলা জায়গায় দেখানো হয়। বর্ষার সময়ে অবশ্য, কর নিকোবরের কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার কেন্দ্রে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। নিকোবরীদের আগেভাগে খবর দিতে হয় না।

শুধু পর্দাটি টাঙানো হলেই কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত শত লোক এসে জমা হয়।

কর নিকোবরে সরকারের তুটি প্রজেক্টরে প্রামাণিক চিত্র দেখানো হয়। কখনো প্রামাণিক চিত্রের মূল বিষয় নিকোবরীতে আগেই টেপ রেকর্ড করে নেওয়া হয়, তারপর শো দেখানোর সময় তা বাজানো হয়।

লোকের মনে ছায়াচিত্রের প্রগাঢ় প্রভাব পড়ে আর প্রামাণিক চিত্রগুলি খুবই শিক্ষামূলক। তাই এসব ছবি দেখে নিকোবরীরা দেশের অন্যান্য অংশের লোকেদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানতে পারে।

কর নিকোবরে ছায়াচিত্র প্রদর্শনীতে প্রামাণিক চিত্র ছাড়াও কাহিনী-চিত্র দেখানো হয়। সপ্তাহে একদিন কাহিনী-চিত্র ভারতীয় বিমান বাহিনীর বিমানে বারাকপুর থেকে আনা হয়। সরকারী চাকুরে এবং ট্রেডিং কোম্পানির কর্মচারীরাই এর খরচ চালায়। নিকোবরীরাও এসব ছবি দেখতে পারে, কারণ তারাই তো বেশীর ভাগ দর্শক।

নিকোবরীরা যে-কোন ভাষার যে-কোন ছবি দেখে। কিন্তু তারা সবচেয়ে হিন্দী ছবি পছন্দ করে। তারা হিন্দী যে বেশ বোঝে তাই নয়, হিন্দী ছবির গান এক বিশেষ আকর্ষণ।

সামাজিক ও ট্র্যাজিক ছবি ওদের অন্তর স্পর্শ করে না। ওরা পছন্দ করে হাস্যরসাত্মক ছবি, কারণ তারা হাসতে ভালবাসে। হৈ-চৈ ও লড়াইতে ভরা থ্রিলারও ওদের পছন্দ। এটা আশ্চর্যজনক কেননা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনে ওরা সবরকমভাবে হিংসা এড়িয়ে চলে।

নিকোবরী দর্শকরা বড়ই মজার। ধৈর্য ও শৃঙ্খলাবোধ উল্লেখ করার মত। ছেলে বুড়ো সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিনেমা দেখার সময় ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারে। যদি বিজলী বন্ধ হয়ে যায়, ফিল্ম (সাধারণতঃ পুরনো বলে) কেটে যায়, এবং প্রজেক্টরের

গোলমাল হয় তবে তাদের মধ্যে একটু গুঞ্জনধ্বনিও শোনা যায় না। খোলা জায়গায় ছবি দেখাবার সময় হঠাৎ বৃষ্টি নামলেও ওদের কোন অসুবিধা হয় না। যেসব মেয়ে ছোট ছোট শিশু নিয়ে আসে তারা চট করে ছাতা খুলে বসে। যারা সবল তারা গ্রাহ্যই করে না—সবাই বৃষ্টির মধ্যেই বসে থাকে। কোলের শিশুরা পর্যন্ত শান্ত হয়ে দেখে। ওরা অনেক শিশুকেই ছবি দেখাতে নিয়ে আসে। অন্যান্য জায়গার শিশুদের মত এরা উচ্চস্বরে কেঁদে উঠে অন্যদের ব্যাঘাত ঘটায় না। শ্রোতাদের মধ্যে কেউ কথা বলে না কারণ প্রত্যেকেই ছবি দেখতে মগ্ন। কিন্তু ছবি দেখে তাদের যে প্রতিক্রিয়া হয় তা ওরা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করে। দ্বীপে আগে দেখানো হয়েছে এমন ছবি প্রায়ই আসে। যারা গানগুলির সঙ্গে পরিচিত এবং গানগুলি বেশ মনে রাখে সেই সব তরুণ গুন গুন করে সঙ্গে সঙ্গে গাইতে থাকে।

মাঝে মাঝে শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া আরো মজার হয় কারণ অনেকে বিশেষতঃ মেয়েরা ছবির কাহিনী ঠিক বুঝতে পারে না এবং তখন তাদের মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হতে দেখা যায়। ফলে হিন্দী ছবির তথাকথিত নিবিড় করুণরসপূর্ণ দৃশ্যে হয়তো হাসি সুরু হয়ে গেল। সত্যি সত্যি অধিকাংশ ছবির হাস্যকর মেলোড্রামায় এর বেশি কিছু প্রত্যাশাও করা যায় না। আবার কমেডির কিছু হাস্যরসাত্মক চিত্রে হাসির নায়ককে যখন সব রকম অসম্ভব পরিস্থিতিতে ফেলা হয়, তখন হয়তো সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। প্রথম যখন কেউ নিকোবরীদের সঙ্গে সিনেমা দেখে তখন পর্দার নীরস ঘটনাবলীর চেয়ে শ্রোতাদের অপূর্ব প্রতিক্রিয়া দেখতে বেশী উৎসাহী হয়ে ওঠে এবং যা অভিজ্ঞতা লাভ করে তা বহুদিন ভুলতে পারে না।

ষোড়শ অধ্যায়

ধর্ম

ঠিক ধর্ম বলতে যা বোঝায় অতীতে নিকোবরীদের সেরকম কিছু ছিল না। যা ছিল তাকে বলা যেতে পারে সর্বপ্রাণবাদ, অচেতন পদার্থেও প্রাণ আরোপ। অন্যান্য আদিম জাতির মত নিকোবরীরা সর্বদাই যেন একটা ভয়ের মধ্যে বাস করত। সমস্ত প্রাকৃতিক ব্যাপারটাই প্রেতাত্মাদের কাজ বলে মনে করত। ঝাড়ফুঁকের রোজা ছিল। তারা লোকের মনে ভূত-প্রেতের ভয় ঢোকাত। ভূত-প্রেত দমন করছে দেখিয়ে লোকেদের শোষণ করত। ভূত-প্রেত ঝাড়ার জন্য কত রকমের যে কাজ-কারবার ছিল, তার ইয়ত্তা নেই। তার সঙ্গে শূকর-মুরগী বলি আর রোজাদের অদ্ভুত নৃত্য। ওদের এই প্রাচীন ধর্মের তাৎপর্য ভাল প্রেতদের খুশি করা। তারা ভাবত, এরা খুশি হলে সেই শয়তান ভূত-প্রেতদের বিতাড়িত করবে, কারণ তাদের ধারণা শয়তান ভূত-প্রেতই সকল দুঃখকষ্টের মূল। কর নিকোবরে এই সব পুরনো রীতিনীতি অধুনা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। তবে অন্যান্য দ্বীপের কোথাও কোথাও এসব এখনো চলছে।

কর নিকোবরে জনা কয়েক মুসলমান, যারা অতীতে মুসলমান ব্যবসায়ীদের (বিশেষ করে মিনিকয় ও লাক্ষাদিভে দ্বীপের) সঙ্গে নিকোবরী মেয়েদের বিবাহের ফলে জাত, তারা ছাড়া বাকি সবাই খৃষ্টান। হিসাব করা হয়েছে কর নিকোবরে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা মাত্র দু'ভাগ, বাকি সবাই খৃষ্টান। অন্যান্য দ্বীপে মুসলমানের সংখ্যা নেহাৎই কম। বলতে গেলে অর্ধেক লোকই এখনো তাদের প্রাচীন ভূত-প্রেতের বিশ্বাস নিয়ে আছে, বাকি অর্ধেক লোক খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত। মোটামুটি সব দ্বীপের কথা ধরলে খৃষ্টধর্মই এখন প্রধান ধর্ম। শতকরা আশি জন লোক খৃষ্টধর্মাবলম্বী। হিন্দু

কেউ নেই, একমাত্র ব্যাতিক্রম বোধ হয় রানী চাঙ্গা, যিনি কাচাল দ্বীপের আদিবাসী রানী। তাঁরই সহায়তায় ওয়েস্ট বে কাচালে একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মে তাঁর কতটা গভীর বিশ্বাস তা বলা কঠিন, কারণ তাঁর ছেলেরা সবাই খৃষ্টান। তিনি নিজেও হিন্দু ধর্ম সম্যক বোঝেন কিনা তাও সন্দেহজনক।

খৃষ্টধর্ম বিস্তারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। বহু শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য মিশনারীরা এই সব দ্বীপে কাজ করছিল। তবু এখানে খৃষ্টধর্ম প্রধানতঃ ভারতীয় মিশনারীদের চেষ্টার ফলেই প্রচারিত হয়েছে। এজেন্ট বেদাপ্পান সলোমন ও তাঁর স্ত্রী—যাঁরা এ কাজে সংশ্লিষ্ট ছিলেন—তাঁরা দক্ষিণ-ভারতীয়। বিশপ রিচার্ডসন, যিনি খৃষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য দায়ী, তিনি একজন নিকোবরী এবং ভারতীয়।

অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতার পরবর্তী কালে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিশপ রিচার্ডসনের (যিনি দুবার জাপানীদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন) নেতৃত্বে কয়েকজন খৃষ্টানের বীরত্বের জন্য খৃষ্টধর্মকে লোকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে সুরু করেছে। যুদ্ধের শেষে কয়েক বছরের মধ্যে ব্যাপকভাবে লোকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হতে সুরু করে।

ব্যাপকভাবে খৃষ্টধর্ম বিস্তারের আরো একটা কারণ এই যে নিকোবরীদের পুরনো ধর্ম তেমন সন্তোষজনক ছিল না এবং ওতে ওদের প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা মিলত না। ভূত-প্রেতে অতিরিক্ত বিশ্বাসের জন্য সর্বদাই একটা মানসিক ভীত অনেকেরই অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ঝাড়ফুঁকের ওঝারা মন্ত্র-তন্ত্র পড়ে যে ভূত-প্রেতদের আহ্বান করছে বলে দাবী করত তাতেও কিছু লোকের মনে সংশয় জেগেছিল। ক্রমে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সংযোগের ফলে পুরনো রীতি-নীতিতে লোকের বিশ্বাস ভেঙে যেতে লাগলো। লোকেদের মনে নিজেদের অজ্ঞাতেই প্রকৃত আধ্যাত্মিক

তৃষ্ণা জাগতে সুরু হল। এমনি করে নতুন ধর্ম বিস্তারের পক্ষে একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠল এবং যদি সে সময় খৃষ্টান ধর্মের মতই পৃথিবীর অন্য কোন প্রধান ধর্মমত প্রচারে কেউ বদ্ধপরিকর হত এবং বিশপ রিচার্ডসনের মত কোন প্রচারক পেত তবে খুব সম্ভবতঃ সেই ধর্মই এই দ্বীপপুঞ্জে প্রচারিত হতে পারতো।

অবশ্য খৃষ্টান ধর্মের প্রচার সর্বত্রই যে বিনা বাধায় হতে পেরেছে তা নয়। চাওড়াতে, যেখানে ঝাড়ফুঁকের রোজারা সর্বদাই প্রবল প্রতাপশালী, সেখানে ওদের রক্ষণশীলতার মধ্যে খৃষ্টধর্ম প্রবেশ করতে বেশ বেগ পেয়েছে। ওই দ্বীপের লোকেরা এখন দুটি স্পষ্ট দলে বিভক্ত। প্রথমটি দ্বীপের প্রধান মোড়লের দ্বারা পরিচালিত খৃষ্টধর্ম এবং এরা নতুন পরিবর্তন ও উন্নয়ন-মূলক কাজকর্ম সমর্থন করে। দ্বিতীয় দলে সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্রের ওঝারা এবং অসন্তুষ্ট প্রাক্তন মোড়লরা। এদের আস্থা পুরনো মন্ত্রতন্ত্রে, ভূতপ্রেতে। সব রকম পরিবর্তন ও উন্নয়নমূলক কাজে বাধা দেওয়া এদের কাজ। যদিও প্রথম দল ক্রমেই সবল হয়ে উঠছে, তবু এখনো এদের সামনে অনেক বাধা এবং দু'দলের মধ্যে যথেষ্ট বিরোধ।

এখন খৃষ্টধর্মের ভিত্তি কর নিকোবরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হওয়ায় মিশনারীদের কার্যকলাপের ক্ষেত্র অন্যান্য দ্বীপে স্থানান্তরিত হয়েছে। বিশপ রিচার্ডসনের নেতৃত্বে সেবাকার্যে উৎসর্গীকৃত কয়েকজন নিকোবরী ও অন্যান্য দ্বীপের তরুণ এই মিশনারী কাজ চালাচ্ছে। এরা খুব অল্প বয়স থেকে কর নিকোবরে বিদ্যা ও ধর্মীয় নির্দেশ লাভ করেছে। এই প্রচেষ্টার ফলে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থানেও, বিশেষ করে নান কাউরি, কামোরটা, কাচাল ও চাওড়াতে খৃষ্টধর্ম প্রচার লাভ করেছে।

নিকোবরী খৃষ্টানরা চার্চ অফ্ ইণ্ডিয়ার অন্তর্গত প্রটেষ্টাণ্ট। এই চার্চ প্রাক্-স্বাধীনতাকালে অ্যাংলিকান চার্চের অধীনে ছিল। ১৯৬৬ সালের পনেরই মার্চ থেকে আন্দামান ও নিকোবর

দ্বীপপুঞ্জের এলাকা একজন স্বাধীন বিশপের দ্বারা পরিচালিত, আলাদা ডাইওসিস হয়ে গিয়েছে।

খৃষ্টধর্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপপুঞ্জে গির্জার সংখ্যাও বেড়েছে। কর নিকোবরে এখন দশটি গির্জা, কাচালে ছুটি, চাওড়া ও নান কাউরিতে একটি। এক-একজন ঈশাই সন্তের নামে নানা গির্জার নানা নাম দেওয়া হয়েছে। সেই সন্তের জন্মদিবস সংশ্লিষ্ট গির্জায় প্রচুর উৎসাহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে গির্জার সংগঠনে সারাক্ষণের কর্মী যেমন পুরোহিত ও তার নীচে ধর্মযাজক। তা ছাড়া ধর্মোপদেশকও আছেন। এঁরা আংশিক সময়ের জন্য কাজ করেন। আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান এবং নিকোবরীদের স্বাভাবিক চরিত্রের সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাইরে থেকে কোন সাহায্য নেওয়া হয় না। বারো বছরের উপর প্রত্যেক দীক্ষিত খৃষ্টান মাসে কম করে দশ পয়সা দান করে। বিশেষ উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। লোকে উদারভাবে দেয়ও। সন্তদের জন্মদিনে বিভিন্ন গির্জায় বাজার বসিয়ে যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহ করা হয়। সেই সব জায়গায় প্রস্তুত জিনিসপত্রের খুব ভাল বিক্রী হয়।

বিভিন্ন গির্জায় যে অর্থ সংগৃহীত হয় তা একটি কেন্দ্রীয় গির্জা তহবিলে জমা হয়। সেখান থেকে গির্জার কর্মীদের বেতন, চার্চের দ্বারা ভারতের মূল ভূখণ্ডে প্রেরিত কিছু সংখ্যক ছাত্রের শিক্ষার খরচ, চার্চের গৃহ সংস্কার সংরক্ষণের খরচপত্র ইত্যাদি সব কিছুর বিলি ব্যবস্থা হয়।

প্রত্যেক চার্চের দিনে ছুটি সার্ভিস বা ছুবার উপাসনা হয়। তা ছাড়া রবিবার ও খৃষ্টানদের বিশেষ ধর্মীয় দিবসে বিশেষ সার্ভিস। সব সার্ভিসেই প্রচুর লোকসমাগম হয়। বিশেষ বিশেষ পর্বে যেমন বড়দিন, নববর্ষ, গুড ফ্রাইডে, ইষ্টার এবং অল সোল্স ডে, অল্পবিস্তর অন্যান্য স্থানের মতই উদ্‌যাপিত হয়।

নিকোবরীদের সম্বন্ধে লোকেরা বলে যে, ওরা রবিবার দিন

খৃষ্টান এবং অন্য সব দিনে নিকোবরী। এরকম মন্তব্য অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর যদিও এর কিছুটা সত্য। নিকোবরীরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে। তাদের জীবন-যাপনে, রীতি-নীতি এমন কি কিছু পুরানো বিশ্বাস সব আগের মতই আছে। তবু খৃষ্টধর্ম তারা হঠাৎ গ্রহণ করেছে এটা ভাবা ভুল। অবশ্য রবিবার ছাড়া অন্যান্য দিনে এটা ওরা ভুলে যায়। সাম্প্রতিক প্রচারের ফলে দ্বীপে খৃষ্টধর্ম এখনো একটা প্রবল শক্তি এবং খৃষ্টধর্ম ওদের লোকের জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করতে পারলেও এর প্রভাব নিঃসন্দেহে অনেকখানি পড়েছে।

অধিকাংশ সরল লোকের মত নিকোবরীরা ধর্মকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলেই মনে করে। তাদের বিশ্বাসের আন্তরিকতা ও আবেগ যে-কোন নিরপেক্ষ দর্শকের কাছেই সুস্পষ্ট। তারা নিয়মিত চার্চে যায়। অত্যন্ত উৎসাহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সমস্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। প্রায় সব খৃষ্টানের বাড়ীতে যীশুর ছবি এবং অনেকেই ক্রশ পরে। ভাল ভাল নিকোবরী তরুণ বর্তমানে গির্জার কাজে যাচ্ছে। যে রীতি-নীতির সঙ্গে খৃষ্টধর্মের বিরোধ ছিল ওরা সে সবও পরিত্যাগ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা সমস্ত পৃথিবী সম্পর্কে ওদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে, সর্বদা সব রকমের ভূত-প্রেত পিশাচাদির ভয়ে ভীত না থেকে তাদের এখন সর্বময় ঈশ্বরের পরম পিতার অধীনে থাকার পরম বিশ্বাস এসেছে। এই জ্ঞান ও বিশ্বাসেই ওদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আত্মা সম্বন্ধে একটা ধারণা হবার ফলে মানুষের জীবন হয়েছে অর্থময়। তাই বাইরের দিক থেকে নিকোবরীরা আগের মত রয়ে গেলেও অন্তরের ভারসাম্য রক্ষায় ওরা এখন আলাদা মানুষ।

নিকোবরীরা অনেক প্রাচীন উৎসব পালন করে। যদিও পালনের পদ্ধতি দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে পৃথক, তবু মূলতঃ এক।

আগে ভূতপ্রেত আহ্বানের ক্রিয়াকলাপে এই সব উৎসবের একটি বিশেষ অংশ ছিল কিন্তু ধর্মান্তরিত হবার ফলে এই সব কার্যকলাপ অধিকাংশ স্থানে বর্জিত।

কর নিকোবরের উৎসবগুলি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, কারণ এই দ্বীপের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশী বলে ওরা অনেক বেশী জাঁকজমকের সঙ্গে উৎসবানুষ্ঠানগুলি পালন করে। প্রাচীন উৎসবে যা পালন করা হয় তার মধ্যে কয়েকটি ঋতু-উৎসব। এই সব উৎসব বিভিন্ন গাঁয়ে বছরের নির্দিষ্ট দিনে অনুষ্ঠিত হয়, যদিও অন্যান্য গাঁয়ের লোকেরাও এতে যোগ দেয়। উৎসবে প্রচুর পানভোজন করা হয়। অধিকাংশ উৎসবেই নাচ। নিমন্ত্রণকারী পল্লী, নাচবার জন্য বিশেষ কোন পল্লীর লোকেদের বেছে বেছে নিমন্ত্রণ করে। এইভাবে সমস্ত দ্বীপের লোকেরা ক্রমে উৎসবে যোগদান করে তবু নিমন্ত্রণকারী এবং নিমন্ত্রিত এই দুই গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ দেখা যায়।

এইসব উৎসব পালনের মূল ভাবটি হল ঋতু পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা এবং সর্বসাধারণের পানভোজনের আনন্দ-উৎসব। কিছু উৎসব আবার বিশেষ কোন ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্যও। তবে লোকেরা হয়তো এইসব স্মরণীয় ঘটনা ভুলে গিয়ে থাকবে। তাই আজকাল উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দ করা।

ফসল ওঠা উপলক্ষেও এসব উৎসব। লোকেরা আগের বছরের ফল, ফসল, সব্জী ও ক্ষেতে উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য ভূমির দেবতাকে ধন্যবাদ জানায় এবং আগামী বছরে সমৃদ্ধি ও ভাল ফসলের জন্য ভূমির দেবতাকে আহ্বান করে ও আশীর্বাদ চায়।

ভূমি দেবতাকে এই ধন্যবাদ দেওয়া এবং আরো দাক্ষিণ্যের জন্য তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে দুটি ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে— 'কুনসিয্যোরো' এবং 'কানাচা'। ঋতুর উৎসব সুরু হবার দিনে 'কিউস্যো' নামে হালুয়ার মত একটি জিনিস তৈরী করে, মিষ্টি আলু, পাকা কাঁঠাল এবং পাকা কলা ইত্যাদি ক্ষেত্রজ জিনিস নারকেল

তেলে মিশিয়ে। এই মিশ্রিত দ্রব্য চাপড়ার বিশাল মাটির পাত্রে রান্না হয়। রান্না হয়ে এলে এর মধ্যে তেঁতুল দেয়। এই হালুয়া তৈরী করাকে 'কুনসিয়্যেরো' বলে।

'কিউস্যো' হালুয়া শুধু খাওয়াই হয় না, পরের দিন ভোরে পাত্র থেকে তুলে নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া 'কানাচা'রের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এতে ক্ষেত আবাদের উৎপন্ন জিনিস যেমন কলা, পান্তানাস, মিষ্টি আলু, নারকেল এবং অন্যান্য ফল ও সব্জি ঘরে ঝোলান থাকে। আঙ্গুল দিয়ে 'কিউস্যো' হালুয়া একটু তুলে নিয়ে এইসব ফলের মাথায় লাগান হয়। 'কুমো'—মানে ছোট নারকেলও নেওয়া হয় এবং 'কিউস্যো' শূকরের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে। তারপর প্রায় সাত দিন ধরে এই রকম ছোট নারকেল, নারকেল পাতায় বেঁধে ঘরের মধ্যে ও ঘরের নীচে ঝুলিয়ে রাখা হয়।

ফল, সব্জি ও ছোট নারকেলের ওপর এই 'কিউস্যো' ছড়িয়ে রাখার কাজটিই হল 'কানাচা'। এতে ভবিষ্যতে ভাল ফসল হবে সমৃদ্ধি হবে। এটা ওরা বিশ্বাস করে।

ঘরে ঝুলিয়ে রাখা ফল, তরকারী, নারকেল ও মিষ্টি আলু ছাড়া বাকি সব ওরা খেয়ে ফেলে। সাধারণ নারকেলগুলি জমিতে লাগানর জন্য রেখে দেওয়া হয় কারণ ওরা বিশ্বাস করে যে নারকেল-গুলির 'কানাচা' হয়ে গেছে এবং ভূমি দেবতার আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত গাছে ভাল ফলন হবে। তেমনি মিষ্টি আলুও খায় না, পরের বার জমিতে লাগানর জন্য রেখে দেয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঋতু উৎসবের পরেই বীজ বপন করার সময়ও এসে যায়।

খুব কচি ডাবের নাম 'কুমো'। সেগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। পরিবারের একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সেগুলি পরিবারের একদল ছেলেদের দিকে ছুঁড়ে দেয়। ছেলেরা সেগুলি মাটিতে বর্শাবিদ্ধ করার অভ্যেস করে—সেটাই উদ্দেশ্য।

'কুনসিয়্যেরো' এবং 'কানাচা'র সব উৎসবেরই সূচনা করে শুধু

প্রথমটি ছাড়া। এটার নাম 'কিনটোফাঙ', ফসল উৎসবের চেয়েও এর গুরুত্ব নববর্ষ পালনে।

সমস্ত ঋতু উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সময়ে অথবা একেবারে তার প্রাক্কালে। কারণ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে লোকের বীজ বোনার সময়। মাছ ধরার কার্য্যসূচী ঠিক করার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। উৎসবগুলি পালন করা হয় যেন মৌসুমী বায়ুর অগ্রদূত হিসাবে এবং মৌসুমি বায়ুর নানা রূপকে চিহ্নিত করতে। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুর গুরুগম্ভীর রূপ, প্রচণ্ড বাতাস ও প্রবল বর্ষণ বোধ হয় আদিম মানুষদের মনে অধিকতর ত্রাসের সঞ্চার করে থাকবে। তাই হয়ত তারা দেবতাদের কাছ থেকে দাক্ষিণ্য পাবার আশায় উপলক্ষ খুঁজতো।

কর নিকোবরের বিভিন্ন-ঋতু উৎসবের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিবরণ পরিশিষ্টে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ঋতু উৎসব ছাড়াও আরো অনেক উৎসব হয়। তাদের বলা হয় 'বড়দিন'। নানা রকমের বড়দিন। কিছু বড়দিনে পারিবারিক ভোজ, যাতে পরিবারের লোকেরা ও বন্ধু-বান্ধবরা যোগ দেয়। অন্যগুলিতে সমস্ত গ্রাম ও অন্য জনপদের বাসিন্দাদেরও ডাকা হয়। এইসব ভোজে প্রচুর আহার, তাড়ি পান ও গান চলে। এ ধরণের অধিকাংশ ভোজই মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত। পূর্ব্বে মৃতদেহের অস্থি নিয়ে পুনরায় প্রোথিত করা হত। এ প্রথা কর নিকোবরে এখন আর নেই, অনেক জায়গায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলেও বর্জ্জিত হয়েছে।

সবচেয়ে প্রধান ভোজ হল নিঃসন্দেহে কলা আঁ হা উঁ (শূকর ভোজন) অথবা 'অস্ন্যয়ারি' ভোজ। পূর্ব্বপুরুষদের স্মরণে এই ভোজের অনুষ্ঠান। উত্তর পুরুষদের মঙ্গলের জন্য তারা যে সমস্ত ভাল ভাল জিনিস করে গেছেন যেমন নারকেল, পান্তানাস ইত্যাদি ফলবান বৃক্ষ রোপণ তার স্মরণে এসব উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানান হয়। আগে পূর্ব্বপুরুষদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হত। তাতে সব রকমের খাদ্যবস্তু টাঙ্গানো

হত। এমনকি ভোজের পরেও এই সব খুঁটির উপরে বাঁধা আহার্য্যদ্রব্য স্পর্শ করা হত না। ওগুলো পচে যেত, কারণ পূর্ব্বপুরুষের প্রেত এসে ওগুলো খাবে বলে ওদের ধারণা ছিল। এখন ধর্ম্মান্তর এবং খাদ্যদ্রব্য অপচয় করা অনুচিত ক্রমশ এই চেতনা জাগার ফলে এই অভ্যাস বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রথা লোকেরা পরিত্যাগ করেছে। অবশ্য এখনো পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভোজ হয়। তবে আয়োজন খুব একটা করে না এবং লোকে প্রধানত নাচ-গান পান-ভোজন হৈ-হৈল্লা করে আনন্দ করে।

এই উৎসব পালনের আর একটি উদ্দেশ্য দ্বীপের একতার ওপর জোর দেওয়া এবং লোককে মনে করিয়ে দেওয়া যে তারা একটি বড় পরিবারের অংশ এবং একই পূর্ব্বপুরুষ থেকে সকলে উদ্ভূত। তাই এই উৎসবে গাঁয়ের প্রতি পরিবার দ্বীপের অন্যান্য গাঁয়ের পরিবারের বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণ জানায়। এমনি করে দ্বীপের প্রায় সবাই যৌথভাবে এই ভোজের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে এবং এতে একতাবোধ আরো সুদৃঢ় হয়।

এই ভোজের অনুষ্ঠান পালন করার কোন নির্দ্দিষ্ট দিন নেই, এ উৎসব একটি গাঁয়ের জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করার সামর্থ্য ও সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে। ভোজের জন্য যখন যথেষ্ঠ শূকর, প্রচুর মিষ্টি আলু, নারকেল এবং অন্যান্য ফল-সব্জি থাকে এবং দ্বীপের প্রায় সব লোককে নিমন্ত্রণ করতে পারে তখনই ওরা এই বিরাট ভোজের উৎসবের আয়োজন করে। সেইজন্য সারা বছরে কোন 'কা-না আঁ-হাঁ উ' উৎসব দ্বীপের কোন গাঁয়ে হলই নয়, এমনও হয়। যখন কোন বিশেষ জনপদ এই উৎসব পালন করতে চায় এবং বড়রা যদি ইতিমধ্যেই এ সম্বন্ধে আলোচনা করে ফেলে, তখন তারা অন্যান্য গ্রামের লোকেদের অগ্রিম সংবাদ দেয়। সকলের সুবিধা অনুযায়ী একটি দিন নির্দিষ্ট করে, সাধারণত পূর্ণিমার দিন।

এই ভোজের প্রস্তুতিতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং ভোজের তারিখের অনেক আগেই আয়োজন-পর্ব সুরু হয়ে যায়। গাঁয়ের বিভিন্ন পরিবারের প্রধান ব্যক্তিদের অন্যান্য গাঁয়ে তাদের পারিবারিক বন্ধু-বান্ধবদের দেখাশোনার ভার দেওয়া হয়। এমনি করে দ্বীপের সব লোকের প্রতি আতিথ্যের সুব্যবস্থা করা হয়।

উৎসবের প্রায় এক মাস আগে গাঁয়ের বিভিন্ন পরিবারের কোন কোন লোক আবার অন্যান্য গ্রামে গিয়ে তাদের পরিবারিক বন্ধুদের আসন্ন ভোজের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই ভোজের একটি বিশেষ কাজ শূকরের লড়াই, যেটি কখনো প্রাচীন কাল থেকে আর অন্য কোনভাবে হয়নি বা হয়ও না। ভোজের দিন এগিয়ে এলে, গ্রামের মাঝখানে খোলা জায়গায় যে শূকরের খোঁয়ার করা হয়, সেগুলির দরজা খুলে দেওয়া হয়। খোঁয়ারগুলি জঙ্গলের কাঠ দিয়ে তৈরী করে এবং উৎসবের দিন কচি নারকেল পাতায় সুন্দর করে সাজায়। নিমন্ত্রণকারী গাঁয়ের পুরুষেরা ভোজের দুই তিন দিন আগে ফাঁস বা বাঁকা লাঠি দিয়ে বুনো শূকর ধরে শূকরের লড়াইর জন্য। খাওয়ার জন্যও অন্য শূকর ধরা হয়।

ভোজ সন্ধ্যাবেলা সুরু হয় কিন্তু সকাল থেকেই অতিথিরা আসতে সুরু করে। কাজেকর্ম্মে পল্লী সরগরম হয়ে ওঠে। সারা গ্রাম সাজান হয়। বেশির ভাগই কচি নারকেল পল্লবে। একটি বিশেষ সজ্জা হল নিমন্ত্রণকারী গাঁয়ের লোকেদের কাপড় ও চামচ-কাঁটার বাহার দেখানো। গ্রামের মাঝখানে যেখানে প্রধান উৎসব সম্পন্ন হয় সেখানে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু খুঁটি গাড়া হয়। খুঁটিগুলির মাথায় নানা রঙের রেশমি কাপড় টাঙান হয়। কাপড় যাতে নীচের দিকে ঠিকমত পড়ে ও যথাযথ থাকে সেজন্য খুঁটিগুলির নীচের ধার থেকে চকচকে রূপোর চামচ-কাঁটা ঝুলিয়ে দেয়। একটু অদ্ভুত ধরণের দেখতে হলেও সাজানর দিক থেকে গাঁয়ের মাঝখানটাই ভাল। মাঝে মাঝে কোন কোন গৃহের নীচে একটি

ছোট নৌকো সব রকম খাদ্যবস্তু ও গৃহের নানা উপকরণাদি দিয়ে ভরে সাজিয়ে রাখে। ভোজ্যবস্তুগুলো হয় ভোজের সময়ে, নয়ত পরে খেয়ে ফেলে।

আলোর ব্যবস্থাও প্রচুর। উৎসবের স্থানে চারদিকে রাশি রাশি নারকেলের মালা জ্বালান হয়। গাঁয়ের সমস্ত পেট্রোমাক্স ও লণ্ঠন জ্বালায়। সমস্ত জনপদ ঘিরে এবং লোকের বাড়ীঘরে আলোক সজ্জার সমারোহ। ক্রমে উৎসবের আবহাওয়ায় আনন্দে মুখর হয়ে ওঠে।

ভোরবেলা থেকে ভোজের রান্না সুরু হয়ে যায়। প্রধান খাদ্য শূকরের মাংস, তবে মিষ্টি আলু এবং অন্যান্য তরকারীও রান্না হয়। প্রত্যেক পরিবার বড় বড় চাওড়ার পাত্রে অন্য গাঁ থেকে ভোজ উপলক্ষে আগত পারিবারিক বন্ধু-বান্ধবদের জন্য রান্না করে। কিছু অতিথি আগেভাগে এসে শূকর মারতে এবং শূকর, সব্জি, নারকেল ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসে, যদিও বাধ্যতামূলক নয়। অতিথিরা যে খাবার নিয়ে আসে তারও সদ্ব্যবহার করা হয়। রান্না আগাগোড়াই চলতে থাকে।

নরনারী-শিশু সকলেই উত্তম পোষাক পরে এবং মালা, ফুলের, নারকেলের ও কদলি পত্রের মুকুট। কেউ কেউ আবার প্রাচীন অলঙ্কারও পরে। প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সাজগোজ করে।

অধিকাংশ অতিথি সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে আসার পরেই আসে, যদিও অতিথিরা অনেক রাত্রি পর্যন্তও আসতে থাকে। তরুণেরা চিরাচরিত প্রথায় খুঁটির তলায় কচি নারকেল পাতা লাগিয়ে তাতে শূকর বেঁধে নিয়ে আসে। কখনো-বা ছোট শিশুদেরও ভাল পোষাকে ও পুরনো গয়নায় সাজিয়ে দুটি খুঁটির ওপর শূকরের পাশে বসিয়ে বয়ে নিয়ে আসে। সম্প্রতি যে সব প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, যাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ভোজের অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে, তাদের ছেলেপিলেদেরই এইভাবে সম্মানের সঙ্গে বসিয়ে আনা হয়। যে সব তরুণেরা শূকর বয়ে নিয়ে আসে তারা বেশ খুশী

থাকে এবং শূকরের প্রশস্তিতে রচিত গান গাইতে গাইতে আসে। কখনো কাঠের খাঁচায়ও শূকর রেখে বয়ে নিয়ে আসে। একটি-দুটি যুবক—খাঁচার মাথায় বসে বা খাঁচার ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আসে। শূকরদের সারা গাঁয়ে ঘোরানো হয় যাতে সারা গ্রামবাসী তাদের দেখতে ও তারিফ করতে পারে।

শূকরদের খাঁচায় জমা করে দেওয়া হয়। অতিথিরা তাদের পারিবারিক বন্ধুদের বাড়ীতে তাদের জন্য রান্না করা খাবার খেতে সুরু করে। খাদ্য পানীয় সব বাড়ীতেই রাখা। ভোজে যোগদানকারী লোকেরা কোন লৌকিকতা বা জিজ্ঞাসাবাদের ধার ধারে না। তারা খাদ্যের সদ্ব্যবহার করবে এটাই আশা করা হয়। পাশাপাশি তাড়ি খাওয়ার পালা চলতে থাকে এবং চলে রাত-ভোর।

নাচ-গানও সুরু হয়। গাঁয়ের লোকেরা খুব বেশী ব্যস্ত থাকে বলে নিজেরা নাচতে পারে না। অতিথিরা তখন নৃত্য সুরু করে। নৃত্যে যারা পটু তাদের বিশেষ করে ভোজে আমন্ত্রণ করা হয়। এই উপলক্ষে নাচবে বলে বিশেষ কোন গাঁয়ের যে সব মেয়ে আগেই অভ্যেস করেছে তারা আগে একত্রে নাচে। তারপর পুরুষেরা আরম্ভ করে। নানা নাচের দল এক সঙ্গে নাচতে সুরু করে। গ্রামে একাধিক জায়গায় নাচ সুরু হয় যদিও প্রধান গাঁয়ের কেন্দ্রস্থলে সারা রাত ধরেই নাচ চলে।

ভোজ ও আনন্দ রাতভোর চলতে থাকে। বিরামহীন ভোজন, পান ও নৃত্য, পুরনো নতুন অনেক গান গাওয়া হয়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পানের প্রভাব বাড়তে থাকে, আর বিপুল উচ্ছ্বাসে নাচ চলে। পরের দিন ভোরে কিছু শূকর মেরে মাংস রান্না হয়। কিছু শূকরের লড়াই হয় ও লোকে মহা ফূর্তিতে দেখে। সবচেয়ে জংলি শূকর রাতভোর যাদের ক্ষুধার্ত রেখে হিংস্র করে রাখা হয়—তাদেরই লড়াইর জন্য বাছা হয় এবং শক্ত সমর্থ জোয়ান মরদেরা তাদের খুঁচিয়ে এবং তাদের কান ধরে তাদের সঙ্গে লড়ে।

শূকরের লড়াইর পরে রাঁধা মাংস খেয়ে অতিথিরা বিদায় নেয়। বিদায় নেবার সময় মিষ্টি আলু, শূকর এবং কলা আমন্ত্রিত বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়।

এরপরে অনেক স্থানেই উৎসব শেষ হয়। গাঁয়ের ভাল সঙ্গতি থাকলে দুদিন বাদে আর একবার ভোজন অর্থাৎ প্রধান উৎসবান্তে এক রাত্রির বিশ্রামের পর আবার সুরু। এই ভোজে আমন্ত্রণকারী গাঁ ছাড়া কেবল আর একটি গাঁয়ের লোকেরা যোগ দেয়। তাদের নাচের জন্য আহ্বান করা হয়। এই ভোজেও প্রচুর খাওয়া, নাচ-গান ও মদ্য পান করা হয়। আহ্বানকারী গাঁয়ের লোকেরা অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত, তারা প্রধান উৎসবের দিন রাত্রে নাচার সুযোগ পায় না। তারা দ্বিতীয় ভোজের সময় প্রাণ ভরে নাচে। ভোজের জন্য শূকর মারা হয়। প্রধান ভোজের সময় আগে যে সব শূকর মারা হয়েছিল তার সংরক্ষিত চর্বি খাওয়া হয়। পরদিন ভোরে কুস্তি। পুনরায় ভোজ এবং অতিথিদের বিদায়। এভাবে উৎসব শেষ। এবার আর আহ্বানকারী গৃহস্থ আদৃত অতিথিকে কোন উপহার দেয় না।

উৎসবে কয়েকদিন ক্লান্ত থাকার পরে উৎসবান্তে আহ্বানকারী গাঁয়ের লোকেরা কিছুদিন বিশ্রাম করে। উৎসবের সময় নিহত শূকরের চোয়াল স্মারক চিহ্ন হিসাবে গৃহের উপর ঝুলিয়ে রাখে। যাতে লোকেরা দেখে প্রশংসা করে। ভোজের খুশীর দিনগুলি স্মরণ করে।

কর নিকোবরে আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান চাওড়ায় বার্ষিক ভ্রমণ। আগেই বলা হয়েছে প্রতি বছর—ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত আবহাওয়া যখন ভাল কর নিকোবরের লোকেরা চাওড়াতে গিয়ে চাল, কাপড়, ছুরি, তামাক, শূকর, মিষ্টি আলু এবং অন্যান্য ফলের বিনিময়ে নৌকো ও মাটির বাসন আনতে যায়।

পণ্যদ্রব্যের এই বিনিময় হিসাবী ব্যবসায়ের ধরণে হয় না। প্রাচীনকাল থেকে দুই দ্বীপের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রীতির বন্ধনের

জন্যই এই উপহারের আদান-প্রদান। তাছাড়া ধর্ম্মান্তর সত্ত্বেও কর নিকোবরের লোকেরা চাওড়ার লোকেদের পুরোহিত শ্রেণীর লোক বলে ভাবে যারা আধ্যাত্মিক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানের অধিকারী হলেও সাংসারিক অবস্থার দিক দিয়ে নিগৃহীত। মূল ভূখণ্ডে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে লোকে যে দৃষ্টিতে দেখে ও দান করে এও তেমনি। লেনদেনের ব্যাপারে কর নিকোবরের লোকেরা নেওয়ার বদলে দেয় অনেক বেশি। পরিহাসচ্ছলে অবশ্য বলে এরকম না করলে চাওড়ার লোকেরা না খেয়েই মরে যাবে।

কর নিকোবর থেকে চাওড়া দ্বীপে যাবার এই বার্ষিক ভ্রমণ তরুণদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কর নিকোবরীরা ভাবে চাওড়াতে তাদের আধ্যাত্মিক গুরু ও যাদুকরদের শ্রদ্ধা জানান সব পুরুষেরই কর্তব্য। এটি না করা পর্যন্ত কোন বালকের উন্নতি হয় না বলেই এদের ধারণা। সে তার পৌরুষের পূর্ণ প্রমাণ দিয়েছে বলেও মনে করা হয় না। এই প্রথম চাওড়াগামী বালকদের অনেক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ করান হয় এবং তাতে সমস্ত গ্রাম যোগ দেয়।

চাওড়াতে প্রথম যাত্রাকারী বালকদের একটি বিশিষ্ট নাম আছে— রামাল। বার বছর বয়স হলে তাদের পিতারা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যায়। যদি কোন কারণে তারা আগে না যেতে পারে তাহলে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের এই যাত্রার মেয়াদ থাকে।

যাত্রার সময় যখন ঘনিয়ে আসে গাঁয়ের লোকেরা তালপাতা পুড়িয়ে নৌকোর পাটাতন শক্ত করে। সাধারণত গাঁয়ের তিন চারটে নৌকো একত্রে যাত্রা করে। নৌকোগুলি বৃহদাকারের। প্রতি নৌকোয় জনা কুড়ি লোক। নৌকোয় আড়াআড়িভাবে কাঠের উপর কাঠ রেখে নতুন নতুন ক্রসবার বসান হয়। কাঁটাযুক্ত বেতস লতা চিরে বন্ধনী তৈরী করে। তাই দিয়ে ঠিকমত ক্রসবারগুলি বেঁধে দেয়। ক্রসবারের মধ্যে যে অপ্রশস্ত লম্বা কাঠ সংলগ্ন থাকে তারই মধ্যেকার বন্ধনীগুলি আচ্ছাদিত করার জন্য বড় বড়

তালপাতা সেলাই করে দেয়। এইভাবে নৌকোর উপর দিকের কিনারা কয়েক ইঞ্চি উঁচু করা হয় যাতে ঢেউ উছলে নৌকোর ভিতরে সহজে ঢুকতে না পারে। নৌকোর বাইরের দিকে নৌকোর সঙ্গে যে গাছের গুঁড়ি সংলগ্ন থাকে তাও পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য ঠিকমত বেঁধে রাখে।

এবার লোকে যাত্রার জন্য তৈরী। পণ্য বিনিময়ের কিছু দ্রব্যাদি দ্বীপের ট্রেডিং দোকান থেকে কেনা হয়। কিছুটা তো দ্বীপেই উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা মেটাবার জন্য প্রচুর নারকেল এবং রান্না করা পান্ডানাস, মিষ্টি আলু ইত্যাদি পথের খাদ্য সযত্নে নৌকোয় সঞ্চিত করে রাখা হয়। বড় মাছের আক্রমণ থেকে রক্ষা পবার জন্যে কিছু লেবু এবং বুনো বেগুনও সঙ্গে নেয়। বড় মাছ নৌকোর খুব কাছে এসে হয়ত নৌকো উল্টে কিংবা ভেঙ্গেও দিতে পারে। ওদের বিশ্বাস বড় মাছের খাবারের ওপর দারুণ লোভ। যা কিছু ওদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হবে বড় মাছ লোভের বসে খেয়ে ফেলবে। তারপর যখন দেখবে বিস্বাদ খাদ্য তখন তাদের ছেড়ে চলে যাবে আর নৌকোর দিকে এগোবে না। কয়েকটা লম্বা বর্শাও সঙ্গে রাখে। যদি বড় মাছ কোনক্রমে না ছাড়ে তবে আত্মরক্ষার জন্য তার দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারতে পারবে।

রওনা হবার আগে বর্ষা ও তাপ থেকে দেহ রক্ষার জন্য ওরা গায়ে খুব করে নারকেল তেল মেখে নেয়। যেসব বালক প্রথমবার যাত্রা করে তাদের মাথায় মুরগীর রক্ত ছিটিয়ে দেয়। গাঁয়ে সমাজ কল্যাণ গৃহে ভোজ হয় এবং নৌকোর প্রশস্তিতে গান গাওয়া হয়।

হাওয়া ও সমুদ্র যখন অনুকূল থাকে তখন কর নিকোবর থেকে চাওড়া পর্যন্ত চল্লিশ মাইলের পথ ওরা অনেক সময় পনেরো থেকে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাড়ি দেয়। তা না হলে দিন তিনেক লাগে। হাওয়ার গতি বুঝে পাড়ি দেবার সময় নির্দ্ধারণ করে। মাঝে মাঝে ওরা অর্দ্ধেক পথ বাত্তিমালবে এসে থামে। এখানে এসে ওরা বিশ্রাম নেয়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য কচি ডাব পেড়ে

নেয় এইজন্যেই এখানে নারকেল গাছ পোঁতা হয়েছে। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লোকে যাত্রা সাঙ্গ করতে চায়। তাই এ ধরণের যাত্রা পথের মাঝখানে খুব কমই থাকে। আবহাওয়া খারাপ থাকলেই থামে, নয়তো নয়।

তরী যখন চাওড়ার তটে ভেড়ে, দ্বীপের লোকেরা এগিয়ে আসে। যে বালকেরা প্রথমবার আসছে তাদের অনুষ্ঠান সহকারে অভ্যর্থনা করা হয়, তাদের মাথার ওপর ডিম ভাঙ্গা হয় ও গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হয়। লোকে বন্ধুগৃহে দু'তিন রাত অতিথি হিসাবে থাকে। কিন্তু আবহাওয়া যদি প্রতিকূল ও ভীতিজনক হয় তবে অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্যন্ত থাকতে বাধ্য হয়। চাওড়াতে কাজ শেষ হলে লোকেরা তাদের চাওড়ায় কেনা বাসনপত্র, আপনজনদের জন্য ঝুনো নারকেল কোরা দিয়ে তৈরী 'কুইলয়' নামে খাদ্যবস্তু, যাবতীয় কলা, মিষ্টি আলু ইত্যাদি একত্র গুছিয়ে নেয়। চাওড়াতে কেনা নতুন নৌকো করে একই সঙ্গে নিয়ে যায়।

কর নিকোবরে ফিরে গেলে নিজের গাঁয়ের লোকে আবার তাদের অভ্যর্থনা করে। পরিবারের লোকেরা, বন্ধু-বান্ধবরা দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য সমুদ্রতীরে আসে। ভ্রমণ কেমন হল জিজ্ঞাসাবাদ করে, সঙ্গে করে আনা পণ্যদ্রব্য ঘরে তুলে নেয়। 'রামালদের' মাথায় আবার ডিম ভাঙ্গা হয়। একটি মোটা শূকর মেরে নৌকোর চারিদিকে রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয় 'রামালদের' ও অন্যান্য যাত্রীদের গায়ে।

চাওড়া থেকে সদ্য প্রত্যাগত ব্যক্তিরা দু'তিন দিন পর্যন্ত নিজেদের ঘরে ফিরে যায় না। তারা সমুদ্রতীরে সমষ্টি উন্নয়নের গৃহ 'এলপানামে' থাকে। তাদের জন্য খাবার এনে দেওয়া হয়। 'রামালরা' থাকে আরো বেশি দিন, প্রায় এক মাস। যদিও সপ্তাহখানেক বাদে তাদের গ্রামের এলাকা পর্যন্ত বেড়াতে দেওয়া হয়। তবে অদূরে ক্ষেত আবাদের স্থানে তারা যেতে পারে না।

যাত্রীদের এইভাবে 'এলপানামে' থাকবার উদ্দেশ্য হয়ত চাওড়ার

সমস্ত অপবিত্র প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। যাদুকরের দেশ বলে ওরা দেশটাকে অনিষ্টকর বলেই মনে করে। ওরা বিশ্বাস করে চাওড়া ফেরত লোকজন যদি কিছুকাল আলাদাভাবে না কাটিয়ে গাঁয়ে বা ক্ষেত-আবাদে ফিরে যায়, তাহলে সমস্ত হাঁস-মুরগী ও গৃহ-পালিত পশু চাওড়ার ব্যাধির কবলে পড়ে মরে যাবে। মাথায় যে ডিম ভাঙ্গে এবং শূকর মুরগীর রক্তে গা মুছে দেয় ওদের বিশ্বাস এতে চাওড়া ভ্রমণকারীদের ব্যাধি থেকে মুক্ত করবে।

সমুদ্রতটে সমষ্টি উন্নয়নের গৃহে যারা থাকে তাদের খোলা জায়গায় গরম জলে স্নান করতে হয়। যে বালকেরা প্রথম যাত্রা সাঙ্গ করে এসেছে তারা হাতে পায়ে গলায় রূপোর তারের গহনা এবং অন্যান্য অলঙ্কার পড়ে। পান্ডানাসের বীজ এবং শূকরের চর্ব্বির টুকরোর মালা গেঁথে তাদের পরানো হয়। 'রামালরা' অনুষ্ঠান শেষ হওয়া পর্যন্ত এরকম অলঙ্কার পরে থাকে।

সমষ্টি উন্নয়নের গৃহে তাদের অবস্থানকাল যখন শেষ হয়ে আসে তখন নৌকো বাইচ হয়, 'রামালরা' বিশেষভাবে তাতে অংশ গ্রহণ করে। চাওড়া ফেরত লোকেরা আপন ইয়ার বন্ধুদের ও আত্মীয়দের ও গাঁয়ের প্রধান ব্যক্তিদের সমষ্টি উন্নয়নের গৃহে ভোজ দেয় এবং ভোজের জন্য যে শূকর-মুরগী মারা হয় তার রক্ত নৌকোর গায়ে ছিটিয়ে দেয়, যেন নৌকোকে খেতে দিচ্ছে। সারারাত ধরে ভোজ চলে। শেষ পর্যন্ত যখন আসর ভাঙ্গে তখন আবার তরুণ 'রামালদের' মাথায় ডিম ভাঙ্গা হয়। হৈ-হল্লা আনন্দ উত্তেজনার মধ্যে এখন তাদের নিজেদের ঘরে ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়।

যখন চাওড়ার লোক কর নিকোবরে আসে, অনুষ্ঠান এবং ভোজ অতটা অঢেল হয় না। কিন্তু যদি কোন তরুণ প্রথমবার আসে শূকর ও মুরগীর রক্ত তাদের গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হয়।

নৌকো খরিদ করার ব্যাপারেও অনুষ্ঠানের নানা বিধি-নিষেধ আছে। চাওড়া ছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকে যদি কোন নৌকো

কেনা হয় অথবা চাওড়া থেকে কেনা নৌকোতে কোন দাঁড় বা কাঠের টুকরা অন্য দ্বীপে ফিট করে দেওয়া হয়, তাহলে পান্ডানাস, ছোট অক্টোপাস এবং বাদুড় খাওয়া নিষেধ, বিষ প্রয়োগ করে মাছ ধরা নিষেধ। ওরা বিশ্বাস করে যদি পান্ডানাস খাওয়া হয় এবং তার বীচি আলগা করে নেওয়া হয়, নৌকোর জোড়ও এইভাবে আলগা হয়ে যাবে। ছোট অক্টোপাস খেলে সমুদ্রের বড় অক্টোপাস লোকেদের আক্রমণ করবে এবং নৌকোর বিপদ হবে। বাদুড় খেলে নৌকো দিনে রাতে সমান ছুটতে পারবে না। সাগর জলে বিষ ঢেলে মাছ ধরলে সমুদ্রে ঝড় উঠবে। জ্বালানি কাঠ ও বেত চিরলে নৌকোই চিরে যাবে। নৌকো চাওড়াতে পৌছালে এবং সেখানকার লোক দেখলে বিশেষ করে যে অতিরিক্ত কাঠ নৌকোতে সংলগ্ন থাকে তা দেখানর সঙ্গে সঙ্গে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। সংশ্লিষ্ট লোকেদের ঘরে এবং সমষ্টি উন্নয়নের গৃহে কাপড়, ফল ও তরকারি ঝুলিয়ে দেওয়া হলে বুঝতে হবে নিষেধাজ্ঞা উঠে গেছে। এইসব বিধি-নিষেধ আজকাল অনেক উঠে গেছে কারণ ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ওদের এসবে বিশ্বাস অনেক কমে এসেছে। এখন যখন নতুন নৌকো কেনা হয়, মালিক কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে এবং ভোজ দেয়। শূকর ও মুরগী ভোজের জন্য কেটে নৌকোর চারদিকে রক্ত ছিটিয়ে দেয়। নৌকো বাইচ খেলা হয়, তাতে নতুন নৌকোও থাকে।

অতীতের এইসব ভূত-প্রেতাত্মা পূজার একটি চিহ্ন এখনো আছে। ওরা ভূতে বিশ্বাস করে। নিকোবরীদের ভূতের ভয় এত বেশী যে কচিৎ কখনও কেউ রাতে একা বেরোয়। অবশ্য দু'তিনজন একসঙ্গে নির্ভয়ে বেরোয়। নিবিড় জঙ্গল, ক্ষেত-আবাদের ঘন গাছপালা, কোন কোন বৃক্ষ লতার অদ্ভুত আকৃতি তাদের ভূতের ভয় বাড়িয়ে দিয়েছে। নিশীথে নির্জ্জন স্থানে হঠাৎ দেখলে ভূত বলে কল্পনা করা অসম্ভব নয়। ওদের মধ্যে

খুব ভূতের গল্প চলে। শৈশবে এসব গল্প শুনে ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস নিয়ে ওরা বড় হয়। সবচেয়ে মজার হল কর নিকোবরের ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের স্টেশন, আগে এটা রয়াল এয়ার ফোর্সের অধীনে ছিল। সেখানে ভূতের দৌরাত্ম অত্যন্ত বেশি বলে ওদের বিশ্বাস। অনেক বৃটিশ অফিসারের প্রেতাত্মাকে ওখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনীদের বাহুলগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক নিকোবরীরাই যে এমন অনেক ভূত সেখানে দেখেছে তাই নয়, কখনো-বা রাত্রে প্রহরারত কোন এয়ারম্যান অথবা রাত্রির জন্য স্টেশনে নেমেছে এমন কোন বিমান চালকও ওখানে নাকি অতীন্দ্রিয় কিছু দেখেছে। তারা গোরা সাহেব এবং তাদের সুন্দরী মেমদের ওখানে ফুর্তিতে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে।

অতীতে লোকেরা নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে অভিভূত হত। প্রাকৃতিক শক্তিকে তুষ্ট করার জন্য অনুষ্ঠানাদি পালন করত, কিন্তু সমুদ্র পূজার জন্য ওদের কোন অনুষ্ঠান ছিল না। এটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার কারণ অনেক লোকের মধ্যেই সমুদ্রদেবতার পূজা করার রেওয়াজ রয়েছে যেমন হিন্দু পুরাণে বরুণদেব এবং প্রাচীন গ্রীকদের নেপচুন। নিকোবরীদের জীবনে সমুদ্র এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে বলেই বোধ হয় সমুদ্রকে ওরা নিজেদের জন মনে করে। সমুদ্র ওদের মনে এতটা বিস্ময় ও ভয়ের সঞ্চার করে না। যদি করতো তবে লোকেরা সমুদ্রকে দেবতার মত পূজো বা এর সঙ্গে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান যুক্ত করতো।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্রথা ও দেশাচার

প্রজনন ব্যাপারে নিকোবরীদের এই বিশ্বাস যে প্রজনন ব্যাপারটাই অপরিচ্ছন্ন এবং প্রসব হওয়া উচিত দূরে গ্রামের বসতি এলাকার বাইরে। ধর্মান্তর গ্রহণ সত্ত্বেও অধিকাংশ নিকোবরীই পুরনো প্রথা মনে আসছে। অবশ্য প্রসবের সময় অনেক ক্ষেত্রেই ঝাড়ফুঁকের রোজাদের সাহায্য আর নেওয়া হয় না।

নিকোবরীরা স্বাভাবিকভাবেই অন্তঃসত্ত্বা হবার লক্ষণ বুঝতে পারে যেমন ঋতু বন্ধ হওয়া এবং বমির উদ্রেক। অন্তঃসত্ত্বা নারী যাতে বেশি পরিশ্রম না করে সেদিকে খেয়াল রাখা হয়। ওদের ধারণা এতে প্রসবে বিঘ্ন আসবে। বিশেষ করে শ্রমসাধ্য কাজ করে যদি শরীরে স্বেদ ঝরে তাহলে শিশুর স্তন্য পানের পক্ষে নাকি বিশেষ ক্ষতিকর। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভাবী পিতাকে পর্যন্ত কঠিন কাজ করতে দেওয়া হত না। কারণ মায়ের মত তার ব্যাপারেও একই নীতি। তবে এখন আর তত বিধি-নিষেধ নেই, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে এখনো ভাবী পিতা স্ত্রীর অন্তঃসত্ত্বাকালে বেশি কঠিন কাজ করে না। যেগুলি হজম করা দুরূহ সেগুলি ভাবী মাকে খেতে দেওয়া হয় না।

চাওড়ার মত জায়গায় যেখানে ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের ওঝাদের এখনো কিছু প্রভাব, সেখানে গর্ভবতী নারীর স্বামীর ওঝাকে কচি ডাব, নারকেল পাতা এবং নারকেল তেল ভেট দিতে হয়। ওঝারা স্ত্রীলোকটিকে চিৎ করে শুইয়ে একরকম পাতার রস শূকরের রক্তে মিশিয়ে পেটে মালিশ করে। পরে স্ত্রীলোকটি পেট ধুয়ে মুছে ফেলে, তখন এক টুকরো সাদা কাপড় তার গলায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কাপড়টি অন্তঃসত্ত্বা নারীর সমস্ত উদর ঢেকে ফেলে। মনে করা হয় বস্ত্রখণ্ডটি গর্ভস্থ শিশুকে ভূত প্রেতের গ্রাস থেকে

রক্ষা করবে। প্রসব ব্যথা সুরু হলে মেয়েটিকে প্রধান পল্লী থেকে দূরে এক কোনায় সমুদ্র তীরে সাধারণ প্রসবাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে প্রসবাগার সমস্ত গাঁয়ের দ্বারাই সংরক্ষিত। তবে এরা জন্মের ব্যাপারটা অপরিচ্ছন্ন মনে করে বলে ঘরটার দেখা-শুনা তেমন করে না এবং ওটা বেশ নোংরাই থাকে। ভাবী পিতা এবং পরিবারের নিকট আত্মীয়রাও মেয়েটির সঙ্গে আসে। এটা দরকার বলে ওরা মনে করে, কারণ তাহলে স্বামী ও পরিজনেরা মেয়েটিকে সর্ব্বদা দেখাশোনা করতে পারে।

অতীতে গাঁয়ে কোন ধাত্রী ছিল না। কোন বয়স্কা স্ত্রীলোক প্রসব করাতো। এখন কর নিকোবরে অধিকাংশ গাঁয়েই শিক্ষিতা ধাত্রী আছে, তাদের প্রসবের সময়ে ডাকা হয়। সঙ্কটজনক অবস্থা হলে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যান্য দ্বীপের হাসপাতালে যাওয়া অসুবিধা আছে বলে নিজেদের গ্রাম্য পদ্ধতি ও ওষুধ দিয়ে কোন রকমে কাজ চালায়।

প্রসবে বিলম্ব না হয়, এবং শিশু যাতে ভিতরে জড়িয়ে না যায় বা গাঁটে আটকে না যায়, মা-বাপের সমস্ত জিনিসপত্রভরা বাক্সের ডালা খুলে ফেলা হয়। কাপড় চোপড়ের সমস্ত গিঁট খুলে ফেলা হয়। সমস্ত গর্ভকালটা স্বামী-স্ত্রীকে কোন কিছু এঁটে বন্ধ করতে যেমন বাক্সে পেরেক জাতীয় জিনিস ঠুকতে দেওয়া হয় না। এসব কুসংস্কার অবশ্য আজকাল চলে যাচ্ছে এবং কর নিকোবরে কম বেশি এসব পরিত্যক্ত হয়েছে।

চাওড়া ও অন্যান্য অনুন্নত স্থানে ঝাড়ফুঁকের ডাক্তাররা সর্ব্বদা প্রসবের কালে উপস্থিত থাকে। তারা কিছুই করে না, মেয়েটি যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। কখনো-বা মেয়েটির পেটে হাত দিয়ে, বাড়ীতে কোন জিনিসটা প্রসবের বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তা তারা বলে দেয় এবং তা ধ্বংস করতে হুকুম দেয়। এতেও যদি কাজ না হয় তাহলে স্বামীকে সমুদ্রতটে ভেঙ্গে-পড়া ঢেউ-এর ফেনার ওপর চড়তে বলে। সত্বর প্রসবের জন্য ওঝারা কোন লতাপাতার রসও দেয়।

প্রসবান্তে প্রসূতিকে অশুচি মনে করা হয়। কোন খাবার জিনিস বা কাপড়-চোপড় তাকে আঙ্গুলে ছুঁড়েও দেওয়া হয় না। স্বামী ও পরিজনেরা তার দেখাশোনা করে। পরিবারের অন্য কেউ গাঁ থেকে তার জন্য খাবার নিয়ে আসে প্রসবাগারে।

জন্মের এক সপ্তাহ পর প্রসূতি ও নবজাতক পরিবারের জনাকয়েক লোকের সঙ্গে প্রসবাগারের পিছনে কোন কুটিরে গিয়ে থাকে। গ্রাম থেকে দূরেই। প্রত্যেক পরিবারেরই এমনি নিজস্ব একটা কুটির আছে, তীর থেকে নির্জ্জন কোন কোন কুটির দেখা যায়। জন্মের পর ছ'মাস থেকে সুরু করে বৎসরকাল তারা এরকম কুটিরে থাকে অশুচিতা থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্য। এসব কুটিরে রান্নাও করা হয়। একমাসের পর পিতাকে তার দৈনন্দিন কাজে যেতে দেওয়া হয়, যদিও তাকে এখানেই এসে শুতে হয়।

পরিবারটি যখন নিজেদের বাড়িতে ফিরে আসে তখন জন্মকালে বা সেখানে অবস্থানকালে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিসপত্র, যেমন মাদুর, কাপড়, বাসন ইত্যাদি সব ফেলে আসে কারণ ওরা সেসব অশুচি বলে মনে করে।

প্রসবের সময় ও তার ঠিক পরে শিশু ও মায়ের প্রতি ভাল রকম যত্নই নেওয়া হলেও প্রসবাগার অপরিচ্ছন্ন থাকে বলে শিশু মৃত্যু ও প্রসবকালে মায়ের মৃত্যুর হার খুব বেশী। তবে কর নিকোবরের লোকেরা অভ্যাসে-রুচিতে ক্রমশঃ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। গুরুতর অবস্থা হলে হাসপাতালে পাঠানর ফলে শিশু মৃত্যু ও মায়ের মৃত্যুর হার কমে আসছে।

নিকোবরীরা খুবই শিশু প্রিয়। তবুও শিশুর জন্মকালে কোন বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হয় না। খৃষ্টান পরিবার যেদিন শিশুর গির্জ্জায় ব্যাপ্টিজম বা আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় সেদিন পরিমিত ভোজ দেয়। সেদিন ধাত্রী এবং প্রসবে যারা সাহায্য করেছে সেই সব স্ত্রীলোককেই বিশেষ করে নিমন্ত্রণ করা হয়। এই নিমন্ত্রণ খাওয়ান ছাড়া ধাত্রী ও অন্যান্য সাহায্য-

কারিণীদের আর কিছু দেওয়া হয় না কারণ নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন আর আরেকজনকে সাহায্য করে বিনিময়ে কিছু নেবার কথা নিকোবরীরা ভাবতেই পারে না। তাদের সমাজে এটা একেবারে অচল। অবশ্য যদি ওঝাদের সাহায্য নেওয়া হয় তবে সাধারণত ছ'গজ মাপের কিছু বস্ত্রখণ্ড এবং কয়েকটি মুরগী প্রসবের কয়দিন পরে তাদের দেওয়া হয়।

খৃষ্টান নিকোবরীদের শিশুর জন্মের পর ব্যাপ্টিজম বা ধর্মে দীক্ষা বিশেষ আবশ্যকীয়। শিশুর স্বাস্থ্য ভাল হলে জন্মের পনের-কুড়ি দিন বাদে, দুর্ব্বল হলে আরো পরে ধর্মে দীক্ষা হয়। শিশু দুর্ব্বল হলে এবং বাঁচার আশা না থাকলে গির্জ্জার পুরোহিত প্রসবাগারেই শিশুর দীক্ষা দেন। নবজাত শিশুর জন্মের তারিখ ঠিক রাখার জন্য দীক্ষা বিশেষ সহায়ক। আগে শিশুর জন্মের সময়কাল ঠিক রাখা হত না বলে প্রাচীন লোকেদের বয়সের সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা ছিল না।

দীক্ষার সময়ে শিশুর নামকরণ ছাড়াও পরিবারস্থ লোকজন বিশেষ করে পিতা শিশুর একটি নাম জন্মের পরেই রাখে। কখনো পিতা বা পরিবারের লোকেরা যে নাম রাখে দীক্ষার সময়ও সেই নামই রাখে, তবে সাধারণত দুটি নামই আলাদা। এই প্রথায় এই প্রাচীন বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি। শিশুর আসল নাম প্রতিদিন যে নামে ডাকা হয় তার থেকে আলাদা হওয়া চাই। তাতে ভূত-প্রেত প্রতারিত হয় এবং তারা শিশুর কোন অনিষ্ট করতে পারে না। ধর্মান্তর এবং আধুনিকতা সত্ত্বেও লোকের অবচেতন মনে পুরনো বিশ্বাস রয়ে গেছে।

চাওড়া এবং অন্যান্য স্থানে যেখানে এখনো পুরনো ভূত-প্রেত পূজার চল, সেখানে দু'এক বছরে শিশু হাঁটতে আরম্ভ না করা পর্য্যন্ত কোন নামই দেওয়া হয় না। তারপর ওঝাদের ডাকা হয় নামকরণ অনুষ্ঠানে। মুরগী মারা হয় এবং ওঝারা একরকম পাতার রস

মুরগীর রক্তে মেশায়। তারপর সচ্চরিত্র কোন ব্যক্তি শিশুর গায়ে ওই মিশ্রিত দ্রব্য মাখিয়ে দেন। লোকে বিশ্বাস করে বড় হয়ে শিশুটি ওই সচ্চরিত্র ব্যক্তিটির মত হবে। এই অনুষ্ঠানে শিশুর নামকরণও হয়।

অতীতে লোকে শিশুদের নাম নিকোবরীতেই রাখত, কিন্তু প্রতিদিন তাদের ডাকবার জন্য সাধারণত হিন্দী, ইংরেজী ইত্যাদি বিদেশী ভাষার নাম রাখা হত। অনেক সময় বহিরাগতদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে সব ইংরেজী শব্দ লোকে শুনতো তারই ভিত্তিতে নাম রাখতো। অর্থ বুঝুক বা না বুঝুক তাতে কিছু এসে যেত না। অতীতে এইভাবে অনেক অদ্ভুত নাম রাখা হত। যেমন, কিং ফিশার, কৃকোয়ারক্রো, বিস্কিট, পোর্টব্লেয়ার, ইয়েস প্লীজ, হিজ মেজেষ্টি, টিন ওপনার ইত্যাদি নাম। এখন অবশ্য অধিকাংশ লোকে খৃষ্টান হওয়াতে সারা দুনিয়ায় প্রচলিত সাধারণ খৃষ্টানী নাম দেওয়া হয়। শুধু যে সব স্থানে পুরাতন ভূত-প্রেত পূজার অভ্যেস এখনো আছে সে সব স্থানে দুটি করে নাম রাখা হয়।

শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। প্রতিদিন গরম জলে তাকে স্নান করান হয়। ডাবের খোলে জল গরম করা হয়। জলপূর্ণ ডাবের খোল আগুনে পোড়ে না। শিশু দু'মাসের হলে চাওড়ার বাসনে জল গরম করা হয়। এই উদ্দেশ্যেই এই বাসন, এই পাত্রকেই ওরা শুদ্ধ বলে মনে করে। স্নানের পর শিশুকে নারকেল তেল মালিশ করে আগুনের কাছে রেখে শিশুর শরীর গরম করা হয় অথবা আগুনে হাত সেঁকে সেই হাতেও। খুব গরমের দিন হলেও কিছু যায় আসে না।

কচি শিশুরা এবং ছোট ছেলেমেয়েরা সাধারণত কোন পোষাক পরে না। বাইরের লোকের সামনে নেবার সময় পোষাক পরিয়ে নেয়, হয় ঘরে সেলাই করে, নয়ত দোকান থেকে কিনে।

মাতৃস্তন্য পান করানোর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। কখনো

বছর দেড়েক পর্যন্ত মায়ের দুধ খায়, কখনো-বা কয়েক মাস পর্যন্ত। সাধারণত ঘন ঘন প্রসবের কারণে প্রতি শিশুকে কয়েক মাসের বেশি বুকের দুধ পান করান সম্ভব হয় না। মায়ের দুধ ছাড়া শিশুদের প্রথম যে খাবার দেওয়া হয় তা হল ডাবের মাখনের মত লেইর সঙ্গে পান্ডানাস চটকে নারকেলের শলায় দুটি বস্তু গরম করে আরো নরম করা হয়, তারপর সেটা খাওয়ায়। মায়ের দুধ ছাড়া অন্য কোন দুধ শিশুকে দেওয়া হয় না কতকটা এই কারণে যে, শুধু দুষ্প্রাপ্য। লোকেরা ডাবের শাস এবং পান্ডানাস অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য মনে করে বলে ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে চায়। সম্প্রতি কিছু কিছু পরিবার শিশুদের টিনের দুধ দিতে সুরু করেছে, তবে এটা নিয়মের ব্যতিক্রম।

বাচ্চা ও শিশুদের সর্ব্বদা খুব সাবধানে দেখাশোনা করা হয়। তাদের বয়স্ক ভাইবোনদের ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় তাদের ছোট ভাইবোনদের দেখতে হয়। বড়রা তাদের আদর করে, সোহাগ করে, বুকে জড়িয়ে ধরে, বলতে গেলে শিশুদের জন্য তারা খুবই করে। শিশুদের কোলে করেই রাখে, মাদুরে খুব কম শুইয়ে দেয়। শিশুর প্রথম চুল কাটা বা অন্নপ্রাশন ইত্যাদি কিছু নেই। নামকরণের পর বিবাহকাল পর্যন্ত আর কোন অনুষ্ঠান করা হয় না।

নিকোবরীদের বিবাহ প্রথা খুবই সহজ ছিল। কোন তরুণ-তরুণীর পরস্পরকে ভাল লেগে গেলে প্রায়ই তারা যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হত। বড়রা তাদের মিলনকে বিবাহের ধাপ দান করে দিত। সামান্য কিছু অনুষ্ঠান হত। তবে দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে এর রকমফের ছিল।

এই প্রাচীন বিবাহ প্রথা যেখানে প্রাচীন ভূত-প্রেত পূজা এখনো আছে সে সব স্থানে এখনো চালু।

চাওড়াতে প্রেমের ব্যাপার সুরু হয় রাত্রে নাচের সময়। তরুণ-তরুণী তখন পরস্পরের কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। তরুণ-তরুণী পরস্পরকে যখন পছন্দ করে তখন পূর্ব্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা

অনুসারে জঙ্গল এলাকায় নির্জ্জনে দেখা করতে সুরু করে। কখনো বা প্রেমের গান গেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে। দীর্ঘকাল অনুরাগের পালা চলে তারপর প্রেম যখন গভীর হয় পরস্পরের সম্মতি অনুসারে প্রতিরাত্রে ছেলেটি মেয়েটির বাড়ী যাতায়াত করে এবং তার সঙ্গে যৌন সম্পর্কও চলে।

এক মাস দুমাস যখন এই রকম দেখা সাক্ষাৎ চলে, মেয়ের মা-বাপ তখন ছেলের মা-বাপকে বলে ও মেয়েটিকে ছেলের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। ছেলের বাপ তখন পরিবারের কর্ত্তাকে বলে। সে গিয়ে দ্বীপের প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করে। মোড়ল যখন ছেলেটির ও মেয়েটির মধ্যেকার সম্পর্ককে স্থায়ীরূপ দেওয়া সাব্যস্ত করে তখন ছেলের বাপ পরিবারের সকলকে নিয়ে বৈঠক করে এবং সর্বসম্মতিক্রমে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য একটি দিন ঠিক করে। পরিবারের কর্ত্তা তখন প্রত্যেককে কিছু কিছু জিনিস দিতে বলে যেমন শূকর, কাপড়, নারকেল গাছ, মুরগী, মিষ্টি আলু, রূপার তার ইত্যাদি যা মেয়ের মা-বাপ চায়। সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেলে মেয়েটিকে তার বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় ছেলের বাড়ীর সবাই সব জিনিসপত্র নিয়ে মেয়ের বাড়ী যায়। মেয়ের বাপ খুশি হলে সে অনুমতি দেয়। তার মেয়েকে কয়েকজন স্ত্রীলোক মিলে ছেলের বাড়ী নিয়ে যায়।

ছেলের বাড়ীতে বর কনে দু'জনের চুল কেটে ফেলা হয়। তাদের সাদা কাপড় পরানো হয়। ওঝা এসে তাদের ঘরের এক কোনায় নিয়ে যায়। সেখানে সাদা কাপড় পর্দ্দার মত ঝোলান থাকে। দম্পতিকে অপরের দৃষ্টি থেকে আড়াল করার জন্য। দম্পতি আগুনে ঝলসে নেওয়া শূকর দিয়ে আহার সম্পন্ন করে। তখন পুরুষ ওঝা তাদের সমুদ্রে ডুব দেওয়াতে নিয়ে যায়। ডুব দেবার পর নবদম্পতী গৃহে ফিরে আসে এবং বিয়ের কাজ সুরু হয়। নিমন্ত্রিতরা শূকর, মিষ্টি আলু, মাটির পাত্র ইত্যাদি দম্পতিকে উপহার দেয়। ভোজের পর পাত্রের পিতা এক ঝুড়ি খাবার তৈরী

রাখে এবং একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যখন অন্য লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে নবদম্পতি একটি গোপন স্থানে যায় ও লুকিয়ে থাকে। গোপন স্থানে স্বামী স্ত্রীকে তিনটি নির্দ্দেশ দেয়, এক—অবিবাহিত মেয়ের মত আচরণ করবে না। দুই—তাম্বুল রাগে দাঁত কাল রাখবে, তিন—আর নাচবে না। সে মেয়েটিকে বলে যে তাদের চুল কাটা হয়েছে। .এর অর্থ তারা জীবনের সবুজ দিনগুলিকে পেছনে ফেলে এসেছে। এখন থেকে প্রবীন বয়স্কদের মত তাদের চলতে হবে। চার থেকে সাত দিন পর্যন্ত অজ্ঞাত বাস করে নবদম্পতি তাদের ঘরে ফিরে আসে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে চাওড়া হচ্ছে একমাত্র দ্বীপ যেখানে বিবাহকালে পাত্রপক্ষের কন্যাপক্ষকে কিছু উপহার দিতে হয়। অন্যান্য দ্বীপে বিয়ের সময় কোন পক্ষেরই কিছু দিতে-থুতে হয় না।

কর নিকোবরে ও অন্যত্র যেখানে লোক খৃষ্টান হয়েছে সেখানে পুরনো বিবাহ প্রথা একেবারে নিশ্চিহ্ন। বিবাহের বয়সকালের ঠিক নেই, কিন্তু সাধারণত ছেলেরা কুড়ি থেকে আটাশ বছরের মধ্যে বিয়ে করে। মেয়েরা ষোল থেকে কুড়ির মধ্যে।

যে পদ্ধতিতে খৃষ্টান নিকোবরীরা তাদের জীবন-সঙ্গী নির্ব্বাচন করে তাতে দুরকমই আছে, নিজেদের পছন্দ মতও করে আবার বয়োজ্যেষ্ঠদের দ্বারা নির্ব্বাচিত বিবাহও হয়। নিকোবরী সমাজে এখনো ছেলেমেয়ের অবাধ মেলামেশা এবং বড়দের সামনে ছেলেমেয়ের কথা বলারও কোন বাধা-নিষেধ নেই। তবে তরুণ-তরুণীর নির্জ্জন স্থানে গোপন মেলামেশা বা বিবাহপূর্ব্ব জীবনে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা অন্যায়। অবাধ মেলামেশার ফলে বিবাহযোগ্য ছেলে সহজেই বিশেষ কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং মেয়েটিকে চিঠি লিখে সে তার মনোভাব ব্যক্ত করে ও বিয়ের প্রস্তাব করে। যদি মেয়েটিরও তাকে ভাল লাগে তাহলে সে তার মা-বাপকে জানায়। ছেলেমেয়ের উভয়েরই মা-বাপ তখন একত্র হয়ে বিষয়টি আলোচনা করে। যদি কথাবার্তায় মনের মিল না হয় তাহলে

ছেলেমেয়েকে তারা সেটা জানিয়ে দেয়। সাধারণত ছেলেমেয়েরা বড়দের ইচ্ছাই মেনে নেয়। যদি ছেলেমেয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে একপক্ষের মত থাকে তাহলে বিয়ের পর নবদম্পতি যে পক্ষের মত থাকে তাদের বাড়ীতেই গিয়ে বাস করতে সুরু করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তরুণ-তরুণী যদি দুপক্ষের মতের বিরুদ্ধে বিয়ে করতে চায় তাহলে তাদের দুপরিবার থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয়। অবশ্য এরকম ব্যাপার খুব কমই ঘটে কারণ নিকোবরীদের যৌথ পরিবারে একক কোন দম্পতির পক্ষে দুটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আলাদা আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা নিতান্তই কষ্টকর। তাছাড়া নিকোবরীরা শিশুকাল থেকেই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের ইচ্ছার মর্য্যাদা দিতে শেখে। অভিভাবকদের বিরুদ্ধাচরণ করার অভ্যাস বা প্রবণতা তাদের নেই। অপরদিকে এটিও সমান সত্য যে তরুণ-তরুণীদের পরিবার তাদের জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচনকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখে। ছেলেমেয়ে উভয়েই যদি উৎসুক হয় তাহলে তারা তা সমর্থন করছে না এমন ঘটনা নিয়মের ব্যতিক্রম।

দুই পরিবারের অভিভাবকেরা বিয়ের ব্যাপারে নীতিগতভাবে যদি একমত হয় তাহলে ছেলেমেয়ের পিতামাতার দুটি বস্তু শুধু বিবেচনার থাকে। প্রথমটি ছেলেমেয়ের কে নিজের পরিবার ছেড়ে বিয়ের পর অপরের পরিবারে বাস করতে আসবে। আগেই বলা হয়েছে এটি প্রত্যেক পক্ষের পরিবারের সভ্য সংখ্যার উপর নির্ভর করে। যদি মেয়ের বাড়ী থেকে ছেলের বাড়ীতে লোক বেশি থাকে তাহলে ছেলেটি আসবে মেয়ের বাড়ীতে, ছেলের বাড়ীর চেয়ে মেয়ের বাড়ী লোক বেশি থাকলে মেয়েটি আসবে ছেলের বাড়ীতে। দ্বিতীয়টি হল বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়। গির্জ্জার পুরোহিতের সঙ্গে আলোচনা করে এটি ঠিক করা হয়। পুরোহিত পর পর দুই রবিবার প্রার্থনা সভায় নির্দ্ধারিত তারিখটি ঘোষণা করে। সমস্ত খৃষ্টান জগতে রবিবারে কখনো বিয়ে হয় না, এদেরও হয় না।
বিয়ের দিন গির্জ্জায় খৃষ্টানদের সাধারণ বিবাহ-অনুষ্ঠান [illegible] হয়,

পুরোহিত করান। উভয় পরিবারের লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব বিয়েতে উপস্থিত থাকে।

বিয়ের সময় কোন পণ নেওয়া হয় না। বর বা কনে যখন নিজের পরিবার ছেড়ে অন্য বাড়ী বাস করতে যায়, নতুন পরিবারে দুজনেরই পূর্ণ অধিকার থাকে। সেই পরিবারের কর্ত্তার দায়িত্ব নবদম্পতিকে পরিবারের সভ্যের মত দেখাশোনা করা। কখনো-বা বিয়ের সময় পরিবারের লোকেরা ও বন্ধু-বান্ধবরা বর কনেকে ছোটখাট উপহারও দেয়।

বিবাহ অনুষ্ঠানের পর গাঁয়ে ভোজ হয়। ছেলেমেয়ে দু'পক্ষের লোকজন এবং বন্ধু-বান্ধব পরিচিতজনেরা সবাই ভোজে যোগ দেয়। ভোজের খরচ সাধারণত দুপক্ষের। আজকাল বিয়ের ভোজ বিশেষ করে অবস্থাপন্ন পরিবারে বেশ ধূমধাম করে হয়, নাচগান, নাটক ইত্যাদি চিত্ত বিনোদনের অনেক কিছুই।

খৃষ্ট ধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিকোবরীদের মধ্যে শুধু একটি স্ত্রীরই অনুমোদন আছে। খৃষ্ট ধর্ম্ম বিবাহ বিচ্ছেদকেও নীচু দৃষ্টিতে দেখে। যে কারণেই হোক নিকোবরীরা নিজেদের পত্নীর প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। তাদের আপোষের মনোভাব ও বিবেচনাপূর্ণ স্বভাবের জন্য যে কোন জীবনসঙ্গী নিয়েই তারা চলতে সক্ষম। বিবাহ-বিচ্ছেদ খুব কমই হয়।

ওদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে। বিধবাদের দেখা-শোনা খুব ভালভাবে করা হয়। পতির জীবিতকালের মতই তারা পতির অবর্ত্তমানেও সমান সুখ-সুবিধা অধিকার ইত্যাদি ভোগ করে। ভারতের মূল ভূখণ্ডের অনেক অংশের চেয়ে নিকোবরীরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোন কষ্ট, কৃচ্ছ সাধন বা বিধি-নিষেধ পালন করতে হয় না।

নিকোবরীদের ছোট সমাজে ছেলেমেয়েরা দেখতে যেমনিই হোক সবারই শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় তবু জীবনসঙ্গীর মধ্যে শারীরিক লোকে কামনা করে এবং তার উপর গুরুত্বও দেয়।

জীবনসঙ্গী নির্ব্বাচনে শারীরিক সৌন্দর্য্যের যে ধারণা তাদের রুচিকে প্রভাবান্বিত করে তা প্রায় প্রগতিশীল সমাজের লোকের মতই। গায়ের রঙ পরিষ্কার, কাটা কাটা নাক মুখ চোখ, বেশ লম্বা, সুগঠিত মজবুত দেহবিন্যাসকে ওরা সুদর্শন বলে মনে করে। নিকোবরীদের ফিগার ও চলনভঙ্গীর প্রতি বিশেষ নজর। বোধ করি ওদের মধ্যে অধিকাংশের চলন বড় বেঢপ এবং পুরুষেরা সহজেই মোটা হয়ে যায়।

নিকোবরীদের একটা অদ্ভুত নিজস্ব যৌন সততাবোধ আছে। ঈশাই ধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যৌন ব্যাপারে পূর্ব্বেকার শৈথিল্য অনেকটাই দূর হয়েছে। বিবাহ বন্ধন হয়েছে সুদৃঢ়। অবশ্য বিবাহের পূর্ব্বে অবৈধ যৌন সংযোগের ঘটনা অনেক ঘটে। বড়দের শাসন ও নিষেধ সত্ত্বেও ছোটরা দেখাসাক্ষাৎ করার ও যৌন সহবাসের নানা সুযোগ খুঁজে নেয়। নির্জ্জন সমুদ্রতট এবং অরণ্য এলাকায় অনেক নিভৃত অঞ্চল প্রেম ও পূর্ব্বরাগের আদর্শ জায়গা। এসব স্থান অনেক প্রণয়লীলার মূক সাক্ষী হয়ে আছে। নিকোবরীদের মধ্যে অক্ষতযোনি কুমারীকে বিয়ে করা সম্ভব নয়, এটা বলা যেমন অত্যুক্তি, তেমনি এতে কোন সন্দেহ নেই যে, অন্যান্য সমাজের চেয়ে ওদের সমাজে বিবাহপূর্ব্ব যৌন সম্পর্ক অনেক বেশি ঘটে।

অবৈধ যৌন সম্পর্কে ধরা পড়ে গেলে হয় বিবাহে সমাজের অনুমোদন দেওয়া হয় নয়ত জরিমানা করে দণ্ড দেওয়া হয়। অবৈধ সন্তানের ক্ষেত্রে হয় তাদের বিয়ের দ্বারা আইন সিদ্ধ করা হয় নয়ত মেয়ের পরিবার তাদের দেখাশোনা করে। অবৈধ সন্তানদের নামে অপবাদ দেওয়া হয় না। তারা মায়ের পরিবারে সবরকম অধিকার এবং যত্ন পেয়ে থাকে। অবিবাহিত মাও খুব নিন্দিত হয় না এবং পরে তার বিয়ে হবার সব রকম সুবিধাই থাকে।

বিবাহপূর্ব্ব যৌন সম্পর্ক খুব বেশি হলেও ওদের মধ্যে কিন্তু ব্যভিচার প্রায় নেই বললেই হয়। লোকেরা তাদের স্ত্রীর প্রতি বিশেষ আসক্ত। ঈশাই ধর্ম্মের প্রভাবে বিবাহকে ওরা পবিত্র ও

অলঙ্ঘ্য বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। ব্যভিচারের চিন্তা ওদের মনে জাগে না বললেই হয়।

নিকোবরীদের জন্মের ও বিবাহের রীতিনীতি যত সহজ, সরল সেই তুলনায় ওদের মৃত্যুতে অনেক বিস্তৃত অনুষ্ঠানাদি। মনে হয় আদিম মানুষদের মনে মৃত্যুই সবচেয়ে বেশি গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি করত। যেসব দেবতা মৃত্যু ঘটায় বলে ওদের বিশ্বাস তাদের খুশি করার জন্য এবং মৃত ব্যক্তির পরপারের যাত্রা নির্বিঘ্ন করার জন্য নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানাদি উদ্ভাবিত হয়েছিল।

মৃত্যুর ব্যাপারে ওদের প্রাচীন প্রথা ছিল যে গৃহের পশ্চাতে পারিবারিক কবরখানা থাকত। বস্ত্র, অলঙ্কার, বাসন, সখের জিনিস ইত্যাদি মৃতের অস্থাবর দ্রব্যাদি মৃত দেহের সঙ্গে প্রোথিত করা হত। এই বিশ্বাস যে পরলোকে গিয়ে মৃত ব্যক্তি ওসব ব্যবহার করে। তাছাড়া একবার গোর দেওয়া শব কবর থেকে উঠিয়ে ভোজ ও বিপুল অনুষ্ঠান সহকারে পুনরায় করবস্থ করা হত।

মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠান দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে কিছুটা আলাদা। চাওড়াতে এখনো প্রচুর অ-খৃষ্টান আছে। সেখানে প্রাচীন মৃত্যু প্রথা লোকে অনুসরণ করে। মৃতদেহ সমুদ্রতীরে সর্ব্বজনীন মৃত্যুগৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। একটি দুটি নারকেল ও অন্য ফলবান বৃক্ষ কাটা হয়, যেগুলি পরে ব্যবহৃত হয়। পরিবারের লোকজন শ্মশানে কলা, ছয় ফুট লম্বা বস্ত্রখণ্ড এবং মুরগী সঙ্গে নিয়ে আসে। মৃতের পুত্রকন্যারা কাল কাপড় পরে। রূপোর তারের গয়না হাতে গায়ে পরে এবং 'পউ' নামে ফলের রসে মুখমণ্ডল লাল রঙে রঞ্জিত করে। একজন যাদু টোনার ডাক্তার তাদের গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়ে আনে। তারা পিছনে মাটির দিকে মুখ নামিয়ে চলে। যাদু টোনার ডাক্তার তাদের পরিবারের সব লোকের ঘর প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে মৃতদেহ সাফ করে সাগরজলে স্নান করান হয়। কফিন প্রস্তুত, তবে তার ঢাকনা দেওয়া হয় না। কয়েকজন

বয়স্ক পুরুষ পরিবারিক কবরখানায় কবর খোঁড়ে। অল্প বয়স্ক পুরুষেরা কখনো খোঁড়ে না কারণ ওদের বিশ্বাস তাহলে অল্প বয়সে ওরা মারা যাবে। কবর তৈরী হলে খোলা কফিনে মৃতদেহ কাঁধে করে কবরখানায় বয়ে নিয়ে আসে। যাতে লোকে শেষ-বারের মত মৃতদেহ দেখে নিতে পারে কিছুক্ষণ কফিন রেখে দেওয়া হয়। তারপর দেহ বস্ত্রাচ্ছাদিত করে কফিন বাক্সের ডালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কফিন কবরে নামান হয়। পুরুষ হলে মৃতদেহের মাথা দ্বীপের ভিতরের দিকে এবং পা সমুদ্রের দিকে। এটার অর্থ এই যে মৃত ব্যক্তি সমুদ্র পাড়ি দেবে। আর স্ত্রীলোকের বেলায় মাথা সমুদ্রের দিকে, পা গাঁয়ের দিকে। এর অর্থ স্ত্রীলোকের নজর বেশির ভাগ গাঁয়ের ক্ষেত-আবাদ কাজ কর্ম্মের দিকেই থাকে। কাটা ফলের গাছের দুটি খুঁটি কবরে পোতা হয় এবং নারকেল, মিষ্টি আলু, পান ও গুয়া দিয়ে সাজান হয়। ওদের বিশ্বাস মৃতের আত্মা খাদ্য গ্রহণ করে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে একটি দাঁড়, স্ত্রীলোক হলে একটি কাঁটা খুঁটির ওপর। মাটির বাসন এবং মৃতের অন্যান্য অস্থাবর বস্তু কবরে রাখা হয়।

সাতদিন বাদে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিবারের স্ত্রীলোকেরা কবর খোঁড়ে এবং কফিনের ডালা সরিয়ে যেখানে এরকম সব ডালা সংরক্ষিত হয় সেখানে রেখে দেয়। সবুজ নারকেল পাতায় কফিন মুড়ে দেওয়া হয় এবং পুনরায় অন্যত্র কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে গাছের গুঁড়ি থেকে প্রায় আট ফুট উঁচুতে দুটি খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয়। খুঁটির মাথায় গাছের ডাল ছড়ান থাকে ইংরাজী 'ভি' আকৃতিতে। যাদু টোনার একজন পুরুষ ডাক্তার একটি ছোট শূকর ওই স্থানে হত্যা করে। ওখানেই সেটাকে ঝলসিয়ে খাওয়া হয়। শূকরটির কিছুটা অংশ শয়তানের উদ্দেশ্যেও দেওয়া হয়।

মৃতদেহ পুনরায় গোর দিয়ে পরিবারের লোকজনেরা সমুদ্রে স্নান সেরে বাড়ী ফেরে। প্রায় মাস খানেক ধরে মৃত ব্যক্তির

আত্মার উদ্দেশ্যে তার গৃহে খাদ্যবস্তু রাখা হয়। পরে সেই খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। দু'তিন দিন পর ভোজের ব্যবস্থা, তাতে বাড়ীর সব আত্মীয়-পরিজন যোগ দেয়। অনেক শূকর মারা হয়। ভোজের পর এক ধরণের কাঠের মূর্ত্তি (যাদু টোনার ডাক্তারদের নির্দ্দেশ মত) মৃতের গৃহে রাখা হয়। এতেই হয় মৃত্যু সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের ইতি।

অশৌচের সময় মৃতের স্থাবর সম্পত্তি যেমন জমি, নারকেল ইত্যাদি ফলের গাছের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে। কেউ সে সব ভোগ করতে পারে না, পাছে সেও মরে যায় এই ভয়।

নান কাউরি, কাচাল এবং অন্যান্য দ্বীপে যখন কারো মৃত্যু হয় তখন অন্যান্য গাঁয়ে ও দ্বীপে মৃতের সব স্বজন-বন্ধু আত্মীয়-পরিচিতদের কাছে সংবাদ পাঠান হয়। দূর থেকে এসে পৌঁছাতে সময় লাগে বলে মৃত ব্যক্তির পরিবার মৃতদেহ কবর দিতে পাঁচ সাত দিন দেরী করে যাতে সব লোকজন এসে পৌঁছাতে পারে। মৃতদেহ কবরস্থ করার অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ব্যক্তিরা একটি করে মোটা শূকর, মিষ্টি আলু ও কলা নিয়ে আসে। কবর দেওয়া পর্যন্ত শোক ও ভোজনের সমারোহ চলতে থাকে। মৃতের সঙ্গে প্রোথিত করার জন্য মৃত ব্যক্তির সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়। অনেক শূকর মারা হয়। মৃতদেহ কবর দেবার পর অশৌচকাল পর্যন্ত মৃতের পরিবারের প্রত্যেকে একটি বিশেষ রকমের খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অশৌচ কালান্তে, হয়ত অশৌচ বৎসরকাল পর্যন্তও হতে পারে, কবর খুঁড়ে মৃতের মাথার খুলি বার করে সমুদ্রে ধুয়ে ফেলা হয়। তারপর সেটি নিয়ে এসে বাড়ীর মধ্যেখানে রাখে। খুলির সামনে খাদ্য রাখা হয়। শোককারীরা ওই এক থালা থেকেই খাবার তুলে খায় যেন মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদের যৌথ ভোজন হচ্ছে। এরপর মৃত ব্যক্তি যদি কোন সাধারণ জন হয় তবে মাথার খুলিটি আবার কবরস্থ করা হয়। যদি সে কোন যাদু টোনার ডাক্তার বা বিশেষ

জন হয়, তবে মৃতের একটি ফাঁপা মূর্ত্তি গড়া হয় এবং খুলিটি ভেতরে শূন্য অংশে ভরে দেওয়া হয়। এই কাঠের মূর্ত্তি ঘর থেকে শয়তান তাড়াবার উদ্দেশ্যে গৃহের মাঝখানে স্থাপিত করা হয়।

ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে কর নিকোবরে এবং অন্যান্য দ্বীপের অনেক স্থানেই মৃত্যু সংক্রান্ত পুরনো রীতি-নীতি একেবারে পরিত্যক্ত। কর নিকোবরে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে পরিবারের কর্ত্তা, আত্মীয়-জন এবং অন্যান্য বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতজনকে তার পাশে ডাকা হয়। যদি মরনোন্মুখ ব্যক্তি গাঁয়ের মোড়ল বা অন্য কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়—তাহলে সমস্ত গাঁয়ের মোড়লদের এবং দ্বীপের অন্যান্য বিশিষ্ট লোকেদেরও ডাকা হয়। মৃত্যুকে এখনো ওরা অপবিত্র বলে মনে করে বলে মুমূর্ষু ব্যক্তিকে গাঁয়ের মৃত্যুগৃহে নিয়ে আসে। এই গৃহ রয়েছে সমুদ্রতীরে প্রধান পল্লী থেকে দূরে প্রসবাগারের কাছে। যদি মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যু-গৃহে সরিয়ে আনার অবকাশ না থাকে এবং সে নিজগৃহ বা অন্যত্র মরে তাহলেও মৃতদেহ তৎক্ষণাৎ মৃত্যু-গৃহে নিয়ে আসে। শবদেহের পা সামনের দিকে রেখে পরিবারের জনা দশেক নিকট আত্মীয় বহন করে নিয়ে যায়। এরাই প্রধান শোককারী। মৃত্যু-গৃহে মৃতদেহ এমন ভাবে রাখে যেন মাথা প্রবেশ পথের দরজামুখী। শবদেহ স্নান করিয়ে পরিষ্কার করে নতুন সাদা কাপড় পরানো হয়। শবের মাথা ও মুখ অনাচ্ছাদিত থাকে, মৃতদেহের কাছে মোমবাতি ও ধূপ জ্বালানো হয়। অন্যান্য লোক এসে যাতে মৃতের প্রতি শেষ সম্মান দেখাতে পারে সেইজন্য কিছুক্ষণ দেহ মৃত্যু-গৃহে রেখে দেওয়া হয়। যারা মৃতদেহ দেখতে আসে তারা সাধারণত নিয়ে আসে বস্ত্রখণ্ড, ধূপ ও মোমবাতি।

ইতিমধ্যে মৃতের পরিবারের কয়েকজন কাঠের (সাধারণত 'সওয়াচ') কফিন তৈরী করে মৃত্যু-গৃহে নিয়ে আসে। মৃত্যু-গৃহে লোকেরা যে কাপড় নিয়ে আসে তা মৃতদেহ এবং কফিন দুই-ই ঢাকতে ব্যবহৃত হয়। উদ্বৃত্ত কাপড় থাকলে পরিবার তা অন্য

কাজের জন্য রেখে দেয় এবং, খুবই আশ্চর্য্য এতে কোন অশুচিতার ছাপ লাগে বলে ওরা মনে করে না।

শবদেহ কফিনে রাখা হয় এবং মৃত্যু-গৃহেই ওপরের ডালা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কফিন সাদা ও লাল কাপড়ে আচ্ছাদিত করা হয়, কেবল বুড়োদের বেলায় সাদার বদলে কাল কাপড় ব্যবহৃত হয়।

পরিবারের পুরুষেরা কফিন মৃত্যু-ঘর থেকে এমনভাবে বার করে আনে যাতে মৃতের পা আবার সামনের দিকই নির্দ্দেশ করে। কফিন মৃত্যু-ঘর থেকে গির্জ্জায় নিয়ে যায়, যেখানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তারপর কবরখানায় নিয়ে আসে। নয়ত সোজা গোরস্থানে আনে। সেখানে গির্জ্জার পুরোহিত এসে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে।

সমুদ্রতীরে সমস্ত গাঁয়ের জন্য প্রাচীর বেষ্টিত সর্ব্বজনীন কবরখানা আছে। এটাকে উন্নততর ব্যবস্থা বলতে হবে। অতীতে প্রতি পরিবারেরই গৃহের পিছনে নিজস্ব গোরস্থান থাকতো। প্রথাটি খুবই অস্বাস্থ্যকর এবং অপরিচ্ছন্ন ছিল। কবরগুলি প্রায়ই কাঁচা, কাঠের ক্রুশ দেওয়া, যদিও কোথাও কোথাও পাকা সিমেন্টের কবর এবং ক্রুশ।

সাধারণত তিনচার ফুট গভীর কবর খোঁড়া হয় এবং কফিন রাখা হয় পূর্ব্ব-পশ্চিম বরাবর। পা থাকে পুবমুখী। কবর বন্ধ করার সময় প্রথমে পুরোহিত তিন মুষ্টি মাটি কফিনের ওপর ছড়িয়ে দেয়, পরে পরিবারের লোকেরা এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা দেয়। যখন পাকা কবর করে তখন পরে প্লাষ্টার করা হয়।

শবদেহ সমাধিস্থ করার পর অন্য লোকেরা বাড়ী ফিরে যায়। শোককারীরা যারা শবদেহ এবং কফিন বহন করেছে তাদের অশৌচকাল পর্যন্ত মৃত্যু-ঘরে থাকতে হয়। ঐ সময়ে গাঁয়ের মধ্যে তাদের যাতায়াত করতে দেওয়া হয় না কারণ তারা অশুচি হয়েছে বলে মনে করা হয়। তাছাড়া কারোর মৃত্যু হলে গাঁয়ের পরিষ্কার

ইঁদারা, যেখান থেকে বুড়ো মানুষেরা জল নেয়, তা ঢেকে দেওয়া হয় যাতে মৃতদেহের অশুদ্ধ হাওয়া গিয়ে কুয়োর জল নষ্ট না করে।

ঘরে মৃত্যু হলে, যেখানে মৃত্যু হয় সে জায়গা পরিষ্কার করা হয়। মৃতের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আত্মীয়জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, কখনো কিছু কিছু জিনিস পুড়িয়েও ফেলা হয়। মৃতের ব্যক্তিগত জিনিস স্পর্শ করতে কোন মানা নেই। ঘরে যারা থাকে তাদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদানে বাধা নেই। যেখানে মৃত্যু হয়েছে সেই গৃহে যেতেও বারণ নেই, এমন কি মৃত্যুর অনতিকাল পরে সেখানে খেতেও দোষ নেই।

সাত থেকে পনের দিন অশৌচকাল থাকে। তারপরে শোক-কারীরা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ঘরে ফেরে। পরিষ্কার ইঁদারাগুলির মুখ এবার খুলে দেওয়া হয়। যেদিন অশৌচকাল শেষ, সেদিন কবরের ওপর ক্রস লাগান হয়। এইদিনও মৃতব্যক্তির পরিবার একটি ভোজ দেয়। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে ভোজ সীমিত এবং মাত্র কয়েকজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হয়। কিন্তু গাঁয়ের মোড়লের মত বিশিষ্ট লোকের মৃত্যু হলে অন্যান্য অনুষ্ঠান একই প্রকারের হলেও সমস্ত পল্লীর মোড়ল এবং সমস্ত দ্বীপের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভোজে আহ্বান করা হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে যে 'টাকোয়া' চিহ্নের কথা বলা হয়েছে, কখনো কখনো পরিবারের কর্তা মৃত ব্যক্তির নারকেল গাছের একটি অংশে 'টাকোয়া' চিহ্ন দেওয়া স্থির করে। 'টাকোয়া' যতদিন থাকে কোন লোক সেখান থেকে নারকেল পাড়ে না। আগে লোকের উদ্দেশ্য ছিল নারকেল ক্ষেতের কিছু অংশ মৃতের আত্মার ভোগের জন্য রেখে দেওয়া। এমন কি গাছ থেকে হাজার হাজার নারকেল নীচে পড়ে পচে গেলেও কেউ তা স্পর্শ করতো না। এখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'টাকোয়া' চিহ্ন দেওয়া হয় মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যে খরচ হয় সেই টাকাটা ওঠাতে। ছ মাস থেকে এক বছর পর 'টাকোয়া' চিহ্ন সরিয়ে

নেওয়া হয় এবং একটি বিরাট ভোজ দেওয়া হয়। এতে অন্য গাঁয়ের লোকেদেরও নিমন্ত্রণ করা হয়। আজকাল এরকম ভোজ অবশ্য খুবই কম, কারণ লোকে বুঝতে শিখেছে যে এতে অকারণ অর্থব্যয় হয়। আজকাল কবরে ক্রশ লাগানোর সময় খুব সীমিত ভোজ দেওয়াই লোকে যথেষ্ট মনে করে।

পরলোকগত ব্যক্তিদের অনেক কাল পর্যন্ত লোকে স্মরণ করে। 'অল সউলস ডে' (All souls day) তে, যা নভেম্বরের প্রথম দিকে পড়ে, মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসাবে মৃতের সমাধিতে মোমবাতি জ্বালান ও ফুল দেওয়া হয়। গ্রামে এই দিনটিতে সামাজিক ভোজ, মৃতদের বিশেষ করে স্মরণ করার দিন। যত নারকেল গাছ তারা পুঁতেছে, যত শুভকাজ তারা ভবিষ্যদ্বংশধরদের জন্য করেছে সব কিছুর জন্য তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি মাত্র জিলা সম্বলিত ইউনিয়ন রাজ্য নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হল তার একটি অংশ। এই রাজ্য সরাসরি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের অধীনে চীফ কমিশনারের দ্বারা শাসিত। চীফ কমিশনারের হেড কোয়ার্টার পোর্টব্লেয়ারে অবস্থিত। পোর্টব্লেয়ার থেকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বেশ দূরে। যাতায়াতের অসুবিধা থাকায় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের সব সময় এই সব দ্বীপের কার্য্যকলাপের সংস্পর্শে থাকা সম্ভব হয় না। তাই কর নিকোবরের শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য দ্বিতীয় একটি হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র শাসন এবং উন্নয়নমূলক কাজ চলে।

শাসনকার্য্যে আদিবাসিদের কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নিযুক্ত প্রধান কর্ম্মচারী একজন অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার। তাঁর প্রধান কার্য্যালয় কর নিকোবরে অবস্থিত। একজন সিনিয়র আই. এ. এস. অফিসার এই পদে আছেন। মাত্র অল্প কয়েকজন সিনিয়র কর্ম্মচারী ওখানে নিযুক্ত বলে সাধারণ শাসনকার্য্য ছাড়াও ডেপুটি কমিশনারকে অন্যান্য সরকারী বিভাগের কাজকর্ম্মও দেখতে হয়, বিশেষ করে সম্প্রতি যেসব উন্নয়নমূলক কাজ সুরু হয়েছে সেগুলো। তাঁর দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে নিকোবরীদের স্বার্থ রক্ষা এবং ১৯৫৬ সালের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রেগুলেশনস (উপজাতি সংরক্ষণ) আইনের বিভিন্ন ধারা বলবৎ করা এবং নিকোবরী বাণিজ্যের দেখাশোনা করা। সর্ব্বোপরি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারের গুরুতর দায়িত্ব হল নিকোবরীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা। কারণ দেশের সমস্ত সরকারের প্রতি উপজাতীয় লোকেদের মনোভাব কি হবে তার অনেকখানিই নির্ভর করে এই সরকারী

কর্ম্মচারীর ওপর। তিনি এদের মনে কতটা বিশ্বাস ও আস্থা জাগাতে পারছেন—তার উপর, বিশপ রিচার্ডসন, গাঁয়ের মোড়ল ইত্যাদির মত গণ্যমান্য প্রধানদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি রকম, তার উপর।

কর নিকোবরের অন্যান্য গেজেটেড অফিসার হলেন—পি. ডব্লিউ. ডি, র এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, তিনজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার, মেডিকেল অফিসার, লেডি মেডিকেল অফিসার, পুলিসের অ্যাসিষ্টাণ্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল এবং অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি (নিকোবরী বাণিজ্যের), ইনি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারকে বাণিজ্যিক কাজকর্ম্মের দেখা-শোনায় সাহায্য করেন এবং সাবট্রেজারি অফিসার হিসাবেও কাজ করেন।

কর নিকোবরে কার্য্যে নিযুক্ত অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এবং অন্য কয়েকজন সিনিয়র অফিসার নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপের প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দায়ী। তাঁদের সাহায্যের জন্য নান কাউরিতে একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার, একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়ার এবং একজন মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত। কর নিকোবরের এবং বাত্তিমালব ছাড়া অন্যান্য দ্বীপে সরকারী কাজকর্ম্ম দেখাশোনার দায়িত্ব তাদের।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে রাজস্ব সংগ্রহ এবং দলিল সংরক্ষণের কোন কাজ না থাকায় এসব দ্বীপে কোন রেভিনিউ অফিসার নেই যদিও কর নিকোবরের জন্য তহশীলদারের একটি পদ আছে। কর নিকোবরে একটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক স্থাপিত হয়েছে—সমস্ত দ্বীপটিই এর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৮ সালে ব্লকটি স্থাপিত এবং প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শেষ করে এটি এখন দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ করছে। অন্য দ্বীপগুলির জন্যও একটি সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক স্থাপিত হয়েছে। কামোরটা হেড কোয়ার্টারে এই ব্লকের হেড কোয়ার্টার।

এতদিন পর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে পার্লামেণ্টে

কোন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়নি। তবে সংবিধানের সাম্প্রতিক ধারা অনুসারে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সমগ্র রাজ্য থেকে মাত্র একজন সভ্য পার্লামেন্টের জন্য নির্ব্বাচিত হন। এই দ্বীপসমূহের জন্য আরো দুটি অ্যাডভাইসরি বা পরামর্শদাতা কমিটি আছে, যেমন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পরামর্শদাতা কমিটি এবং চীফ কমিশনারের পরামর্শদাতা কমিটি। দ্বীপপুঞ্জের শাসন ও উন্নয়নমূলক কাজে এই কমিটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রতিনিধিত্ব করতে কর নিকোবরের প্রধান মোড়ল ফ্রেডকে এবং ওয়েস্ট বে কাচালের রানী চাঙ্গাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর অ্যাডভাইসরি কমিটির সভ্য করা হয়েছে। এই দুইজন নান কাউরির রানী লক্ষ্মীসহ চীফ কমিশনারের অ্যাডভাইসরি কমিটিরও সভ্য।

দেশের শাসন বিভাগ ও সরকারের কাছে নিকোবরীরা পিতার মত ব্যবহার পেতে অভ্যস্ত আর তারা সেটা আশাও করে, যদিও তারা নিজেদের মত করেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে চায়। ব্যক্তিগত জীবনে কোন বাধা তারা আদৌ পছন্দ করে না। তবু সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এবং সরকারী নীতি কার্য্যকরী করার ব্যাপারে তাদের একটা নিশ্চিন্ততা বোধ এবং বিশ্বাস আছে যে দেশের সরকার তাদের সর্ব্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন এবং এ নিয়ে তাদের কোন আন্দোলন করার বা মাথা ঘামানোর দরকার হবে না। সরকারের প্রতি মূলতঃ এই মনোভাবের ফলেই শাসন ও উন্নয়নমূলক কাজে তাদের এই অদ্ভুত সহযোগীতা। এই আচরণের অনুসিদ্ধান্ত হিসাবেই শাসন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যেসব জমি বা ক্ষেতের প্রয়োজন হয়। স্বাধীনতার সময় থেকে সরকার নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ সুরু করেছে। বৃটিশ আমলে এসব অঞ্চল অত্যন্ত অবহেলিত ছিল। সম্প্রতি এখানে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রকল্পে নানা দিকে সুসংহত কাজকর্ম্ম সুরু হয়েছে।

সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজেই নিকোবরীরা অত্যন্ত সহযোগীতা করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবল উৎসাহে নিজেরা যোগও দিয়েছে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সরকারের নীতিই হল যে নিকোবরীদের উপর কোন পরিকল্পনা চাপিয়ে দেওয়া হবে না। লোকেরা যখন কোন বিশেষ পরিকল্পনার উপযোগীতা বুঝতে পারবে এবং সম্পূর্ণ সহযোগীতা করতে সম্মত হবে তখনই সেই প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে। কর নিকোবরের সমস্ত নিকোবরীদের নেতা হিসাবে বিশপ রিচার্ডসন এবং বিভিন্ন গাঁয়ের মোড়লেরা সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। একটি ব্লক উন্নয়ন কমিটি আছে যেখানে বিশপ রিচার্ডসন এবং সমস্ত গাঁয়ের মোড়লেরা প্রতিনিধিত্ব করেন। এটাই প্রধান সভাস্থল যেখানে দ্বীপের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য স্থানের ব্লক উন্নয়ন কমিটিতে যা হয় না এখানে তা হয়। কর নিকোবরের কমিটি উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচীর কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা শুধু যে পর্যালোচনাই করা হয় তাই নয়, সেগুলি কার্যকর করার ব্যাপারেও তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা থাকে। বস্তুতঃ কোন কোন সরকারী পরিকল্পনা গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে সভায় আলোচনা না করে কার্যকর করা অসম্ভব। ব্যক্তিগতভাবে কোন নিকোবরী বা কোন গাঁয়ের মোড়ল নিজেকে এর সঙ্গে যুক্ত করবেই না, করলে সমস্ত কার্য্যসূচী পণ্ড হয়ে যাবে।

নিকোবরীদের সহযোগিতার ফলে কর নিকোবরে প্রভূত উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। দ্বীপ ঘিরে একটি পাকা গোল সড়কের নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় সমাধা হয়ে এসেছে। একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিত্থালয় এবং অনেক প্রাথমিক বিত্থালয় স্থাপিত হয়েছে। উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সমেত একটি হাসপাতাল, দুটি ডিসপেনসারি এবং তার সংলগ্ন মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র। পাকা ইঁদারা, স্যানিটারি বাথরুম, পায়খানা ইত্যাদি গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য স্থাপিত হয়েছে। উন্নত ধরণের চাষ-আবাদের ব্যবস্থা

হয়েছে। নানা রকমের নতুন শাক সব্জি, ফল ফলারি এ মুলুকে প্রথম লাগানো হয়েছে। বড় লাপাটি গ্রামে পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। পশুদের টিকা ও ঔষধ দেওয়া এবং হাঁস-মুরগী পালন সুরু হয়েছে। মিস্ত্রি, দর্জি এবং কর্ম্মকারের কাজের শিক্ষণ এবং উৎপাদন কেন্দ্র চালু হয়েছে। ইয়ুথ ক্লাব, গাঁয়ের ভলান্টিয়ার ফোর্স অডিট, অক্ষর জ্ঞান কেন্দ্র, মহিলা মণ্ডল এবং বলবারিস ইত্যাদি সংস্থা গ্রামে গড়ে উঠেছে। গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ভাল কাঠ লোকেদের সরবরাহ করা হচ্ছে। লোকের সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য বড় লাপাটি এবং মালাক্কা গ্রামে সমাজ-কল্যাণ কেন্দ্র চালু হয়েছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে এবং ক্রীড়া ও সঙ্গীত নৃত্যের শিক্ষক নিযুক্ত করে, লোকেদের খেলাধূলায় ও সাংস্কৃতিক কার্য্যকলাপে প্রচুর উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য দ্বীপে উন্নয়নমূলক কাজের প্রভাব ততটা পড়ে নি বটে, কিন্তু তবুও কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে। যেমন হাসপাতাল, ডিসপেনসারি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং এইভাবে ভবিষ্যত উন্নতির ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে। এসব দ্বীপে অবশ্য লোকের অশিক্ষা ও আলস্য, যাতায়াতের অসুবিধা এবং চাওড়া ছাড়া অন্য সব দ্বীপে বিচ্ছিন্ন জনবসতি উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেজন্য এসব দ্বীপের উন্নয়নের জন্য খুব বাস্তবানুগ কর্ম্মসূচী প্রণয়ন করা এবং লোকে যেসব অভাব যথার্থই অনুভব করে সেগুলো যাতে মেটানো যায় সেই রকম কার্য্যসূচী প্রথমে গ্রহণ করা অনেক বেশি জরুরী।

চাওড়ার কথাই যদি ধরা যায়, তবে বলতে হয় যে তার ভবিষ্যত উন্নতির সুযোগ কিন্তু খুব বেশি নেই। এই দ্বীপের পানীয় জলের উৎস পর্য্যন্ত তেমন ভাল নয়। কে কত এখানকার অন্যান্য দ্বীপের অধিবাসীদের কুঁড়েমি ও কুসংস্কারের সুবিধা নিতে পাচ্ছে, তার উপর এর বর্তমান অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত। এতো আরু

চিরকাল চলতে পারে না। কাজেই চাওড়ার অনেক অধিবাসীকে পাশের দ্বীপ টেরাসাতে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে রাজি করানো খুবই দরকার। ওই দ্বীপে বসতি অত্যন্ত বিরল। ওখানে চাওড়ার লোকেরা যথেষ্ট জমি পাবে—কঠিন পরিশ্রম করতে পারবে, কর্ম্ম ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারবে, শিল্প ও কারিগরি বিদ্যার অনেক বেশী প্রয়োগ করতে পারবে। ক্ষেত-আবাদের উন্নতি করে, নৌকো তৈরীর কেন্দ্র করে, চিনা মাটির বাসন এবং অন্যান্য কুটির শিল্প বাড়াতে পারবে। কর নিকোবর ও চাওড়া ছাড়া অন্যান্য সব দ্বীপেই বসতি অত্যন্ত বিরল। বিস্তৃত অঞ্চল অব্যবহৃত পড়ে আছে। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকেও কিছু লোক এখানে বসতি স্থাপন করতে পারবে। এতে ভারতের মূল ভূখণ্ডের জন সমস্যারই যে সমাধান হবে তাই নয় কোন কোন দ্বীপের উন্নতির পক্ষেও সুবিধা হবে। কারণ ওখানে এখনো অধিক পরিশ্রম করার লোকের অভাব রয়েছে। এটা অবশ্য আবশ্যক যে মূল ভূখণ্ড থেকে যারা আসবে তাদের প্রতি ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভর করলে চলবে না। অল্প সুযোগ-সুবিধা পেলেই যারা এইসব এলাকার উন্নতি করতে পারে এমন লোক চাই, নিজেদের হাত ও মনের বলে যারা উন্নততর ভবিষ্যত তৈরী করতে পারে তাদের চাই।

তাছাড়া ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে লোক এনে এখানে বসতি স্থাপনের কর্ম্মসূচী নিকোবরীদের স্বার্থরক্ষার বিরোধী হলে চলবে না। তাই এসব বিরল বসতি অঞ্চলে মূল ভূখণ্ড থেকে লোক এনে বসতি স্থাপন করার কালে নিকোবরীদের ভবিষ্যত প্রসারণের জন্য স্থান পৃথক করে রাখা উচিত। এখনই ঘনবসতিপূর্ণ স্থান চাওড়া ও কর নিকোবর থেকে বাড়তি লোক সরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা উচিত।

মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকেদের এবং নিকোবরীদের যদি একই দ্বীপে পাশাপাশি বাস না করতে হয় তাহলেই বোধ হয় ভাল। কারণ তাদের উন্নয়নের বর্তমান অবস্থায় যদি ভারতের

মূল ভূখণ্ড থেকে কোন লোক এসে তাদের শোষণ করতে সুরু করে তাহলে তারা হয়ত আত্মরক্ষা করতে পারবে না। যদি ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকের বসতি স্থাপন প্রথমে দক্ষিণের ক্ষুদে ও ডাঙ্গর নিকোবর দ্বীপেই সীমিত থাকে তাহলে ভাল হয়। এসব দ্বীপ রণনীতির দিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপুর্ণ স্থান এবং এসব অঞ্চলে নিকোবরী জনসংখ্যা নিতান্ত সামান্য। এসব দ্বীপে বিস্তীর্ণ অকর্ষিত ভূমি পড়ে রয়েছে। অন্যান্য বিরল বসতি দ্বীপ—যেমন কাচাল, টেরাসা, কামোরটা এবং নান কাউরি—নিকোবরীদের জন্যই আলাদা থাকা উচিত এবং এসব অঞ্চলে ভবিষ্যৎ উন্নতির সর্ব্ব প্রকার সুবিধাও দেওয়া উচিত।

দ্বীপগুলির ভবিষ্যৎ উন্নতির পদ্ধতি কি প্রকার হবে তা বলা শক্ত। তবে সন্দেহ নেই এখানে উন্নতির খুবই সুবিধা আছে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ উন্নতির উপায় হল দ্বীপগুলির মধ্যে যেমন, তেমনি বাইরেও ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযোগ ও যাতায়াতের প্রচুর ব্যবস্থা, বিশেষতঃ জাহাজের সুবিধা বাড়লে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উন্নতি হতে বাধ্য। এই দ্বীপপুঞ্জের অনেক অংশে জলবায়ু এবং জমি, খুব তাড়াতাড়ি ফলে এমন জিনিস—যেমন রবার, কফি, কোকো, বাদাম ও মশল্লা ইত্যাদি—উৎপন্ন হবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। অবশ্য কর নিকোবর ও চাওড়াতে যাতে বৃহৎ আকারের ক্ষেত-আবাদ করা যায় এরূপ প্রচুর জমি পড়ে নেই, তবে ভবিষ্যতে এইসব দ্বীপের অধিবাসীরা হয়ত তাদের প্রাচীন কৃষি ব্যবস্থা ছেড়ে বেশী লাভ হয় এমন নতুন ফসল বুনবে। নারকেল, সুপুরি ইত্যাদি পুরনো ফসল লাগিয়েও প্রচুর লাভ হতে পারে। নিকোবরীরা যদি উৎকৃষ্টতর নারকেল শাঁস, নারকেল তেল এবং সাবান তৈরী করতে শেখে, তাহলে এইসব জিনিসের শিল্প গড়ে উঠবে। ভুট্টা উৎপন্ন করা সুরু হয়েছে। এসব দ্বীপে ভুট্টা খুব ভাল হচ্ছে। এরা যদি ভুট্টার চাষ মন দিয়ে করে তাহলে বহু সংখ্যক শূকরের খাদ্যের একটা সুরাহা হয় এবং শূকর মাংসের ব্যবসা

ইত্যাদি ভাল চলতে পারে। মাদুর, তীর-ধনুক, ঝুড়ি ইত্যাদি যদি বেশী করে তৈরী করা হয় তাহলে এগুলি ভারতের মূল ভূখণ্ডে খুবই জনপ্রিয় হতে পারে, তবে এগুলি পাঠাবার উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা চাই। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চারদিকে জলে প্রচুর মাছ। নিকোবরীরা জাত জেলে। উপযুক্ত শিক্ষা এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি পেলে গভীর জলে মাছ ধরা এবং মৎস্য শিল্পের কাজে এরা খুবই সফল হতে পারে। বস্তুতঃ যদি নিকোবরীদের ভবিষ্যৎ উন্নতির যথার্থ পরিকল্পনা করা যায় এবং সরকার থেকে প্রদত্ত সুবিধার যদি সম্পূর্ণ সৎব্যবহার তারা করতে পারে তাহলে সেখানে বিপুল আর্থিক অগ্রগতি সম্ভব।

কিন্তু নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ উন্নতির সুযোগ সুবিধার পক্ষে কিছু বাধা আছে। যেমন শিল্প সংস্থাগুলি তখনই ভাল চলবে যখন ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাজারে তাদের মালপত্রের চাহিদা থাকে এবং সেখানকার শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে এগুলি প্রতিযোগিতা চালাতে পারে। একদিকে যেমন শিল্পের জন্য কিছু কাঁচামাল বাইরে থেকে আনতে হবে অন্যদিকে তৈরী মাল জাহাজে করে রপ্তানি করতে হবে। কিন্তু তাতে জাহাজের খরচ এত পড়ে যাবে যে এসব শিল্পের প্রতিষ্ঠা করে কোন লাভই থাকবে না। যেমন কয়েক বছর আগে আর আফুজি জাওবেট কোম্পানি—যে কোম্পানি এইসব দ্বীপে বহু বছর ধরে বাণিজ্য করছে—কর নিকোবরে নারকেলের ছোবড়ায় রশি তৈরীর কেন্দ্র স্থাপন করেছিল এবং দ্বীপে যা খুব সহজে পাওয়া যায় সেই নারকেলের ছোবড়া দিয়ে খুব ভাল মাদুর ইত্যাদি তৈরী করত। এই শিল্প কিন্তু এগুলো না, কারণ জাহাজের খরচ দিয়ে মাদ্রাজ ও কেরালার রশি শিল্পের সঙ্গে এরা প্রতিযোগিতা করতে পারল না। কোন বিশেষ শিল্প, তৈরী মালের উৎপাদন খরচা যদি এত কম না হয় যে মাল পাঠানর খরচা দিয়েও ভারতের মূল ভূখণ্ডের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারে তাহলে সেই শিল্প সাফল্য অর্জন করতে পারে না।

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে শ্রমিকের খরচ বেশ বেশি। কারণ দৈনিক প্রয়োজনীয় কোন কোন দ্রব্যের (বাইরে থেকে যা আসে) সেগুলির দাম খুব বেশী বলে ওখানে জীবিকা নির্ব্বাহের খরচও বেশি। তাই শ্রমিককে ভাল পারিশ্রমিক দিতে হয়। তাছাড়া নিকোবরে উদ্বৃত্ত শ্রমিক বেশী নেই। তাই বাইরে থেকে শ্রমিক আনতে হয় এবং তাতে উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়।

কর নিকোবর এবং চাওড়াতে ভবিষ্যৎ উন্নতির আর একটি অন্তরায় হল উদ্বৃত্ত জমির অভাব। সমস্ত ভাল ভাল জমি অল্পবিস্তর ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। দুটি দ্বীপের জনসংখ্যা ও জমির ওপর ক্রমেই চাপ পড়ছে। বেশি জমির প্রয়োজন হয় না এমন নতুন কিছু উন্নয়নমূলক কাজকর্ম্ম হাতে না নিলে লোকেদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে হবে।

ধার নেওয়ায় এমন কি সরকারের কাছ থেকে নেওয়ায় নিকোবরীদের আপত্তি নতুন উন্নয়নমূলক কাজ শুরু করায় আর একটি বাধা। যদি তারা নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহায় সম্পদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় তাহলেই শুধু উন্নয়নমূলক কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হতে পারে।

সবচেয়ে বড় কথা নিকোবরীরা উপজাতীয় লোক হওয়ায় তাদের পক্ষে ত্বরায় নতুন কাজকর্ম্ম গ্রহণ করা একটা নির্দিষ্ট সীমা-রেখার বাইরে আর সম্ভব নয়। একসঙ্গে তাদের অনেক বিষয় বলা হলে সমস্ত উপজাতীয় লোকের মত তাদেরও সব জট পাকিয়ে যায়। যদি সীমার বাইরে তাদের ওপর উন্নয়নমূলক কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের জীবনযাত্রা ভীষণভাবে ব্যাহত হবে এবং তাদের জীবনে এত বেশি চাপ ও ক্লেশ আসবে যে তাদের পক্ষে তা সহ্য করা শক্ত হবে। বস্তুতঃ যদি নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়নমূলক কর্ম্মসূচী রচনা করার সময় স্থানীয় অবস্থা এবং উপজাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিচার বিবেচনা না করা হয় তাহলে তা শুধু ব্যর্থই হবে না, লোকের প্রভূত ক্ষতিও করবে।

এটা বড় দুর্ভাগ্যজনক যে কখনো কখনো ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে বিশেষ কিছু ব্যক্তি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জে আসেন। এখানে স্বল্পকাল থেকে দ্বীপের অবস্থা সম্বন্ধে তাদের যে সামান্য ভাসা ভাসা ধারণা হয় তারই ভিত্তিতে এখানকার ভবিষ্যৎ উন্নতির অবাস্তব ধারণা নিয়ে কার্য্য পদ্ধতি ঠিক করতে চান এবং নিকোবরীদের অনুন্নত জাতি বলে হেয় জ্ঞান করেন। দুঃখের কথা এই যে, অনেকে তাদের জীবনধারণের মান ও দৃষ্টিভঙ্গি নিকোবরীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চান। এটা তারা ভুলে যান যে সমস্ত উন্নতিই আপেক্ষিক। কোথা থেকে সুরু করা হয়েছে সেটি ভুলে গেলে চলবে না। যদি কর নিকোবরের লোকের বর্তমান উন্নত অবস্থা প্রাক স্বাধীনতা কালের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে এই সত্য অবশ্যই বোঝা যাবে যে তারা দুনিয়ার উন্নত জাতিগুলির অন্যতম এবং সম্প্রতি যেটুকু সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তারজন্য এরা সত্যিসত্যি গর্ব করতে পারে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

নিকোবরীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপেক্ষা যেটা মনকে নাড়া দেয় তাহল নিকোবরী-দের শান্তিপূর্ণ নির্বিরোধী স্বভাব। নিকোবরীদের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে এতটা অভিরুচির কারণ তাদের অতীত ইতিহাস ও দ্বীপের পারিপার্শ্বিক অবস্থা। প্রকৃতি এইসব দ্বীপে অত্যন্ত দাক্ষিণ্যপূর্ণ। প্রত্যেকের জন্যই এখানে প্রচুর রসদ রয়েছে। তাই নিকোবরীদের নিজেদের মধ্যে বা অপরের সঙ্গে আর্থিক কারণে কখনো লড়াই করতে হয়নি। বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অবস্থা এবং স্থানটির চতুর্দ্দিকে জলমগ্নতার জন্য অতীতে নিকোবরীরা বহিরাক্রমণ থেকে অনেক-খানি নিশ্চিন্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানী আক্রমণের আগে পর্যন্ত বলতে গেলে তারা কোন বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্তই হয়নি। তাই অতীতে নিকোবরীদের জীবন অনেক শান্তিপূর্ণ ছিল এবং এই শান্তি এখন তাদের প্রকৃতিগত হয়ে গেছে।

গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ উপজাতি সমাজ দ্বীপপুঞ্জে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করতে আরো অনুকূল হয়েছে। নিকোবরীরা পরস্পরকে একটি বড় পরিবারের সভ্য বলে মনে করে। তারা তাই ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তি করতে হিংসার পথ ত্যাগ করে, গ্রাম ও দ্বীপের কাউন্সিলের মারফৎ তারা তাদের বিবাদের মীমাংসা করতে চায়। শান্তিপ্রিয়তা তাদের রক্তের মধ্যে এমন করে মিশে গেছে যে ছোট শিশুদের পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে কলহরত অবস্থায় দেখা যায় না।

এই শান্তিপূর্ণ প্রকৃতিকে অনেক সময় ভীরুতা বলে ভুল করা হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আক্রমণকারী জাপানীদের কাছে বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ সাহসের অভাবের বিশেষ নিদর্শন বলে লোকে মনে করে। এই সমালোচনা অসঙ্গত। সাহস গুণটা

বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ পায়। সন্দেহ নেই—সাধারণভাবে নিকোবরীরা ঝুঁকি নিতে বড় একটা চায় না, তারা নিরাপদেই থাকতে চায়। কিন্তু সময়কালে তারা স্বাভাবিক শৌর্য্য প্রদর্শন করতে পারে বৈকি। সমুদ্রে যখন মাছ ধরে বা মালপত্র তোলার কাজ করে, নৌকো করে অন্য দ্বীপে তাদের বাৎসরিক ভ্রমণে যায় এবং কখনো ক্ষেত-আবাদে কাজ করে তখন তারা যথেষ্ট বিপদের ঝুঁকি নেয় এবং সাহসের সঙ্গে প্রাকৃতিক শক্তির মুখোমুখি হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানী-দের হাতে যেভাবে চরম নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার তারা সহ্য করেছে তাও খুব সাহসের পরিচায়ক। তবে বিনা বাধায় জাপানীদের কাছে যে তারা আত্মসমর্পণ করেছে তা অবশ্য প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্তের ফলেই করেছে। তারা নিরস্ত্র। আক্রমণকারীকে কোন প্রকার বাধা দিতে গেলে তাদের পক্ষে তা আত্মহত্যার সামিল হত। প্রতিরোধ করলে জাপানীরা প্রতিশোধ নেবার জন্য আরো নৃশংস হয়ে উঠতো।

কাপুরুষ বলে তাদের অপবাদ দেওয়া অন্যায়। তবে এটা ঠিক যে নিকোবরীরা যোদ্ধার জাত নয়। তাদের মধ্যে ঐতিহ্যের একান্তই অভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জাপানী অধিকারের আগে পর্যন্ত শান্তির দীর্ঘ ইতিহাসের জন্য তাদের আত্মরক্ষার প্রস্তুতি কখনোই করতে হয়নি। তাছাড়া জীবন ধারণের জন্য প্রতিদিনের জীবনযুদ্ধও নেই। এই পরিস্থিতিতে নিকোবরীদের রণনিপুণ হবার সুযোগ কম। এটা উল্লেখযোগ্য যে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও এখনো তারা সৈনিকের পেশা নিতে অনিচ্ছুক, যদিও তাদের শারীরিক গঠন, সহিষ্ণুতা এবং ক্রীড়াপ্রিয়তা সামরিক বিভাগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

নিকোবরীরা স্বভাবতই সৎ। সাধারণতঃ ওরা পরস্পরের অধিকারের মর্যাদা দেয়। যা তাদের নিজের নয় এমন কিছু তারা নিতে চায় না। নিকোবরীদের ঘরে তালা দেওয়ার দরকার নেই।

অত্যন্ত কম চুরি হয়। বস্তুতঃ এমন সময় ছিল যখন রাস্তায় টাকা পড়ে থাকলেও নিকোবরীরা তা স্পর্শ করত না। এখন অবশ্য অতটা সততা নেই। এখন ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত কিছু লোকের খারাপ প্রভাবের ফলে ও ব্যক্তিগত চাহিদা কতকটা বাড়ার জন্য লোকে অন্যের অর্থ ও দ্রব্যাদি সুযোগ পেলে গ্রহণ করতে ততটা অনিচ্ছুক নয়। অবশ্য এখনো তারা পরস্পরের অধিকার ও সম্পত্তি খুবই মেনে চলে। তবে মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকজন সম্পর্কে তাদের মনোভাব একই রকম নয়। তাদের জিনিস অপহরণ করতে ওদের বিবেকে ততটা লাগে না। বিশেষ করে ছোট ছেলেরা—যারা ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত নিম্নতম কর্ম্মচারী-দের (যারা বালকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাড়ি ও স্থানীয় দ্রব্যাদি পাবার জন্য) সংস্পর্শে আসে—তারা যদি তেমন সুযোগ পায় তাহলে লোভ সম্বরণ করতে পারে না। মূল ভূখণ্ড থেকে আগত বন্ধুদের কাছ থেকে কাপড়-চোপড় এবং অন্যান্য দৈনন্দিন দ্রব্যাদি চুরি করে বসে। তারা অবশ্য অপরাধে তেমন পারদর্শিতা দেখাতে পারে না। ধরা পড়লে সহজেই দোষ স্বীকার করে ও মুহূর্তের ভুলের জন্য যথার্থই অনুতপ্ত হয়। এরকম বিভ্রান্ত যুবকদের যোগ্য দণ্ড দেবার পর অনেকেই নিজেদের সংশোধন করে নেয়। গাঁয়ের বয়স্করা এই প্রবৃত্তি দমন করার জন্য অপরাধীদের প্রতি রূঢ় আচরণ করেন। কোন যুবক দুবার চুরি করেছে এমন বড় দেখা যায় না। এটাও তাৎপর্য্যপূর্ণ যে কিছু তরুণ বালককেই চুরির মামলায় জড়িত দেখা যায়। স্ত্রীলোক ও বয়স্করা এমন মামলায় জড়িত আছে বলে কখনো শোনা যায় না। এখনো মোটামুটিভাবে নিকোবরীরা সৎ ও সত্যবাদী, যদিও তাদের সততা ও সত্যবাদিতা ক্রমে কমে যাচ্ছে।

নিকোবরীরা বড় সামাজিক। একা থাকতে ওরা ভালবাসে না। সর্ব্বদা সঙ্গী খোঁজে। কোন নিকোবরীর পক্ষে একা কোন কাজ করা অসম্ভব। এমন কি প্রাত্যহিক কাজকর্ম্ম করার জন্যও ওরা

সঙ্গী খোঁজে। প্রত্যেক নিকোবরীরই বহু সংখ্যক ইয়ার-দোস্ত আছে। কিছু পারিবারিক বন্ধু-বান্ধব আছে। তারা কেউ কেউ দ্বীপের বিভিন্ন জনপদের বাসিন্দা আবার কেউ অন্য দ্বীপবাসী। দুটি পরিবারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধুত্ব দু'শ তিনশ বছরের বন্ধন। পুরুষানুক্রমে তারা এই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলে। যখন কোন নিকোবরী ভিন্‌গাঁয়ে বা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্য কোন স্থানে যায় তাকে থাকা-খাওয়ার জন্য বিন্দু মাত্রও মাথা ঘামাতে হয় না। পারিবারিক বন্ধুদের বাড়ী গিয়ে উঠলেই হয়। যতদিন সেখানে থাকে তারা তাকে বাড়ীর লোকের মতই আদর-যত্ন করে।

পারিবারিক বন্ধু ছাড়াও নিকোবরীদের অন্য বন্ধু-বান্ধবও আছে। ব্যক্তিগতভাবে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ। প্রতিদিন রাস্তার ধারে যুবক বৃদ্ধ সকলকেই জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করে গল্প-গুজব করতে বা অলসভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

নিকোবরীদের বন্ধুত্ব কেবল তাদের নিজেদের জাতের লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বাইরের লোকেদের মধ্যেও তা বিস্তীর্ণ। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকেরা নিকোবরীদের বলে 'হলচু', যার অর্থ আমার বন্ধু। এটি আশ্চর্য্য যে আগে নিকোবরী-দের ভাষায় 'শত্রু' বলে কোন শব্দ ছিল না। এখন যে 'দুষমন' শব্দ তাদের ভাষায় এসে গেছে, সেটা হিন্দী থেকে আমদানী।

কিন্তু এও সত্য যে বহিরাগতদের প্রতি বন্ধুত্বপরায়ণ হলেও নিকোবরীরা আলাপের সঙ্গে সঙ্গেই হৃদয় খোলে না। তাদের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব হতে সময় লাগে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে বহিরাগতদের মনোভাব সম্পর্কে তারা সন্দেহপরায়ণ। অতীতে বাইরে থেকে আগত ব্যবসায়ীদের দ্বারা যেভাবে তারা শোষিত হয়েছিল, সে কথা তাদের এখনো স্মরণ আছে। তাই নিকোবরীরা বহিরাগতদের সম্পর্কে সাবধান হতে শিখেছে। তাদের সঙ্গে ব্যক্তি-গত সম্পর্ক স্থাপনে তারা বেশ সতর্ক। অল্পকালের জন্য দ্বীপে যারা আসে তারা লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে

পারে না এবং তারা অভিযোগ করে নিকোবরারা উদাসীন, উত্তাপ-হীন, এবং ওদের কাছ থেকে বন্ধুত্বের কোন সাড়াই পাওয়া যায় না। একবার কোন বহিরাগত নিকোবরীদের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে পারলে এবং তার যথার্থ শুভেচ্ছা, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দের কথা বোঝাতে পারলে তারা গভীর বন্ধুত্ব ও ষোল আনা বিশ্বাসের মনোভাব দেখায় এবং সর্ব্বপ্রকারে তাকে সাহায্য করতে অনুসরণ করতে উদগ্রীব হয়।

নিকোবরীদের সস্নেহ প্রকৃতিও তাদের দৃঢ় পারিবারিক বন্ধনের অন্যতম কারণ। সাধারণ একজন নিকোবরীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ খুব কম, পরিবারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার প্রবণতাই তার প্রবল। কোন নিকোবরীর কার্যকলাপই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা আত্ম উন্নতির জন্য একেবারেই নয়। সমস্ত পরিবারের শুভ ও মঙ্গল চিন্তাই তার মনের মধ্যে সর্ব্বদা জাগরূক। প্রতি ব্যক্তিই পরিবারের অন্যান্য সভ্যের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। তাদের জন্য তার প্রবল সহমর্মিতা। পরিবারের নিবিড় বন্ধনের জন্যই খুব কম নিকোবরীই ভারতের মূল ভূখণ্ডে কাজের খোঁজে আসে। যদি বা অল্প সংখ্যক লোক আসে কিছুকাল পরেই বাড়ীর জন্য তাদের এত মন খারাপ হয়ে যায় যে চাকরি ছেড়ে তারা পরিবারে ফিরে যায়।

নিকোবরীরা শুধু বন্ধুত্ব খোঁজে না, রোমান্টিক ভালবাসার জন্যও তাদের মন কাঁদে। তাই কিশোর বা কিশোরীরা যখন জীবনের কবোষ্ণতা অনুভব করতে সুরু করে তখন কিশোরী বা কিশোরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উৎসুক হয় ও নিজেদের চেহারা ও পোষাকের দিকে বিশেষ নজর দিতে সুরু করে।

বহু প্রেমের ব্যাপার ঘটে। আর হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে যেমন হয়ে থাকে, হয় মিলন ও সুখ নয়ত বিরহ ও বেদনা। প্রেম ও রোমান্স নিকোবরীদের জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং তাদের জীবন এতে আরো সুষমাময় করে তুলেছে।

ওদের আপোষ করার মনোভাব অদ্ভুত। পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারার মধ্যে তাদের এই মনোভাবই প্রতিফলিত।

এই মনোভাবই যুগ যুগ ধরে সতেজ, কর্মতৎপর ও উৎসাহী জাতি হিসাবে তাদের টিঁকে থাকার ক্ষমতা দিয়েছে।

নিকোবরীরা বড় অমিতব্যয়ী। ওদের এই নিরাপত্তাবোধ আছে যে ওদের মৌলিক চাহিদা পূরণে কোন অসুবিধা হবে না। সেই জন্যই অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা ওরা অনুভব করে না এবং খুব তাড়াতাড়ি পয়সা খরচ করে ফেলে, তা সে নিজেদের জন্যই হোক বা কোন বিশেষ উপলক্ষে। সেইজন্যই এরকম দৃষ্টান্ত পাওয়া মোটেই আশ্চর্যজনক নয় যে অধিকতর সচ্ছল ব্যক্তির আয় ভারতের মূল ভূখণ্ডের মানদণ্ডের তুলনায় অনেক কম। এদেরও হঠাৎ টাকার দরকার হলে দ্রুত নারকেলের শাঁস ও সুপুরি বিক্রী করে তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। এরা আতিথ্যপরায়ণও এবং নিজেদের যা আছে অপরকে ভাগ দিতে একটুও ইতস্তত করে না। তাদের গৃহে কেউ গেলে ডাব ও কলা দিয়ে অতিথিকে আপ্যায়ণ করে। কখনো-বা চা বিস্কুট দেয়। তারা কখনো কখনো পার্টিতে বহিরাগতদেরও আমন্ত্রণ করে এবং বেশ ভাল রকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে।

বাইরে থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অথবা অন্যদের তারা উপহারাদিও দেয় যেমন ঝিনুক ইত্যাদি সামুদ্রিক প্রাণীর খোলা, তাদের হাতের কাজ ইত্যাদি। অবশ্য বিনিময়ে তারাও উপহার প্রত্যাশা করে। তবে তাদের কিছু না দেওয়া হলে বিশেষ কিছু মনে করে না। কখনো যদি কোন আগন্তুকের কোন দ্রব্যের প্রতি আগ্রহ জন্মে তাহলে সেটি হয়ত অসঙ্কোচে চেয়েও বসে। যদিও কর নিকোবরের লোকেরা কিছুটা শহুরে বলে খুব কমই চায়। কিন্তু নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থানে লোকে এত বেশি সরল যে স্বত্বাধিকারের কোন বোধই তাদের নেই। তারা প্রায়ই বাইরের লোকের কাছে এটা ওটা চেয়ে বসে। একবার আমি যখন ভাঙ্গর নিকোবরে পুলোভাবি গাঁয়ে ট্যুরে গিয়েছিলাম, গাঁয়ের মোড়ল আমার স্পোর্ট সার্ট দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিল (তখন ওই সার্টটাই

আমার একমাত্র পোষাক ছিল) যে সে আমাকে ধরে বসল গাঁ ছাড়ার আগে সার্টটি যেন তাকে দিয়ে যাই। অনেক করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে বললাম, আর একটি স্পোর্ট সার্ট তাকে পরে অবশ্যই পাঠিয়ে দেব। এই অঙ্গীকার করার পরে সে আমাকে ছেড়ে দিল ও অন্যান্য গাঁয়ের মধ্য দিয়ে খালি গায়ে যাবার লজ্জা থেকে আমি রেহাই পেলাম। আগেই বলা হয়েছে অন্যদিকে আবার নিকোবরীরা ধার নিতে বড় অনিচ্ছুক। বৃটিশের শাসনকালে ব্যবসায়ীদের কাছে তারা যখন সর্ব্বদা ঋণগ্রস্ত থাকত এবং শোষিত হত সেই তিক্ত স্মৃতির ফলেই ধার নেওয়ার ব্যাপারে এই মনোভাব হয়েছে। তাছাড়া আত্মমর্য্যাদাবোধের জন্য, তারা মনে করে ধার নিলে অপরের দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

নিকোবরীদের জীবন সম্বন্ধে এক ধরণের দার্শনিক মনোভাব আছে যার জন্য ওরা ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখ সব কিছুকেই মানব জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে মেনে নেয়। ওরা পরিবারের প্রতি বিশেষ আসক্ত, আত্মীয়-জনের প্রতিও ওদের খুবই প্রীতিবোধ তবু কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত ওরা পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠ জনের মৃত্যুতে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলত না। সম্প্রতি বাইরের সঙ্গে সংযোগের ফলে জীবন সম্বন্ধে তাদের এই দার্শনিক মনোভাব কিছুটা কমেছে এবং প্রিয়জনের মৃত্যুতে ওরা কাঁদতে সুরু করেছে। তবু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকের চেয়ে ওরা খুব কম কাঁদে।

জীবন সম্পর্কে এই দার্শনিক মনোভাব তাদের সমস্ত কিছুতেই সদাসন্তুষ্ট ভাবের মধ্যেও প্রতিফলিত। দ্বীপপুঞ্জের পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনযাত্রার চাহিদা অনায়াসে পূরণ হয় বলে যে তৃপ্তিবোধ, এ সন্তোষ তার চেয়েও বড় জিনিস। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিবর্ত্তনের ফলে নানা রকম সমস্যা দেখা দিলেও তাদের সন্তোষের মনোভাব এখনো বিলুপ্ত হয়নি। তারা তাদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে চেষ্টা করে এবং যখন প্রয়োজন হয় সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু সমস্যা নিয়ে তারা খুব বেশি

হৈ-চৈ করেনা। যদি এমন ব্যাপার হয় যে তারা নিজেরা সমাধান করতে পারল না বা সরকারী কর্ম্মচারীরাও অপারগ, তাহলে তারা অত্যন্ত সুবিবেচনার পরিচয় দেয়। ব্যাপারটা একটা ঘটে যাওয়া ঘটনার মত গ্রহণ করে এবং বিনা অভিযোগে তার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করে।

নিকোবরীরা কোন দিক দিয়েই বিবেচনা বোধশূন্য নয়। তারা বেশ বুদ্ধিমান। ওদের নিজেদের জীবন খুব সরল বলে অনেক নতুন ভাবধারা বুঝতে ওদের অসুবিধা হয়। কিন্তু তাদের জীবনকে সমূহ প্রভাবিত করবে এমন সব বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করতে তারা যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়। নিকোবরীদের কোন বিষয়ের নানাদিক সম্বন্ধে যদি যথাযথভাবে বোঝান যায় তাহলে তারা প্রায়ই সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে। শাসন সংক্রান্ত এবং উন্নয়নমূলক কাজে সরকার যে তাদের যুক্ত করতে পারছেন তা একেবারেই বিনা কারণে নয়। তাদের যে যথেষ্ট বুদ্ধি আছে তা তাদের শিখতে পারার ক্ষমতাতেও তারা ভাষা, গান ও খেলা শিখতে অত্যন্ত সুদক্ষ। তারা বেশ বাস্তব জ্ঞানসম্পন্ন লোক। যা তারা বোঝে না তাই নিয়ে মতামত দিতে চায় না। কোন কর্ম্মসূচীর গুণাগুণ নিয়ে তাদের কাছে লম্বা লম্বা বুলি কপচানোর চেয়ে হাতে কলমে তার বাস্তব সুবিধা দেখিয়ে দিলে তারা প্রভাবিত হয় বেশি। নানা কাজে তাদের যান্ত্রিক তৎপরতা এবং হাতের নিপুণতার সঙ্গে তাদের বাস্তব প্রকৃতি একত্র মিশে' গেছে। বেশ কয়েকজন নিকোবরীই খুব ভাল মেকানিক ও ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে বিশেষ করে কারখানায় এবং প্রাইভেট ট্রেডিং কোম্পানির জাহাজে। যে কাজ তারা করে তার পেছনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরাট ব্যাপার রয়েছে সে সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি ও যোগ্যতা এত বেশি বলে যে কোন সাধারণ যন্ত্র তারা চালাতে পারে।

নিকোবরীদের স্বভাবে লজ্জা ও সঙ্কোচহীনতার অদ্ভুত মিশ্রণ।

তারা যখন ভারতের মূল ভূখণ্ডে আসে এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে এতই বিস্মিত হয় যে লজ্জায় তারা একেবারে মূক হয়ে যায়। বাইরে থেকে তারা আসে, যাদের জানে না তাদের কাছেও তারা বড় আড়ষ্ট এবং তাদের সঙ্গে খুব কম কথা বলে। তাদের মূল্যবোধও অদ্ভুত। বাইরে থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের দাবী ও অভিযোগের কথা জানানো বড় অশিষ্টাচার বলে মনে করে। মন্ত্রী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা দেশের অন্যান্য স্থানে নানারকম নালিশ ও অভিযোগ শুনতে অভ্যস্ত, তারা খুব বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। নিকোবরীরা বলে যে তারা কিছু চায় না, মাননীয় অতিথি দ্বীপপুঞ্জে কয়েকদিন আনন্দ করে যেতে পারেন এটাই শুধু চায়। তাদের সম্পর্কে সুখকর স্মৃতি যেন তাঁর মনে জেগে থাকে—তারা বলে, এটাই তাদের কামনা। ১৯৫৯ সালে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এই দ্বীপপুঞ্জ পরিদর্শনে আসেন। তাঁর শুভ ছাড়া এরা আর কিছু চায় না একথা শুনে তিনি একেবারে কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু এই রকম অনুভূতি এবং বিশিষ্ট লোকের প্রতি অতিরিক্ত সম্ভ্রম নিকোবরীদের ক্ষতিই করেছে। ওদের খুব বেশী সমস্যা বা অসুবিধা নেই। যেটুকু আছে দ্বীপপুঞ্জে অবস্থানকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যদি তাও না জানানো হয় তাহলে তাঁদের আগমণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হতে পারে না। সন্দেহ নেই স্থানীয় অফিসারেরা পরিদর্শকদের নিকট লোকের সমস্যা ও অসুবিধার কথা জানায় এবং উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের গোচরেও নিয়ে আসে, কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের কাছে জনতার আওয়াজ না পৌঁছানোর ফলে প্রয়োজনানুরূপ জরুরী বলে মনে করা হয় না।

নিকোবরীরা অত্যন্ত বাহ্যাড়ম্বরশূন্য। যে কোন লোক তার বন্ধুর গৃহে আসুক না কেন জিজ্ঞাসা না করেই সে ঘরে যা থাকে সব কিছুই পান ও ভোজন করতে পারে। পরস্পরের কাছে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে অভিবাদনেরও ধার ধারে না বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশও

করে না। যখন দুজন নিকোবরীরা রাস্তায় সাক্ষাৎ হয় কে কোথায় যাচ্ছে বড় জোর তারা তাই জিজ্ঞাসাবাদ করে, তাছাড়া কোন আনুষ্ঠানিক অভিবাদন বিনিময় হয় না। এখন বহিঃ-সংযোগের ফলে ইংরাজী কেতায় পরস্পরকে অভিবাদন শুরু হয়েছে। যেমন, 'তুলোক পুহ' (সুপ্রভাত), 'তুলোক আকাশ' (সুদ্বিপ্রহর বা শুভদিন), 'তুলোক হারাপ' (শুভ অপরাহ্ণ বা সন্ধ্যা)। 'তুলোক হোথ্‌নু' (Good night)। তবে এগুলি বিশেষ করে বাইরের আগন্তুকদের জন্যই। নিকোবরীদের 'ধন্যবাদ' বা 'অভিনন্দন' শব্দের কোন যোগ্য প্রতিভাষা নেই। এখন 'রামা লোঁচি' কথাটি ধন্যবাদ, অভিনন্দন এইসব শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু আসলে এর অর্থ 'আমি সুখী', কৃতজ্ঞতা বা অভিনন্দন জানাবার জন্য কোন শব্দ বা বাক্য নয়।

স্থানীয় অফিসারদেরও নিকোবরীরা আপনার লোক বলে মনে করে এবং তাদের প্রতিও তাদের আচার-ব্যবহার আড়ম্বরশূন্য সহজ সরল। কোন নিকোবরীর কোন অফিসারের কাছে কোন কাজ থাকলে সে নিজের নামধাম না বলে, অফিসার ব্যস্ত আছেন কিনা তার খোঁজ না নিয়ে সোজা তার ঘরে ঢুকে যায় এবং বিনাদ্বিধায় তার সব অভিযোগের কথা বলতে থাকে। অফিসের পরে হলেও নিকোবরীরা অনায়াসে অফিসারের বাড়িতে চলে যায়। অফিসার খাচ্ছে কিনা, খাবার মাঝখানে ব্যাঘাত করবে কিনা সে সব ভাবনা ওদের নেই। এমন কি অফিসার ভদ্রতার খাতিরে তাদের খেতে বললেও তাঁর এই অনুরোধ রাখতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে না।

অফিসার বা অন্য কেউ গ্রাম পরিদর্শন করতে এলে তাদের সামনে উঠে দাঁড়াবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয় না। এটাও ওদের সহজ ব্যবহার। এমনও হয় যে মোটামুটি কোন বিশিষ্ট পরিদর্শককেও তারা বসতে বলে না বা ঘরের ভেতরে আসতে বলে না। বাইরে থেকে অল্প দিনের জন্য আগত পরিদর্শকরা নিকোবরীদের এই সরল ব্যবহারকে ভুল বোঝে। রূঢ় আচরণ বলে মনে করে। এটা

দুঃখের কথা কারণ ওদের কোন অশালীন মনোভাব নেই। তবে অত্যন্ত বেশি অনাড়ম্বর ও সহজ বলে ওরা আশা করে যে পরিদর্শকদের যদি ওদের বাড়ীর ভিতর আসতে হয় বা বসতে হয় তাহলে তারা নিজেরাই তা করবে, জিজ্ঞাসা করতে হবে না। এখন অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে কর নিকোবরের অধিকাংশ গাঁয়ের মোড়লরা এবং অন্যান্য দ্বীপের কেউ কেউ অধিকতর শহুরে লোকদের আদব-কায়দা কিছু রপ্ত করেছে। তাদের গ্রাম দর্শন করতে এলে অফিসারদের আসুন বসুন ইত্যাদি বলতে শিখেছে। কিন্তু কোন কোন উৎসব-মজলিশে তারা এসব ব্যাপারে অনভ্যস্ত বলে আপ্যায়ন করতে ভুলেও যায়।

নিকোবরীরা জীবনের সব কিছুতেই আনন্দ খোঁজে। তরুণ ও বৃদ্ধ সকলেই চিত্ত বিনোদনের অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ নিতে উৎসুক। সাধারণ আমোদ-প্রমোদেও সবাই যোগ দেয়। আনন্দ করতে পারার এই ক্ষমতার জন্যই বয়সের তুলনায় তাদের তরুণ দেখায়। সামান্য কথায় তারা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে। এই গুণগুলির জন্য তাদের এত ভাল লাগে। ওদের পরিহাসবোধও বেশ আছে এবং অনেক ঠাট্টা-মস্করাও করে, কিছু কিছু পরিহাস আবার নিজেদের নিয়েও, সর্ব্বদা সব কিছুতেই ওদের পরিহাসবোধ অটুট। প্রায়ই অফিসার এবং মোড়লদের কোন সভায় গুরু গম্ভীর আবহাওয়া। কোন মোড়লের কোন লঘু পরিহাসে হাল্কা হয়ে যায় এবং সভায় উপস্থিত সকলেই হাসিতে ফেটে পড়ে। তখন পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়।

দায়িত্বপূর্ণ এবং দায়িত্বহীন এই দুরকম আচরণই নিকোবরীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গাঁয়ে দৈনন্দিন কাজ ওরা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ-ভাবে করে। বিশেষ করে মোড়লরা তাদের কর্ত্তব্য অত্যন্ত দায়িত্ব-বোধের সঙ্গে সম্পন্ন করে। সাধারণভাবে পল্লীর কাজকর্ম সুষ্ঠু-ভাবেই পরিচালনা করে। কিন্তু গাঁয়ের চিরাচরিত কাজকর্ম

ব্যতীত অন্য কাজকর্ম্মে মোটের উপর তারা বড় দায়িত্ববোধহীন, বিশেষ করে টাকা পয়সার ব্যাপারে। পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে কোন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম্ম করতে পারার মত অগ্রসর তারা এখনো হয়নি। এমন কি মোড়লরা পর্যন্ত অনেক দরকারী কাজকর্ম্মের কথা খুব সহজেই ভুলে যায়। বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে কারণ উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়নের ব্যাপারে সম্মত হয়েও মোড়লেরা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যথার্থ উৎসাহের সঙ্গে কাজে এগিয়ে আসে না বা এ ব্যাপারে তাদের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করে না। সরকারী বিভাগে এবং ট্রেডিং কোম্পানিগুলিতে নিকোবরীদের নেওয়ার অভিজ্ঞতাও সুখকর হয়নি। প্রকৃতির কাছাকাছি যারা থাকে তাদের বোধ হয় এরকমই হয়, সমস্ত নিকোবরীদেরও তেমনি মেজাজের ঠিক নেই। যদি মাছ ধরতে যাবার মন হয় বা ব্যক্তিগত কারণে কাজে অনুপস্থিত থাকার ইচ্ছা হয় দ্বিতীয়বার চিন্তা না করে, যথা নিয়মে ছুটি না নিয়ে তারা তাই করবে। বিশেষ করে ক্ষেত-আবাদ করার ঋতুতে এবং গাঁয়ের পালা পার্ব্বনের দিনগুলিতে নিকোবরীরা দিনের পর দিন অনুপস্থিত থাকে ফলে সরকারী বিভাগের কাজকর্ম্মের ক্ষতি হয়। অনিয়মিত হাজিরার জন্য সংশোধনমূলক নীতি অবলম্বন করাও বৃথা। চাকরি পাওয়া বা ডিসমিস হবার মত কঠিন দণ্ডেও বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যায় না কারণ নিকোবরীদের মনে এই নিরাপত্তাবোধ আছে যে তারা নিজেদের গাঁয়ে পুরনো পেশাতে ফিরে যেতে পারবে এবং যৌথ পরিবার প্রথায় তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। অবশ্য নিকোবরী কর্ম্মচারীদের মধ্যে ব্যতিক্রমও আছে, বিশেষ করে ট্রেডিং কোম্পানিগুলিতে যারা সর্ব্বদা নিয়মিত এবং খুব উৎসাহে ও মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। তবে কাজ করায় এদেরও সবচেয়ে বড় বাধা এরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সঙ্কটকালে পরিস্থিতির কিভাবে সম্মুখীন হবে, কিভাবে খাপ খাইয়ে নেবে তা কিছু বোঝে না। এরকম নিকোবরীদের

কর্ম্মী হিসাবে যথেষ্ট মূল্য, তবু এদের দায়িত্বপূর্ণ স্বাধীন পদ দেওয়া যায় না এবং ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত অন্যান্য কর্ম্মীদের ওপরই তাদের কাজের দেখাশোনার ভার দিতে হয়।

নিজের পুরনো কাজ ছাড়া অন্য কাজে এই রকম দায়িত্বহীন মনোভাব দেখাবার কারণ হয়তো এই যে নিকোবরীরা এরকম কাজের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। খুব সম্ভব আরো শিক্ষা বিস্তার, বুদ্ধির বিকাশ, মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে তাদেরও অন্তরে দায়িত্ববোধ জাগবে এবং তারা তখন সুনিপুণ কর্ম্মী হতে পারবে।

নিকোবরীরা কাজে গররাজি হলেও একবার যদি কাজে যেতে মনস্থ করে তাহলে সব সময় সময়মত কাজে যায়। সামাজিক অনুষ্ঠানেও তারা স্বভাবতই সময়মতই যোগদান করে। প্রায়ই তারা নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই যায়।

তাদের নিজেদের সামাজিক অনুষ্ঠান এত আড়ম্বরশূন্য যে অতিথিরা আগে এলে কিছু যায় আসে না। কিন্তু যে সব অনুষ্ঠানে মূল ভূখণ্ড থেকে আগত কেউ নিমন্ত্রণ করে সেই সব অনুষ্ঠানে বা যেখানে বাইরের আড়ম্বর কিছু পালন করা হয় সেখানে এদের নিয়ে বেচারী আমন্ত্রণকারী বড় বিব্রত হয়ে পড়ে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সময়ে নির্দ্ধারিত সময়ের অনেক আগেই যারা এসে উপস্থিত; সেই অতিথিদের নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না।

এটি বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিস যে নিকোবরীরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। তারা সহজেই আহত হয় ও মনে কষ্ট পায়। এমন অবিচল জীবন, পারস্পরিক সম্পর্ক এমন সুসমঞ্জস্য যে মনে ব্যথা পাবার মত ঘটনা তাদের সংসারে খুব কমই ঘটে। কিন্তু তবু নিজেদের মধ্যেও কারুর মনে আঘাত লাগে এবং সে মনে ব্যথা পায়। অনেক সময় বিশেষ করে স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হলে তারা এত বিচলিত হয় যে কেউ কেউ আত্মহত্যা করতে যায়, হয় গলায় দড়ি দিয়ে নয়ত সমুদ্রে ডুবে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে অন্যান্য অপরাধের

ঘটনা খুব কম হলেও আত্মহত্যার হার খুব বেশি। সৌভাগ্যবশত আজকাল আত্মহত্যার হার অনেক কমে যাচ্ছে কারণ লোকেরা এমন কাজের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারছে এবং ক্রমশঃই নিজেদের জীবনের অনেক বেশি মূল্য দিতে শিখছে।

মূল ভূখণ্ড থেকে আগত লোকজনের সম্পর্কে এলে তাদের মনে আঘাত লাগার কারণ ঘটে বেশি। মূল ভূখণ্ড থেকে আগত অনেক লোকেরই নিকোবরীদের মনোভাব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নেই। মেজাজী ও অবিবেচক লোকেরা তাদের সঙ্গে রূঢ় ভাষায় কথা বলে। তাছাড়া ভারতের মূল ভূখণ্ডের কিছু মূর্খ লোকের নিজেদের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা থাকে, তারা তাই নিকোবরীদের যথোচিত মর্যাদা দিতে পারে না। নিকোবরীরা তাদের রূঢ়বাক্যে আঘাত পায়, তাদের আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগে এবং এদের ক্ষমা করা তাদের পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে। উত্তর অবশ্য তারা দেয় না বা কোন হিংসাত্মক কাজও করে না, কিন্তু তারা অত্যন্ত আহত হয় এবং সে সম্পর্কে তারা হয়ত অনেক পরে কোন একদিন কোন উপলক্ষ বা প্রসঙ্গ ছাড়াই, হঠাৎ বলে বসে। তাই গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে বিশেষ কোন জরুরী বিষয় আলোচনা কালে কোন অফিসার হয়ত একেবারে আকাশ থেকে পড়ে যখন কোন গাঁয়ের মোড়ল সম্পূর্ণ একটি অসম্পৃক্ত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে শুরু করে ও বিরূপ মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকে। ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে আগত কোন ব্যক্তি হয়ত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। অতীতের সেই ঘটনা হয়ত সবাই ভুলেও গেছে। শুধু যেসব নিকোবরী এর সঙ্গে জড়িত তাদেরই তা মনে আছে। তখন সেই অফিসারের আহত নিকোবরীদের বিক্ষুব্ধ মন শান্ত করার জন্য সব রকম বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। ওদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রচুর বুদ্ধি, বিবেচনা, কৌশল, ওদের মনোভাব বুঝবার ক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে সহানুভূতি ও ধৈর্য চাই। এসব গুণ ছাড়া এদের মধ্যে কাউকে কাজ করতে পাঠালে সফল হবার সম্ভবনা কম।

বিংশ অধ্যায়

উপসংহার

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করার পর যে বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় তা হল এখানকার লোকেরা অদ্ভুত রকমের সুখী। মনে হয় ওরা বাঁচার কলা-কৌশলটি আবিষ্কার করে ফেলেছে। অর্থহীন দ্বন্দ্বে জীবনটা না ভরে, বাস্তব লাভের পিছনে অসঙ্গত পরিশ্রম না করে তাদের প্রচুর শান্তি, আরাম, অবকাশ ও আনন্দ। কর নিকোবরে ওরা নতুন ও পুরাতনের সব ভাল জিনিস নিয়েছে। সমবায় সংস্থা বৃদ্ধির সঙ্গে, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণেব সঙ্গে ওদের পার্থিব সমৃদ্ধি বেড়েছে। এখন তাদের আহার, পোষাক পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা আগের চেয়ে অনেক ভাল। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সুযোগ-সুবিধার ফলে স্বাস্থ্যও আগের চেযে ভাল। ভূত-প্রেত পূজো ছেড়ে দেওযাতে এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে এখন আর সর্ব্বদা ভয় ও ত্রাসের মধ্যে থাকে না বরং জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারার মত আত্মবিশ্বাস ওদের হয়েছে। কিন্তু পরিবর্তন সত্ত্বেও ওরা ওদের ঐক্যবোধ হারিয়ে ফেলেনি, হারিয়ে ফেলেনি সামাজিক দায়িত্ববোধ, পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার ক্ষমতা, হারিয়ে ফেলেনি শান্তি ও সন্তোষ এবং জীবন উপভোগ করার সামর্থ। তাছাড়া নিকোবরীরা কোন দিক দিয়েই বর্বর জাতি নয়। তাদের একটি সুসংহত জীবনযাত্রা এবং বর্ণাঢ্য নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। বস্তুতঃ ওদের মধ্যে এমন জিনিস রয়েছে যা তথাকথিত প্রগতিশীল জাতিরা ওদের কাছে শিখতে পারে, যেমন ওদের সামাজিক দায়িত্ববোধ, সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বিসর্জ্জন দেওয়া, সম-অধিকার নীতি, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা এবং মনের সন্তোষ।

নিকোবরী সমাজ অবশ্য এখন একটি মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে,

আগামী পাঁচ-দশ বছরে যা কিছু করা হবে তাতে নতুন করে ভবিষ্যতে লোকের ভাগ্য গড়ে উঠবে। এতদিন পর্যন্ত এদের পরিবর্তন সচেতন কোন প্রচেষ্টার ফলে ততটা হয়নি যতটা হয়েছে কতকগুলি অপ্রতিরোধ্য শক্তির জন্য। কিন্তু আজ এরা সেই সব শক্তির দ্বারা নিজেদের আর পরিচালিত হতে দিতে পারে না। তাদের সচেতন প্রচেষ্টা করতে হবে। অতীতের যা কিছু ভাল তা সংরক্ষিত করতে হবে। তারপর মৌলিক যা পরিবর্তন প্রয়োজন, সে পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

সবচেয়ে জরুরী পরিবর্তন দরকার কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে। প্রাত্যহিক কাজ কর্মের প্রতি তাদের আচরণে। এখন পর্যন্ত নিকোবরীরা ক্ষেত-আবাদের ব্যাপারে প্রকৃতির অজস্র দাক্ষিণ্যের উপরই নির্ভর করতে অভ্যস্ত। নিজেরা পরিশ্রম করে কম। এমনি করে ভূমির পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না। অধিকতর যত্নে কঠিনতর পরিশ্রমে যত বেশি ফসল হতে পারে তার চেয়ে অনেক কম ফসল হয়। বর্তমানে কৃষিজাত দ্রব্যে সমস্ত অধিবাসিদের কোন রকমে কুলিয়ে যায়। তবু চিরাচরিত কৃষি প্রণালীর সাহায্যে এই রকম উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ ও চাহিদার এই সম-ভারসাম্য বেশি দিন রক্ষা করা সম্ভব নয়। দ্বীপপুঞ্জের জনসংখ্যা ভয়াবহ রকম বেড়ে যাচ্ছে। কর নিকোবর ও চাওড়াতে ইতিমধ্যেই জনসংখ্যার চাপ বেশ বোঝা যাচ্ছে। অবশ্য এখনও পর্যন্ত তত প্রকট হয়ে ওঠেনি, কারণ সমবায় সংস্থা গঠন ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ফলে বর্দ্ধিত লোকসংখ্যা অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে কিছুটা ব্যাহত করেছে। কিন্তু লোকেরা যদি কঠিন পরিশ্রম না করে এবং যা জমি আছে তাতে অধিকতর ফসল না ফলায় তবে ভবিষ্যতে সবার জন্য যথেষ্ট খাদ্য থাকবে না এবং বর্তমানের সমৃদ্ধি প্রতিরুদ্ধ হবে। নিকোবরী-দের পক্ষে ভূমিতে অধিক ফসল ফলানো খুবই জরুরী। কারণ অন্য সব জায়গার মত এইসব দ্বীপে ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে

আর্থিক সমৃদ্ধির নতুন পথ খুঁজে পাবার সম্ভাবনা নেই। দ্বীপপুঞ্জে খনিজ দ্রব্যের যেমন অভাব তেমনি ভারতের মূল ভূখণ্ড থেকে কাঁচামাল আমদানি এবং তৈরী জিনিস পাঠানোর জন্য জাহাজের খরচ খুব বেশি বলে বৃহৎ কোন শিল্প প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নই ওঠে না। নিকোবরীদের অবশ্য উৎকৃষ্ট শূকর ও হাঁস-মুরগী পালনের পদ্ধতির উন্নতি করে এবং উন্নততর মাছ ধরার প্রণালী গ্রহণ করে বেশী মাছ ধরে কিছুটা আর্থিক লাভ হতে পারে। মোটের উপর তাদের সর্ব্বদাই জীবিকার সংস্থানের জন্য সব সময়ই জমির উপরেই বেশি নির্ভর করতে হয়। সেই কারণে যত দ্রুত সম্ভব তাদের কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের চাহিদাও লোকের বাড়ছে। সেজন্যও অধিকতর কৃষিজাত দ্রব্যের প্রয়োজন। নিকোবরীরা নিশ্চয় তাদের বর্তমান সহজ সরল জীবনযাত্রা বজায় রাখতে পারে। জীবনের প্রতি তাদের যা দৃষ্টিভঙ্গী তাও বজায় রাখতে পারে। তাদের ভোগোপকরণের চাহিদা হয়ত এতটা বাড়বে না যতটা অধিকতর সভ্য সমাজের লোকেদের বেড়েছে। তবু বহিঃসংযোগ বৃদ্ধির ফলে, ছায়াচিত্রের প্রভাবে, কিছুটা শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে ভোগোপকরণের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। ভোগ্যপণ্যের যত চাহিদা বাড়বে সেই হারে যদি কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পায় তাহলে হতাশা আসবে এবং লোকেদের বর্তমান এই সুখ-সন্তোষ চলে যাবে। তাই সব কিছুর ওপরে নিকোবরীদের উন্নততর কৃষি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। অবিরত কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা ক্ষেত-খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে নয়ত তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কোন আশা নেই।

ব্যাপকভাবে পরিবার পরিকল্পনারও সমান প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হবে ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে তার কিছুটা নিরসন হতে পারে। কর নিকোবর ও চাওড়ার মত ঘন বসতি পূর্ণ স্থান থেকে অপেক্ষাকৃত বিরল বসতিসম্পন্ন দ্বীপে কিছু পরিবার

উঠিয়ে নিয়ে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু অধিক ফসল ফলানোরও একটা নির্দ্ধারিত সীমা আছে। অন্যান্য দ্বীপে লোকের বসতি স্থাপন করে ছড়িয়ে পড়ারও অসুবিধা আছে। তাই নিকোবরীদের পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিবার পরিকল্পনা নীতির প্রতি নিকোবরীরা তেমন উৎসাহ দেখাতে পারছে না। অতিরিক্ত শিশুপ্রীতি এবং জাতি হিসাবে অন্যের সঙ্গে তুলনায় তারা যে এখনো সংখ্যায় খুব কম সে সম্বন্ধে সচেতনতা—এই দুটো কারণই বাধার সৃষ্টি করছে। সেইজন্যই জন্ম নিয়ন্ত্রণে তাদের মত নেই। এমন কি অধিকতর শিক্ষিত নিকোবরীরাও পরিবার পরিকল্পনার কর্ম্মসূচীর উপর অত বেশী গুরুত্ব আরোপ করে না। তাদের কেমন একটা নিশ্চিত মনোভাব যে ভবিষ্যতে যখন দারিদ্রের কষাঘাত সইতে হবে তখন দেখা যাবে। তখন জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই হবে। এটা বোঝে না যে এতে বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে এবং এখন থেকেই জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ করা সুরু না করলে কয়েক বছর পরই জনসংখ্যার বিস্ফোরণের ফলে ব্যাপক দারিদ্র ও দুঃখদুর্দ্দশা সুরু হবে।

ওদের কিছু কিছু পুরনো মূল্যবোধেরও রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। নিকোবরীরা যদি তাদের ঐক্যবোধ হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে পরস্পরের প্রতি প্রীতির সম্পর্ক, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং সমাজের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে বিসর্জ্জন দেবার মানসিক প্রবণতা, তাহলে সে বড় দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। এতদিন পর্য্যন্ত ওদের জীবনে এত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাদের এইসব মূল্যবোধ একেবারে অটুট ছিল। মোটামুটি এতে লোকের অশেষ কল্যাণ সাধন হয়েছে। বলা শক্ত ভবিষ্যতে কি অবস্থা হবে। অধিকতর বহিঃসংযোগ এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বুদ্ধি অবশ্যই জাগবে। যৌথ পরিবার প্রথায় এবং পল্লী ও দ্বীপ পর্য্যায়ের নানাভাবে সম্পর্কে আবদ্ধ উপজাতীয় সংগঠনের মধ্যে

বিরোধ ও মন কষাকষির সৃষ্টি হবে। নিকোবরীদের মধ্যে পরস্পরের বন্ধন যদি শিথিল হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেকে যদি সামাজিক হিতের প্রতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজতে থাকে, তাহলে অন্যান্য জটিল সমাজের মত ওদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা ও নিরাপত্তার অভাব দেখা দেবে। ওদের বর্তমান জীবনের স্থৈর্য্য ও প্রশান্তি ক্ষুণ্ণ হবে। উপজাতীয় জীবনের ঐক্য নষ্ট হলে তাতে নিকোবরীদের মহাক্ষতি। কারণ ওরা দেশের এমন সুদূর প্রান্তে বাস করে এবং সংখ্যায় ওরা এত কম যে ওরা যদি এক সুরে কথা না বলে তাহলে ওদের সমস্যা ও অসুবিধা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা সম্ভব হবে না এবং ওদের বৃহত্তর স্বার্থ ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হবে।

তবে আশা আছে যে লোকে যদি সচেতনভাবে অতীতের মূল্যবোধ ও সমাজ ব্যবস্থার ভাল ভাল জিনিষগুলি সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে তাহলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যে সব মৌলিক বস্তু এখন তাদের শক্তি দিচ্ছে সেগুলি হারিয়ে ফেলবে না। বিশেষ করে সমবায় সংস্থাগুলির সমৃদ্ধি খুবই আশাব্যঞ্জক। সমবায় নীতির অন্তর্নিহিত ভাবধারা যদি ওরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তাহলে ভবিষ্যতেও নিকোবরীদের ঐক্যবোধ, পারস্পরিক অধিকার এবং স্বার্থ সম্পর্কে শ্রদ্ধা টিকে থাকবে। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ও রীতিনীতির প্রতি অন্ধ আবেগ বোধ না করে লোকেরা যদি সচেতনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে উৎসাহিত হয়, সমাজের বৃহত্তর মঙ্গল চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যের আবহাওয়ায় পরস্পরের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ সহযোগিতায় কাজ করতে পারে, তাহলে সেটাই হবে সঙ্গত ব্যবস্থা।

অবশ্য ভবিষ্যতে নেতৃত্ব কি রকম হবে তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে। এখনও পর্যন্ত কর নিকোবরের লোকেরা খুবই সৌভাগ্যবান। ওরা বিশপ রিচার্ডসনের মত অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন নেতাকে পেয়েছে,—পুরনো ও নতুনের যা কিছু ভাল তাঁর মধ্যে মূর্ত্ত হয়ে আছে, যাঁর ভবিষ্যত দৃষ্টি ও কল্পনা প্রখর, সেই সঙ্গে যিনি

জাতির মূল কোথায় সে বিষয়ে সম্যক অবহিত, পুরনো ও শ্রেষ্ঠ জিনিসের যিনি মূল্য বোঝেন। তিনি নিজের উপজাতির কল্যাণে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেছেন কিন্তু অখিল ভারতের প্রতি তাঁর অশেষ আনুগত্য। তিনি মহান ধর্ম্মপ্রাণ আবার পরমসহিষ্ণু। তাঁর অসীম সাহস আবার অসাধারণ নম্রতা। সব কিছুতে অক্লান্ত উদ্যম ও কঠিন শ্রমদক্ষতা, আর অন্যদিকে হাস্য-কৌতুকে উজ্জ্বল। তিনি সত্যিই এমন একটি মানুষ যাকে বলা যেতে পারে ঐতিহাসিক চরিত্র। দ্বীপপুঞ্জে তিনি নবযুগ সৃষ্টি করেছেন। যতদিন পর্যন্ত তিনি জাতিকে পরিচালনা করবেন, অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই আশা করা যায় যে, ততদিন নিকোবরীরা কালের আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে এবং সুখী ও সমৃদ্ধ হবে। যদিও নিকোবরীদের সমস্ত শুভানুধ্যায়ীদের এই আশা যে তিনি আরো বহু বছর ধরে জাতিকে পরিচালনা করবেন, কিন্তু কিছু তো বলা যায় না। কারণ আশীর ওপর তাঁর বয়স, অনন্তকাল তো তিনি বাঁচবেন না। তাঁর যাবার পর যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তার পূরণ হওয়া কঠিন, নিকোবরীদের স্বার্থ এবং সরকারের কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হবে। তাঁর মত অবশ্য কেউ হতে পারে না। কিন্তু এ বড় দুঃখের কথা যে তাঁর ধারে কাছেও আসতে পারে এবং লোকদের আবশ্যকীয় নেতৃত্ব দিতে পারে এমন কেউ নেই। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত নিকোবরী এখনো খুব তরুণ। তাদের যে অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতারই অভাব তা নয়, লোকেদের মধ্যে তাদের তেমন স্থানও নেই—তারা তাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। অন্য দিকে দ্বীপের মোড়লেরা, যাদের লোকের মধ্যে কিছুটা স্থান আছে এবং যারা লোককে প্রভাবিতও করতে পারে, তারা সব অশিক্ষিত, তারা সময়োচিত সব প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলতে অপারগ। সরকারের সঙ্গে সংযোগ রাখতে তারা অক্ষম এবং ভবিষ্যতে লোকেদের নতুন পথ দেখাতেও অসমর্থ। বিশপ রিচার্ডসনের পরে নেতৃত্বের মহা সঙ্কট উপস্থিত হবে। লোকের

যদি এখন থেকেই সজাগ থাকে এবং পরবর্তী নেতা যাতে গঠিত হয় সে সম্পর্কে অবহিত হয় তাহলে ভাল হয়। সমস্ত মোড়লদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে বিশপ রিচার্ডসন নিজে যদি একজন যোগ্য শিক্ষিত যুবক নির্ব্বাচিত করেন, তাকেই নিজের উত্তরাধিকারী হিসাবে তৈরী করেন তবে নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বের কিছুটা আশা থাকবে, নয়ত সুযোগ্য কর্ণধারের অভাবে নিকোবরীদের ভাগ্যতরী নানা রকম বিশ্বাসঘাতক পাহাড়ের ধাক্কায় চুরমার হয়ে যেতে বাধ্য।

অন্যান্য দ্বীপে নেতৃত্বের সমস্যা আরো তীব্র। নানারকম লোক আছে, যাদের বিভিন্ন দ্বীপের কর্তা বলে মনে করা হয়। কিন্তু তাদের নেতৃত্ব তত অবিসম্বাদী নয়। কর নিকোবরে বিশপ রিচার্ডসনের মত তাদের এমন প্রবল প্রভাবও লোকের উপর নেই। বস্তুতঃ অন্যান্য দ্বীপেও বিশপ রিচার্ডসনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি উন্নয়নমূলক কাজে তাদের পরিচালনা করতে এবং তাদের অভাব অভিযোগ সরকারের গোচরে আনতে সক্ষম। চাওড়াতে দুটো দল আছে এবং প্রধান দলপতির নেতৃত্বকে বেশ কয়েকবার চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। রাণী চাঙ্গার কাচালের লোকের উপর কর্তৃত্ব আছে এবং তাঁকে তাদের নেত্রী হিসাবে ধরা যায়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই এই দ্বীপেও দুটো দল হয়েছে এবং রাণীর অবস্থা আর আগের মত নেই। রাণী লছমীর উপর নান কাউরির কামোরটা, ট্রিঙ্কেট, টেরাসা এবং বামপুকার লোকেদের আস্থা আছে, কিন্তু তাদের উপর তেমন প্রবল প্রভাব তাঁর নেই। সমস্ত বিষয়ে লোকেদের পরিচালিত করতেও তিনি পারেন না। বাকি দ্বীপগুলিতে কোন বিশেষ লোকেরই তেমন প্রভাব নেই এবং জনগণের নেতা বলে কাউকে মনে করা যায় না।

তার উপর রাণী চাঙ্গা, রাণী লছমী এবং চাওড়ার বড় মোড়ল,—এঁরা জনহিতকামী এবং আন্তরিকতা থাকলেও মস্ত অসুবিধা

যে এঁরা অশিক্ষিত। এঁদের বুদ্ধি ও পরিকল্পনা সেইজন্য সীমিত হয়ে পড়ে। এঁরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার শাসন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যোগাযোগ রাখতে অসমর্থ হন। এ পর্যন্ত দ্বীপপুঞ্জে উন্নয়নমূলক কাজ খুবই সীমিত ছিল। জনতার নেতা বলে যাঁরা স্বীকৃত তাঁদের কাছ থেকে কোন বিশেষ প্রকার নেতৃত্বও আসেনি।

তবে ভবিষ্যতে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্র কর নিকোবর থেকে এসব দ্বীপে উঠে আসতে বাধ্য এবং যতই জোর কদমে উন্নতি এগিয়ে যাবে ততই অন্যান্য দ্বীপের লোকেরও বুদ্ধিমান এবং আন্তরিক প্রয়াসী নেতার আবশ্যক হবে, যে নেতা তাদের উন্নতির পথেও যেমন নিয়ে যেতে সমর্থ হবে তেমন্ তাদের স্বার্থ রক্ষাও করতে পারবে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে এরকম নেতা একজনও দেখা যায় না কারণ কর নিকোবর ব্যতীত অন্যত্র শিক্ষার বিস্তার ও মানসিক অগ্রগতি বড়ই সীমিত।

এই রকম পরিস্থিতিতে বোধ হয় এটাই সবচেয়ে সঙ্গত হবে যে কর নিকোবরের অধিবাসিদের যিনি নেতৃত্ব দেবেন অন্যান্য দ্বীপের লোকেরাও তাকে মান্য করে চলবে। আর যদিও বিভিন্ন গাঁয়ের ও দ্বীপের মোড়লেরা আগেরই মত নিজের নিজের কাজ করে যাবে, তবু নিকোবরীদের একজন সর্ব্বজনমান্য নেতা থাকবেন যিনি সমগ্র দ্বীপপুঞ্জের সমস্ত বাসিন্দারই সমস্ত জরুরী সমস্যার সমাধান করে তাদের উন্নতির পথে চালিত করতে সমর্থ হবেন। যদিও তাদের ভবিষ্যৎ গঠনের প্রধান ভার তাদের নিজেদের উপরই ন্যস্ত তবু এটাও বিশেষ জরুরী যে বর্তমানে তাদের যেভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে, তা যেন অব্যাহত থাকে। এইসব উপজাতীয় এলাকায় প্রবেশ করার বিধি-নিষেধ যেন বলবৎ থাকে। বর্তমান অগ্রগতি সত্ত্বেও নিকোবরীরা অবিবেচক বহিরাগতদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অসহায়। বিশেষ করে তাদের ব্যবসায় বুদ্ধি একেবারেই নেই। এসব দ্বীপে প্রবেশের

বিধি-নিষেধ একবার উঠিয়ে দিলে তারা কতকগুলি বিবেকশূন্য ব্যবসায়ীর ধড়িবাজীর সহজ শিকার হয়ে পড়বে এবং বৃটিশ শাসনকালের মতই দুঃখ ও দারিদ্র্যের কবলে পড়বে। তাই যদি মূল ভূখণ্ড থেকে কিছু লোকের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন জনবিরল দ্বীপে বসবাস করানোর ব্যবস্থা করা হয় তবু এসব দ্বীপের প্রবেশ করার সাধারণ বিধি-নিষেধ বলবৎ থাকাই বাঞ্ছনীয়। আদিবাসীদের যারা শোষণ করতে চাইবে বা সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কোন গোলমাল করতে চাইবে, সেইসব অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সরকার যাতে বহিষ্কার করতে সক্ষম হয়, সে ক্ষমতা তার থাকা দরকার।

নিকোবরীরা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছে, যার উপর তাদের ভবিষ্যত সুখ-কল্যাণ অনেকখানিই নির্ভরশীল। লোকে যদি সময়ের আহ্বানে সাড়া দিতে অপারগ হয় এবং তাদের সমস্যার সমাধান যথোচিত কল্পনা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে না করতে পারে, তাহলে তাদের বর্ত্তমান সুখ-সমৃদ্ধি কয়েক বছরের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যত গভীর অন্ধকারে ডুবে যাবে। যদি তাদের স্বার্থ ভালভাবে সংরক্ষিত থাকে এবং ভবিষ্যত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি তাদের দেওয়া যায় এবং লোকেরাও প্রয়োজন অনুসারে সাড়া দিতে সক্ষম হয়, কঠিন পরিশ্রম ও সুচিন্তিত পরিবার পরিকল্পনা করে, তাদের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির কাঠামোর মধ্যেই উন্নতির পথে এগিয়ে যায়, তাদের পুরাতন পারত্রিক ধারণার উৎকৃষ্ট মূল্যবোধগুলি রক্ষিত থাকে তাহলে এই দ্বীপসমূহ সত্যিকারের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে। পৃথিবীর আর যে কোন জায়গার মতই এই দ্বীপপুঞ্জকেও সুখ ও শান্তির আশ্রয় নিকেতন ক'রে তোলা সম্ভব হবে।

—:•:—

কর নিকোবরের ঋতু উৎসব

ক্রমিক নম্বর	উৎসবের নাম	যে গ্রামে উৎসব হয়	উৎসবের তিথি	বৈশিষ্ট্য	তাৎপর্য্য
১)	কিন-টপ-হ্যাঁঙ	মাস, কিনমাই, বড় লাপাটি, ছোট লাপাটি, তাপরমিঙ, চুকচুকিয়া, কিন্যুকা।	অমাবস্যা, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সুরু হবার ঠিক পূর্বে (এপ্রিলের শেষে)।	নারকেলের মালা স্তুপ করে সমস্ত তটরেখা জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এক এক গ্রামে ভোজ। খালি বড় লাপাটি গ্রামে অগ্নিকুণ্ড ঘিরে নৃত্য।	নিকোবরী নববর্ষ উৎযাপন ও আগুন আবিস্কারের স্মরণে উৎসব পালন।
২)	তানাহা	আরঙ	শুক্লা চতুর্থী (প্রায় এপ্রিলের শেষে)।	নাচ, ভোজ, সকালে কুস্তি। পরস্পরের মধ্যে নারকেল তেলের বিনিময় করে।	দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমণ সূচনা করে। পশ্চিম উপকূলে এর পর মাছ ধরা বন্ধ হয়।
৩)	কিনরোপা (সাওয়াই)	সাওয়াই	শুক্লা তৃতীয়া (মে মাসের প্রথমার্দ্ধ)।	ভোজ, নাচ, সকালে কুস্তি, তারপর কাঁকড়া ধরে।	ঋতু পরিবর্তন সূচনা করে আর উত্তর উপকূলে কাঁকড়া ইত্যাদি ধরা আরম্ভ হয়।

৪)	কানাচা	মাস, কিনমাই, ছোট লাপাটি, চুকচুকিয়া, তাপই মিঙ্গ, কিন্যাকা।	কৃষ্ণা দশমী তিথি (মে মাসের প্রায় তৃতীয় সপ্তাহ)।	গ্রামে গ্রামে ভোজ, নাচ। কিনমাই গ্রামে শুধু প্রাতে কুস্তি, সমুদ্রতটে কচি ডাব, রাটান বাঁশের ও নারকেলের পাতা নাঠির ওপর রাখে ও তিন দিন পর তোলে।	দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আরম্ভকাল চিহ্নিত করে, রোগ-পী দূর করা আর যে াগ্য আনবার তুকতাক করার ও এসে যায়।
৫)	ইন-ভা-ন্যা-কিরো-আপ	মালাকা	শুক্লা নবমী (জুন মাস)।	নাচ, ভোজ, কুস্তি সমুদ্রের দিকে মুখ করে নৌকো সমুদ্রতটে রাখা হয়।	প্রথম চাওড়া গমনের স্মরণীয় উৎসব।
৬)	কিনরোপা	কাকানা	কৃষ্ণা তৃতীয়া (জুনের শেষ)।	ভোজ, নাচ, কুস্তি, কাঁকড়া ধরা।	দক্ষিণ উপকূলে কাঁকড়া ধরার সময় জ্ঞাপক।
৭)	কা-নে-এনি-তেওনি	তামালু	কৃষ্ণ পক্ষের দশম দিবস (জুনের শেষ বা াইর প্রথম)।	ভোজ, নারকেল পাতায় ঢাকা নানা ভোজ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছোট ডোঙ্গা বা জাহাজের মডেল ঘিরে নৃত্য বা ডোঙ্গার মডেল সকালে সমুদ্র তীরে নিয়ে ...কটা খুঁটির ওপরে দৃঢ়	দ্বীপে বহিরাগত শত্রুর আগমণ পথ রুদ্ধ করে দেবার প্রতীক।

				সংলগ্ন করে রাখা এবং রাটান পল্লবে নৌকো আচ্ছাদিত করে রাখা। নৌকোর এই মডেল সারা বছর ধরে পরের উৎসব পর্যন্ত রাখা হয়। যদিও উপরের পাতাগুলি বদলে বদলে দেওয়া হয় যাতে বছর ভোর টাটকা পাতায় ঢাকা থাকে।	
৮)	হানোহিঙ	কাইনাম	শুক্লা তৃতীয়া (জুলাইতে)।	ভোজ, নাচ, কুস্তি, তটের কাছে মাছ ধরা, বিশেষ করে কিন্যিয়া বীজের বিষ দিয়ে ছোট অক্টোপাস ধরা।	ছোট অক্টোপাস ধরার তাৎপর্য্য এই যে বড় হয়ে এই প্রাণীগুলি যেন মধ্য সাগরে নৌকো বিধ্বস্ত না করে।
৯)	চা-নো-হয়নি	পার্কা	শুক্লা নবমী (আগস্টের শেষে)।	ভোজ, নাচ, নিমন্ত্রণকারী গ্রামের দুটি সুসজ্জিত নৌকোয় রাত্রে মাছ ধরা, সকালে কুস্তি।	ঋতু পরিবর্তন বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময়ের আরম্ভকাল চিহ্নিত করে। তখন দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর বর্ষণ থামতে সুরু করে এবং সমুদ্র শান্ত হতে থাকে।

ভারতবর্ষ—দেশ ও দেশবাসী

(প্রকাশিত পুস্তকাবলী)

ভারতবর্ষের সাধারণ পাখি

চিত্রসংগ্রহ : ডঃ সালিম আলি ও
শ্রীমতী লাইক ফতেহ্ আলি
অনুবাদ : স্বর্গীয়া উষা গঙ্গোপাধ্যায়
ডঃ নীলরতন সেন ॥
দাম : দশ টাকা।

সাধারণ বৃক্ষ : ডঃ এইচ সান্তাপাউ
অনুবাদ : শ্রীধীরেন্দ্র নাথ কর
দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

পুষ্প-বৃক্ষ : ডঃ এম. এস. রণধাবা
অনুবাদ : শ্রীসুকুমার বসু ॥
দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দেশ ও মাটি : ডঃ এস. পি. রায়চৌধুরী
অনুবাদ : শ্রী এন. সি. দেবনাথ ॥
দাম : চার টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

(প্রকাশিত পুস্তকাবলী)

কাজী নজরুল ইসলাম : শ্রী বসুধা চক্রবর্তী
দাম : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা।

শঙ্করদেব : ডঃ মহেশ্বর নেওগ
অনুবাদ : শ্রী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ॥
দাম : দুই টাকা।

সমুদ্রগুপ্ত : লালনজী গোপাল
অনুবাদ : শ্রী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥
মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ত্যাগরাজ : অধ্যাপক পি শম্বমূর্তি
অনুবাদ : শ্রী ধীরেন্দ্র নাথ কর ॥
দাম : দুই টাকা।

গুরু গোবিন্দ সিং : ডঃ গোপাল সিং
অনুবাদ : শ্রী গুরুনেক সিং ॥
দাম : দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কবীর : ডঃ পারসনাথ তিবারী
অনুবাদ : শ্রী শুভেন্দু শেখর মুখোপাধ্যায় ॥
দাম : দুই টাকা।

পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর : শ্রী ভি. আর. আথাওড়ে
অনুবাদ : শ্রী সুধাংশু কুমার সাহা ॥
দাম : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

গুরু নানক : ডঃ গোপাল সিং
অনুবাদ : শ্রী গুরুনেক সিং ॥
দাম : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে : ডঃ কৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকার
অনুবাদ : শ্রী সুনীল কুমার বসু ॥
দাম : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা।

অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা (আদান-প্রদান)

(প্রকাশিত পুস্তকাবলী)

তাসের প্রাসাদ : শ্রীমতী মুপ্পাল রঙ্গনায়কম্মা
অনুবাদ : শ্রীমতী মিনতি দেবী ॥
দাম : তিন টাকা পঁচিশ পয়সা।

কথা পাঞ্জাব —(পাঞ্জাবী গল্প সংকলন)
সম্পাদন : ডঃ হরভজন সিং
অনুবাদ : শ্রীপ্রবোধ কুমার মজুমদার ॥
দাম : চার টাকা পঁচিশ পয়সা।

অশোকের অনুশাসন :

সম্পাদনা ও

ইংরাজী অনুবাদ : এন্, এ, নিকম ও রিচার্ড ম্যাক কেওন

অনুবাদ : সাবিত্রী দত্ত

দাম : দুই টাকা পঁচিশ পয়সা

আকবর : লেখক : লরেন্স্ বিনিয়ান

অনুবাদ : শিশিরকুমার দাস

দাম : তিন টাকা পঁচিশ পয়সা

ভারতের শিক্ষার পুনর্গঠন :

স্বর্গীয় ডঃ জাকির হুসেন

অনুবাদ : কৃষ্ণ ধর

গৌতম বুদ্ধ — লেখক : আনন্দ কুমারস্বামী ও

আই, বি, হর্ণার

অনুবাদ : সুকুমার দত্ত

দাম : পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

বীর বিদ্রোহী — লেখক ; ডেনিস কিন্‌কেয়াড

অনুবাদ : শ্রীসুকুমার ভট্টাচার্য

নেহরু বাল পুস্তকালয় সিরিজের প্রকাশিত বই

বাপু (মহাত্মা গান্ধীর সচিত্র জীবনী —দুই খণ্ডে)	লেখা ও চিত্র : এফ. সি ফ্রীটস
কাশ্মীর	চিত্রশিল্পী : প্রেমানন্দ শর্ম্মা লেখিকা : মালা সিং
পক্ষী জগৎ	জমাল আরা
নদী কথা	লীলা মজুমদার
শিখর থেকে শিখরে	ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং
স্বর্গ ভ্রমণ ও অন্যান্য গল্প	লীলাবতী ভাগত
সরস গল্প	মনোজ দাস
স্বরাজ্যের কথা	বিষ্ণু প্রভাকর
ভারতে বিদেশী যাত্রী	কে. সি. খান্না
আমাদের রেলের কথা	জগজিৎ সিং
এস, আমরা নাটক করি	উমা আনন্দ
বাঘের মাসী বেড়াল	এম. ডি. চতুর্বেদী
সে অনেক কালের কথা—১ম খণ্ড	এম. চোকসী ও পি. এম. জোশী
রোহান্তা ও নান্দ্রিয়া	কৃষ্ণ চৈতন্য